উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২ B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, 2020)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualificaltion Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes.)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম **(NBG)**

কোর্স ঃ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স

কোর্সের শিরোনাম ঃ বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

কোর্স কোড ঃ **5CC-BG-01**

প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualificaltion Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes.)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স ঃ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স

কোর্সের শিরোনাম ঃ বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

কোর্স কোড ঃ 5CC-BG-01

মডিউল ঃ ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ কোর্স : Discipline Specific Elective Course : 1	লেখক Course Writer	সম্পাদনা Editor
মডিউল ঃ ১ / Module : 1	**ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত** **সায়ানদীপ ব্যান্যার্জি**	**অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল** বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ঃ ২ / Module : 2	**ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস** সাহকারী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সায়নদীপ ব্যানার্জি	
মডিউল ঃ ৩ / Module : 3	**অধ্যাপিক বাণীমঞ্জরী দাস** **ড. শক্তিনাথ ঝা**	
মডিউল ঃ ৪ / Module : 4	**অধ্যাপক আশিস কুমার দে** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় **অধ্যাপক মানস মজুমদার** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শান্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গীতশ্রী সরকারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualificaltion Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes.)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স ঃ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক কোর্স

কোর্সের শিরোনাম ঃ বাঙালি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

কোর্স কোড ঃ 5CC-BG-01

মডিউল-১ : বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)

একক ১	❏	বাঙালি জাতির উদ্ভব, ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং বাঙালি সংস্কৃতি	৯-২৫
একক ২	❏	বাংলার সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তি	২৬-৩৬
একক ৩	❏	বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত সাহিত্য	৩৭-৫৪
একক ৪	❏	চর্যাপদ	৫৫-৬৯

মডিউল-২ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ)

একক ৫	❏	চৈতন্যপূর্ব কৃষ্ণকথার ধারা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৭২-৯৪
একক ৬	❏	বৈষ্ণব পদাবলী	৯৫-১০৭
একক ৭	❏	অনুবাদ সাহিত্য: রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ১০৮-১২৫	
একক ৮	❏	চৈতন্যচরিত সাহিত্য: চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল	১২৬-১৪৫

মডিউল-৩ :বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ: দ্বিতীয় পর্ব)

একক ৯	❏	মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং সাধারণ পরিচয়: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল	১৪৮-১৭২
একক ১০	❏	বাংলা রোমান্স ও প্রণয়োপাখ্যান: শাহ্‌ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল	১৭৩-১৮৩

একক ১১ ❑ শাক্ত পদাবলী: রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ১৮৪-১৯২
একক ১২ ❑ বাউল গান: লালন সাঁই, হাসন রাজা, দুদ্দু সা ১৯৩-২০৬
মডিউল-৪ :বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস এবং সমন্বয় চেতনা
একক ১৩ ❑ বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস ২০৮-২২০
একক ১৪ ❑ চৈতন্যদেব ও বাঙালি সংস্কৃতি ২২১-২২৯
একক ১৫ ❑ সুফি প্রভাব ও ইসলামি উপাদান ২৩০-২৩৯

F:\Rajan\2025\NSOU\NEC-BG_01_Final_1st_Proof_(Date : 21_02_2025)

মডিউল-১

বাঙালি জাতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)

একক ১ ❑ বাঙালি জাতির উদ্ভব, ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং বাঙালি সংস্কৃতি

১.১. উদ্দেশ্য
১.২. প্রস্তাবনা
১.৩. বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়
১.৪. বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস
১.৫. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
১.৬. বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিকথা
১.৭. অনুশীলনী

১.১. উদ্দেশ্য

যে কোনও ভাষার সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ বাঞ্ছনীয়। আর সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করতে হয় ইতিহাস-পাঠকের জিজ্ঞাসা নিয়ে। বর্তমান মডিউলটির উদ্দেশ্য আদিযুগের স্ফুটনোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কোনো জাতিকে জানতে হলে যেমন তার ইতিহাস জানতে হয়, উদ্ভব থেকে শুরু করে বিবর্তনের ধারায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেমন করে সেই জাতি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে তা জানতে হয়, তেমনই কোনো ভাষার সাহিত্য জানতে গেলেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এই মডিউলে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা কালানুক্রমিকভাবে করা হবে। তবে তার আগে এই এককে বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা হবে। এগুলি না জানলে সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হবে না।

১.২. প্রস্তাবনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এককথায় বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস। তাতে যেমন হিন্দুপুরাণ ও মিথের উপস্থিতি আছে, তেমনি আছে এদেশের মানুষের আচার, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, সংস্কার, উপচার ইত্যাদির সমন্বিত পরিচয়; প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়সহ বাংলার শিল্পকলা ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই ইতিহাস চর্চায়।

প্রত্যেক জাতি নিজেদের দেশ ও পরিচয় সম্পর্কে সচেতন। বাঙালিরও নিজস্ব সত্তা ও দেশ সম্পর্কে ধারণা থাকাটা প্রয়োজন। তা না হলে বাঙালির অস্তিত্বই হারিয়ে যাবে। এই পর্যায়ে তাই কয়েকটি উপ-এককে বাঙালির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ভিত্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাতে বাঙালি নিজের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

১.৩. বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়

কোনো একটি দেশ সম্পর্কে জানতে গেলে সর্বাগ্রে সে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় জানা দরকার। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন- ক্ষ্মএকটি দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।ক্ষ্ম গুঁবাঙ্গালীর ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৪, পৃ. ১২১) এই ভৌগোলিক পরিচয় নেওয়ার আগে ভূগোল বা geography ব্যাপারটি নিয়ে একটু ভাবা দরকার। Pocket Oxford Dictionary (১৯৯৩)-তে geography সম্পর্কে বলা হচ্ছে-১. পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উৎসসমূহ, জলবায়ু, জনসংখ্যা ইত্যাদির বিজ্ঞান। ২. একটি এলাকার বৈশিষ্ট্য বা ব্যবস্থাপনা। আবার বাংলায় 'ভূগোল' সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন, 'যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করা যায়।' (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, জুলাই ১৯৮৬)। সাদামাটাভাবে আমরা বুঝি পাহাড়, নদী, মরুভূমি, দ্বীপ, সমুদ্র সব কিছু মিলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে সারা জগতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটা গড় (average) রেখা টেনে আলোচনা করি। আবার বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাদের রাজনৈতিক সীমানা ও পরিচয় মনে গাঁথা হয়ে থাকে।

তাই আপাতত ভূগোলের দুটি বিভাগ করছি-প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক। আসলে যখনই বলি এক বিশেষ দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, তখন তার রাজনৈতিক পরিচয় আড়ালে রাখা যায় না। নইলে অঞ্চলগুলির বর্ণনায় বা সীমান্তের ধারণা করব কি করে? ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন একটা সর্বজাগতিকতা (transworldliness) থাকে, তেমনি আঞ্চলিকতাও থাকে (regionalism)

বাংলার উত্তরে তরাই বন, দক্ষিণে সুন্দরবন ও বিরাট জলাভূমি। ফলে বাঙালির শরীরে উষ্ণ জলীয়তার সঞ্চার হয়েছে। যার মধ্যে থাকে ক্লান্তি অবসন্নতার চিহ্ন।

বাংলার নদ-নদী:

বাঙালির ইতিহাসের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছে এখানকার নদ-নদী। এরা উঁচু জায়গা থেকে পলি বহন করে যেমন ব-দ্বীপের নিচু জায়গা করেছে, তেমনি গতি পরিবর্তন করে নতুন পথ বেছে নেওয়ার এবং বন্যার কারণে নগর, বন্দর, উপাসনাস্থল, গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। এদের গতিপথ এবং পরিবর্তনের ধারা পুরনো ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) আমাদের জানা নেই। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে এদের ইতিহাস নানা বিবরণে এবং মানচিত্রে জানতে পারি। এদের আগের নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এমনকি নদীটিও তার অস্তিত্ব হারিয়েছে।

এগুলির তীরে গড়ে উঠেছিল বাংলার সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শিল্পের চর্চা, সাহিত্যের

বৈচিত্র্য, ধর্মীয় আচার ও গোষ্ঠীর বিকাশ। যে নদী ভয়ংকরভাবে অতীতকে মুছে ফেলে, সে হয়েছে কীর্তিনাশা। অন্যেরা হল ইচ্ছামতী (ইচ্ছামতি), ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মহানন্দা কিংবা আত্রাই, মেঘনা, সুরমা। এদের নামকরণে কাব্যিকতা আছে।

এদের মধ্যে গঙ্গা ও লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) সমুদ্রে পড়ার আগে বাংলার মাটিকে বয়ে নিয়ে গেছে। পদ্মা যেমন কীর্তিনাশা নাম পেয়েছে, তেমনি সে ও মেঘনা আজকের বাংলাদেশের প্রাণরেখা।

যোড়শ শতক থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি বাংলার নদ-নদীগুলি অবিরত বদলেছে। এখন তাদের গতিপথ যেমন দেখছি, তা সেকালে ছিল না। নতুন নদী জন্মালেও পুরনো ভৈরব, কুমার (শিলাইদহ) এরা মরে গেছে। এদের কথা জানতে পারি মানচিত্র-নকশায়, বতুতা ফিচ ফার্নান্দেজ বারণির লেখা ভ্রমণকথায় (travelogue) কিংবা মনসামঙ্গল, রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা বা অন্নদামঙ্গলে।

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু: লোকপ্রকৃতি

বাংলার চারটি সীমার কথা আগেই বলেছি। পশ্চিম রাঢ়ের নদ-নদীগুলি ও ভাগীরথী মুর্শিদাবাদের অনেকটা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়ার কিছু অংশ, হুগলি-হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে শস্যশ্যামলা বৃক্ষবহুল জমি তৈরি করেছে।

ভূ-প্রকৃতির প্রাচীন সাক্ষ্য

কজঙ্গল: রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব তার ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়ের জলজঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করেছেন একাদশ শতকে। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়ী খণ্ডজঙ্গল নামে দেশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম এবং অজয় নদ এই দেশে। এখানে তিন ভাগ জুড়ে জঙ্গল, এক ভাগে গ্রাম ও জনবসতি। জমিন এখানে চাষযোগ্য নয় বললেই চলে। এই অঞ্চলকে 'কজঙ্গল' নামে অভিহিত করা হত। বর্তমানের কাঁকজোল সেই নামেরই ধূসর স্মৃতি বহন করছে।

তাম্রলিপ্তি

চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান এই রাজ্যে গিয়েছিলেন। তার জমিন সমতল ও জলীয়; বাতাস গরম, ফুল ফল শস্য অঢেল। লোকের আচার-আচরণে রূঢ়তার পরিমাণ বেশি। কিন্তু এদের প্রচুর সাহস। স্থল ও জলপথ এখানে মিলেছে।

কর্ণসুবর্ণ, পুরাভূমি ও রাঙ্গামাটিঃ

ঐ পরিব্রাজক যুয়ান তাম্রলিপ্তি (বর্তমানের তমলুক) থেকে কর্ণসুবর্ণে (যা ছিল এক জনবহুল রাজ্য) গিয়েছিলেন। এখানকার মানুষের অবস্থা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ছিল। চাষবাস ভালো। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ। এটি এখনকার মুর্শিদাবাদের কানসোনা বলে অনুমান করা হয়।

এর রাজধানীর কাছে বিরাট বৌদ্ধবিহারের কথা তিনি বলেছেন। রাঙ্গামাটিও মুর্শিদাবাদে। এটি সমতল হলেও রাজমহল-সাঁওতালভূমির, গেরুয়া মাটি জমিনের নীচে ও ওপরে পাওয়া যায়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটি-লালমাটি (কুমিল্লা), রাঙ্গাপুর (রংপুর হতে পারে) রাঙ্গিয়া, রাঙ্গাপাড়া, রাঙ্গাগ্রাম নামের মধ্যে ব্যক্তি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ: পুরাভূমি ও নবভূমি, বরিন্দ-বরেন্দ্রী:

রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে পুরাভূমির একটি রেখা। মালদহ রাজশাহী দিনাজপুর রংপুরের ভিতর দিয়ে, ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামের পাহাড় ছুঁয়েছে। এখানকার মাটি পাহাড়ি গেরুয়া রংয়ের মোটা বালির। রংপুর গোয়ালপুর কামরূপে এই রেখার বিস্তার বেশি। বগুড়া-রাজশাহীর উত্তর, পূর্ব দিনাজপুর এবং রংপুরের পশ্চিমে এই রেখার উঁচু গৈরিক ভূমি দেখতে পাই। এটি হল ইসলামী ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, আমাদের বরেন্দ্রভূমি। এর উত্তরে জলপাইগুড়ি-কোচবিহার, পূর্ণিয়ার কিছুটা। কেন্দ্রবিন্দুতে এটি ফসলহীন, পুরাভূমি। কিন্তু আত্রাই, মহানন্দা, কোশী, পদ্মা-করতোয়া তার্পণ নদী অন্যান্য দিক ঘিরে রেখেছে। এটিকে নবভূমি (Newland) বলা হয়েছে।

পুণ্ড্রবর্ধন:

বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশ বটে, আবার তাই পুণ্ড্রবর্ধন। সমৃদ্ধ মানুষ, জনঘনত্ব খুব, জলাশয় বিশ্রাম-কানন পুষ্পোদ্যান, জমিন সমতল, জোলো, প্রচুর শস্য, মৃদু জলবায়ু-এভাবেই চৈনিক পরিব্রাজক মুয়ান এর বর্ণনা করেছেন। কামরূপের লোকেরা খাটো, কালো। তারা সৎ আচরণ করলেও হিংস্র প্রকৃতির। পড়াশোনায় তারা খুব পরিশ্রম করে। তাদের ভাষা মধ্যদেশ থেকে আলাদা। এখানে যথেষ্ট হাতি দেখা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

পূর্ববঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি: মধুপুরগড় ও নবভূমির দুটি ভাগ:

পূর্ব বাংলা (এখনকার বাংলাদেশ) নতুনই গড়ে উঠেছে। একে গড়ে তুলেছে পদ্মা, ব্রহ্মাহ্মপুত্র, সুরমা ও মেঘনা। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বড়ো অংশে গেরুয়া পাহাড়ি গজারী বনের এক টুকরো পুরাভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, উত্তর কাছাড় এবং দক্ষিণে হাইলাকান্দি এলাকা, শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলাকে মোটামুটি পুরনো বা পুরাভূমি বলতে পারা যায়।

এই নতুন গড়া ভূমির দুটি ভাগ স্পষ্টত ধরা পড়ে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল ত্রিপুরা এবং সিলেটের গঠন পুরাকালের (Old formation)। আর খুলনা, বাখরগঞ্জ সমতল নোয়াখালি ও সমতল চট্টগ্রামের গঠন নতুন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেমে একাদশ শতক অবধি নানান লিপি ও মূর্তি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি, সভ্যতা এবং জনগণের বসবাসের চিহ্ন বহন করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, নবগঠিত সমতলে মূর্তি একেবারেই পাই না।

মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গের নবভূমি:

এখানে পুরাভূমির (old formation) চিহ্ন নেই। এটি পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর তৈরি পলিমাটি, বন্যা একে সৃষ্টি করেছে। খাড়িমণ্ডল ব্যাঘ্রতটী সমতট নামগুলি আলোচনীয়। সমতট সমতল ত্রিপুরা অবধি ছড়ানো ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলও তো ফরিদপুরের মতো নবভূমি। নদীয়া, যশোর, চব্বিশ পরগণা (এখন দুভাগে বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ) পুরনো গঠনের। চব্বিশ পরগণার গাঙ্গেয় অঞ্চল বহুকাল ধরে জনবসতি ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

সমতট:

চৈনিক পরিব্রাজক মুয়ান একে বলেছেন, সমুদ্রতীরের দেশ। জমিন এখানে জোলো এবং সমতল। এটি তখনকার যশোর ফরিদপুর ঢাকা এলাকা বলে অনুমান করেছেন নীহাররঞ্জন রায় (বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ১৬৬৪। নতুন ভাঙচুর সবকিছু এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বেশি হয়েছে।

আবহাওয়া:

বাংলার জলবায়ু বা আবহাওয়া খুব বেশি গরম নয়, খুব ঠাণ্ডাও নয়। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও মেদিনীপুরে গরমের প্রভাব বেশি। পূর্ব এবং উত্তর বাংলায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে খুব বৃষ্টিপাত হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, বরিশাল অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ।

অন্যদিকে আছে বসন্তের বাতাস। যার প্রভাবে লেখা ধোয়ীর 'পবনদূত'। এমনকি 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ বাতাস সম্পর্কে বেশ রোমান্টিক কিছু শ্লোক আছে। বাংলাদেশের সম্পর্কে চোল বংশের এক লিপিতে আছে যে এই দেশে বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই।

বাঙালির জীবনে বর্ষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাই বর্ষাকে কেন্দ্র করে যত গান বা কবিতা রচিত হয়েছে, অন্য ঋতু সম্পর্কে ততটা নয়।

হেমন্ত বাঙালির জীবনে একসময় গুরুত্বপূর্ণ ঋতু ছিল। সদুক্তিকমর্ণামৃতে আছে: 'চাষীর বাড়ি শালিধানে পরিপূর্ণ হয়েছে। গ্রামের সীমান্তে যে যব হয়েছে তার শীস অরবিন্দের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম।' পরে আধুনিক কবিতায় বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের লেখায় হেমন্ত পরিপূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত। একইভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাব্য লিখেছেন 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'। অন্যান্যদের মধ্যেও হৈমন্তী প্রভাব পড়েছে।

এসেছে। পরে বিভিন্ন নকশায় পাই Bengala– দক্ষিণে Golfo of Bengala SGulf of BengalV। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণকথায় একে Bengala বললেও এর অবস্থান সুনিশ্চিত করেন নি। কিন্তু আগে যাকে 'বঙ্গাল' বলেছি, তা আসলে একটি অংশ বা বিভাগ। বাংলাদেশের প্রাচীন পর্বদুটি জনপদে বিভক্ত ছিল-১. বঙ্গ, ২. অন্যটি বঙ্গাল। চর্যায় যেমন 'বঙ্গাল' পাচ্ছি। আসলে এই দুই জনপদের নামের যোগফল হল মধ্যযুগ ও এখনকার বাংলাদেশ।

বহুসময় কৌম (tribe) নামে লোকালয় চিহ্নিত হত-বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুন্ড্রাঃ, গৌড়াঃ। এরা যেখানে বসবাস করত, সেই বাসস্থলগুলি তাদের কৌমের নামে নির্দিষ্ট হল। একেক লোকালয়ে একেকটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের প্রভাব ছিল। এদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হলে বা কমলে লোকালয়ের সীমাও সেরকম হত।

প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রসীমা কখনই এক হয় না। প্রাচীন বাংলাতেই হয় নি। অথচ আমরা যখন ঐতিহাসিক মানচিত্র বা রাষ্ট্রীয় মানচিত্র দেখি তখন প্রাকৃতিক সীমা সঠিক বোঝা যায় না। প্রাচীন জনপদ বা রাষ্ট্রশক্তির উল্লেখ উচ্চবর্ণের আর্যদের কাছ থেকেই পাই। এই জনপদগুলি ছিল স্বশাসিত এবং আলাদা। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে সংযুক্তি এলেও স্বাতন্ত্র্য কখনই হারিয়ে যায় নি। শশাঙ্ক (সপ্তম শতক) প্রথম এদের একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। 'গৌড়' নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা বেড়ে চলে। তাই পাল রাজারা বাংলা শাসন

করলেও গৌড়াধিপ বা গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন।

ক্রমে তিনটি জনপদ বাংলাদেশ আখ্যা পায়-পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ। বেশ কিছু বিভাগ ও উপরিভাগও তৈরি হয়েছিল। নৈষধের হর্ষচরিত, কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে প্রধান জনপদগুলি স্থান পেয়েছে। এই বিভাগ এবং উপবিভাগের নতুন নতুন নামকরণ হয়েছিল। প্রত্যেক রাজারই (পাল ও সেন) লক্ষ্য ছিল স্বরাট হওয়া। ঔরংজীবের সময় শায়েস্তা খাঁর শাসনে এটি হল গৌড়মণ্ডল। শশাঙ্ক বা অন্যান্যেরা জনপদকে একসূত্রে বাঁধার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ফলপ্রসূ হয় নি। বরং ধীরে ধীরে বঙ্গ নামের অবজ্ঞাত স্থান নাম (দ্মস্তুত্বত্র —খদ্বত্র) গৃহীত হল। পাঠান রাজত্বে এবং আকবরী আমলে সুবে বাংলা নামে বিখ্যাত হল। যদিও বর্তমানে বাংলা আকবরী আমলের থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে।

১.৪. বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাস

বাঙালি জাতি বলতে কাদের বোঝায়? এর সবথেকে সহজ উত্তর বাঙালি বলতে বঙ্গপ্রদেশে জন্মসূত্রে বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদেরই প্রতিপন্ন করে। বাঙালি জাতির ইতিহাস বেশ জটিল ও অস্পষ্ট। বঙ্গদেশের সঙ্গে সুপ্রাচীন বৈদিক আর্য সভ্যতার কোনো সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। বৈদিক সূক্তে কোথাও বাংলার কোনো উল্লেখ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলে যাঁদের কথা উল্লেখিত হয়েছে তাঁরা বঙ্গবাসী নয়। তাঁরা উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবাসী। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গবাসী সম্পর্কে নিন্দাসূচক উক্তি উচ্চারিত হয়েছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন

ধর্মসূত্রও বঙ্গদেশে স্বল্পকালের জন্য বসবাস করলেও তা প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য এমন কথা বলা হয়েছে। এই তথ্যগুলি থেকে একথা বলা যেতে পারে যে, বাংলার প্রাচীন মানুষ আর্যবংশসম্ভূত নয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন,

> বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আর্যগণ এদেশে আসিবার পূর্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করিত। নৃতত্ত্ববিদগণও বর্তমান বাঙালীর দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ)

কাজেই প্রশ্ন ওঠে আর্য সভ্যতার দ্বারা প্লাবিত হবার আগে বাংলায় কারা বাস করতেন? তাঁদের সঙ্গে আজকের বাঙালির রক্তের সম্পর্কই বা কতটা- এসব বিচার নৃতাত্ত্বিকেরাই করবেন বা করেছেন। অনেকের মতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশে এসেছেন। যেমন- নিগ্রিটো বা নিগ্রোবটু, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলয়েড ইত্যাদি। অনেকের মতে বঙ্গভূমিতে সকলের আগে এসেছিল নিগ্রিটো বা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ। সুদূর আন্দামান থেকে বাংলার নানা প্রান্তে এদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের চুল ঘন কোঁকড়ানো, গায়ের রং কালো, ঠোঁট পুরু ও ওল্টানো, নাক মোটা ও চ্যাপ্টা, উচ্চতায় খর্বাকৃতি। বিহারের রাজমহল, বাংলাদেশের সুন্দরবন, নিম্নবঙ্গের নানা জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এরপরে আসে অস্ট্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এদের রং কালো, মাথা লম্বা, প্রশস্ত নাক, তামাটে চুল দেখতে পাওয়া যায়। এরাও খর্বাকৃতি হয়ে থাকে। এই মানবগোষ্ঠীকে অস্ট্রো-এশিয়াটিক মানবগোষ্ঠী বলেছেন নৃতাত্ত্বিকেরা। বিষ্ণুপুরাণে এদের বলা হয়েছে 'নিষাদ'। ভারতবর্ষের

কোল, ভীল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসীরা এই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। এই অস্ট্রিকদের সঙ্গে আদি নিগ্রিটো বা নিগ্রবটু মানুষের রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছিল এমনটা ভাবা যেতে পারে। একসময় পণ্ডিতেরা বাঙালির মধ্যে দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ দেখতে পেলেও বর্তমানে এই মত থেকে তাঁরা সরে এসেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্টতই বলেছেন,

> বাঙালী জাতিতে যে মঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ববাদী সম্মত। আর দ্রাবিড় নামে কোনো জাতির পৃথক অস্তিত্বই পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না। (বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ)

বিপরীতক্রমে গোপাল হালদারের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, বাঙালির রক্তে মঙ্গোলীয় বা ভোট-চীনিও গোষ্ঠীর নানা জাতি উপজাতি যেমন গারো, বড়ো, কোচ, চাকমা প্রভৃতির রক্তও মিশে রয়েছে। সম্ভবত এরাই হলেন কিরাত। এসব অনুমান নির্ভর গবেষণার পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ্র তাঁর 'Indo Aryan Race' নামক গ্রন্থে জানিয়েছেন, পামীর ও টাকলামাকান অঞ্চলের অধিবাসী হোমো-আলপাইনাস নামে অভিহিত এক জাতীয় মানুষই বাঙালির আদিপুরুষ। এ বিষয়ে বিতর্ক আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এ সিদ্ধান্তে সকলেই এসেছেন যে বাঙালি একটি মিশ্র জাতি। নানা প্রাচীন জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তীকালে তুর্কি প্রভৃতি নানা জাতির রক্তধারা যেমন মিশেছে তেমনি মিশেছে আর্য সভ্যতাপুষ্ট মানুষের রক্তধারাও। পূর্ব ভারতে যে অ-বৈদিক ও অ-ব্রাহ্মণ্য ধারা প্রবাহিত ছিল, কালক্রমে তার উপরে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে। এবং অনিবার্যভাবে আর্যেতর সভ্যতার ধারা আর্যসভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়ে যে নতুন জাতি ভাষা ও সংস্কৃতির জন্ম দিল তাই-ই উত্তরপর্বে বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিতি পেল।

১.৫. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) পরিচয় জানার আগে তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার-

১. প্রাচীনতম মানুষের কঙ্কালাস্থি বা ফসিলীকৃত দেহ (Fossilised body),

২. জাতি-উপজাতি নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য বা ঐতিহাসিক নমুনা,

৩. এখনকার জাতিগুলির নৃতত্ত্বমূলক বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

প্রথমটি সম্পর্কে আমাদের এতাবৎ যে ধারণা ছিল, তা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে নরকঙ্কাল, তা দশ হাজার লক্ষ বছর আগেকার। ফলে মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে সঠিক বলা খুব কঠিন। এর পরে কোনো আবিষ্কারে হয়তো সময় আরেকটু পিছোতেও পারে। নৃতত্ত্বের ইতিহাস তাই স্থাণু হতে পারে না, তাকে পরিবর্তনশীল হতেই হবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো।

বাংলার মানুষদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য নৃতাত্ত্বিকভাবে যদি দেখি, তা হল বিস্তৃতশিরাকতা (Brachy cephalic)। হাবার্ট রিজলি এদের মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণ ভেবেছিলেন। উপজাতিদের এভাবে বাংলার নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণে ব্যবহার করা যায় না।

হরিবংশে আছে বলি রাজার পাঁচজন ছেলের নামে পাঁচ রাজ্য তৈরি হয়েছিল। মৎস্য ও বায়ু পুরাণে

আছে এরাই চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেন।

বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিবাসী ভুটিয়া, লেপচাদের বিস্তৃত শিরাক হলেও উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা দীর্ঘশিরাক (dolicho-cephalic)। পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয়রা দীর্ঘশিরাক অথচ পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা কিন্তু বিস্তৃতশিরাক।

বাঙালির সঙ্গে মঙ্গোলীয়ের নৃতাত্ত্বিক বন্ধন যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমনি দ্রাবিড় জাতির কোনো রক্ত সম্বন্ধ বাঙালির সঙ্গে নেই। যদিও নিচু সম্প্রদায়ের বাঙালির মধ্যে প্রাক-দ্রাবিড় (Preadravidiaus) রক্ত সম্পর্ক মিলিত হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালি মুসলমানদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়;

১. বহিরাগত

২. ধর্মান্তরিত

৩. দুজনের সংমিশ্রিত

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে মুসলমান শাসক ও পাঠান সুলতানের আনা বিদেশি মুসলিমগণের বংশধর। স্বেচ্ছায় যারা ‘ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বা যারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিশ্রণে তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানদের বংশধর উৎপন্ন হল। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১২০৩ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা মুসলমানদের অধীনে ছিল। ১৯০১ নাগাদ একটা দাবি উঠেছিল যে তারা এ দেশের নয়, সকলেই বিদেশিদের বংশধর। ১৪১৪-৩০ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দিনের শাসনে প্রাণভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকরা কখনই বলেন নি যে উত্তর ভারত থেকে দল বেঁধে মুসলমানরা বাংলায় বসতি করেছিল। মুঘল যুগেও পূর্ব বাংলাকে স্বাস্থ্যকর জায়গা মনে করা হত না। যারা উঁচু পদে আসতেন, কিছুদিন পর দিল্লি বা আগ্রায় ফিরতেন। একমাত্র চট্টগ্রামকে আরবি মুসলমান বণিকরা বাণিজ্যের জন্য বসবাসের জায়গা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

হিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমানও হত। হিন্দুসমাজ যাদেরকে ছোট চোখে দেখতেন, তাদের ইসলামের সাম্য আকর্ষণ করত। আবার ‘খানকা’, যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া পাওয়া যেত, তারাও অনেককে ইসলাম ধর্মে টানত। পথভ্রষ্টা সধবা বা বিধবা হিন্দু সমাজে স্থান পেত না। হিন্দু রমণীরা মুসলমান

উপপতির পরিবারে বিবির মর্যাদা পেত। গরীব মানুষ ছেলেমেয়ে বেচে দিত দাসত্বের হাটে। মুসলমানেরা তাদের ধর্ম বদলে দিত। হিন্দুদের বিশেষ করে উচ্চবর্ণের যবন দোষ ঘটলে (খাদ্যগ্রহণে, এমনকি ঘ্রাণেও) হিন্দুসমাজে একঘরে হয়ে তারা মুসলমান হয়ে যেতেন। মুর্শিদকুলী খানের আমলে জমিদারের খাজনা বাকি থাকলে তাকে পরিবারসহ মুসলমান করা হত।

বাঙালি মুসলমানরা যে হিন্দু থেকেই ধর্মান্তরিত, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়-১. হিন্দুসমাজে তাদের যে পেশা ছিল, পরে তাই করত। ২. ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রতিফলন আছে ৩. নামকরণে আছে ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, ৪. অনেকে হিন্দু সংস্কার, লৌকিক আচার পরেও মেনে চলত। ৫. মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষাকালীর পুজো করা ৬. বিয়ের পর সিঁদুর পরা (লাল নয়, অন্য রংয়ের)। এসব আচার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, মোল্লাদের ফতোয়া, হিন্দু সমাজের কঠোরতার জন্য অনেক পরিমাণে পালটে গেছে। বাঙালি মুসলমান আসলে এ দেশেরই মানুষ। আজকে তাই ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানকে সে অন্য নাম না দিয়ে 'বাংলাদেশ' করেছে। এমনকি বাংলা সংস্কৃতির চর্চা সেখানে নিবিড়ভাবে চলছে।

১.৬. বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিকথা

ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম বর্ণের ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির মূলে আছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, চাকমা প্রভৃতি উপজাতীয় সংস্কৃতির অবদান একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয়। পরবর্তীকালেও উপজাতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার নানা স্তরে প্রভাব বিস্তার করে। আমরা জানি, মুসলিম বিজয়ের আগে পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতিরূপেই চিহ্নিত ছিল। মুসলমানদের এদেশে আগমনে এদেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইরান তুরান থেকে আগত সেদেশের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে আসে নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। এতে করে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ধারাটি যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়, তা বলার অপেক্ষা বাখে না। যুগের বিবর্তনে একদিকে ভাবতীয় সংস্কৃতির বহমান ধারা যেমন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, অন্যদিকে তার সঙ্গে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির জাগরণও ঘটে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

বাঙালি সংস্কৃতির ধারাটি পল্লীকে কেন্দ্র করেই যে গড়ে উঠেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে গ্রামসভ্যতার সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির যে একটা সুহৃদ সম্পর্ক বিদ্যমান। বহু আচার, আচরণ, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, ধর্মভীরুতা ইত্যাদি নিয়ে যে গ্রামসভ্যতা, তার মূলে আছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাব। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাঙালির এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, শূদ্র, পোদ, তিলি, নাপিত, বাগদি, বৈদ্য, মুচি, কৈবর্ত, ধোপা, মাহিষ্য, গুঁড়ি প্রভৃতি বহু বিচিত্র জাতপাতের সম্মিলিত আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম ও পেশা-বৃত্তির বহমান ধারার সংমিশ্রণে।

যদিও বলা হয়ে থাকে বাংলার সংস্কৃতির বয়স হাজার বছরেরও উপর, কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গদেশ ও বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে। তবে হাজার বছর পূর্বে বাংলা ভাষার নিদর্শন আবিষ্কারের আগে বাঙালির জাতপাতের ধারণাটি তেমন সুস্পষ্ট হয় নি, হয়তো তখন বাঙালির জাতিসত্তা বৃহত্তর দৃষ্টিতে ভারতীয় বলেই বিবেচিত হয়ে থাকবে। তবে বঙ্গের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই অনুমান করা যায়। তখন সময়টা ছিলো প্রাক্-গুপ্ত যুগ। এসময় বাংলাদেশ জৈন আজীবিক ও বৌদ্ধধর্মের

সংস্পর্শে আসে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন, কোটিবর্ষ, কর্ণাট ইত্যাদি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া রাঢ়দেশে তখন বহু আজীবিক সন্ন্যাসী ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় দশকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

গুপ্তযুগে অনেক ব্রাহ্মণও বাংলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বঙ্গদেশীয় জীবনের উপর পড়ে। এ সময় বাঙালির লোকায়ত জীবনের ধারায় কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কথার প্রভাবও দেখা যায়। পাহাড়পুরের ফলকগুলোতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের বহুবিচিত্র লীলাখেলার নানা খোদাই চিত্রের পাশাপাশি, পাহাড়পুরের নানা মন্দিরে শিবের খোদাই করা মূর্তিগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র অঙ্কন-বৈশিষ্ট্য। ষষ্ঠ শতকে রাজা বৈনাগুপ্তের সময় বঙ্গে শৈবধর্মের প্রসার ঘটে। সপ্তম শতকের গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক শৈষভক্ত ছিলেন।

পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে খোদাই করে অঙ্কিত শিব ও শিবের বাহন নন্দী, ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলু ইত্যাদি চিত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিবমূর্তি নির্মাণের উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এসব মূর্তির গঠন-সৌকর্য পুরাকালের বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সপ্তম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মেরও প্রসার ঘটে। চৈনিক বৌদ্ধশ্রমণ ফা হিয়েন (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) ও যুযান চোয়াং (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক), এদেব তথ্যবিবরণী থেকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। বঙ্গের রাঢ়, বরেন্দ্রী, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সব বিহার গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে বাস করে বহু বাঙালি আচার্য নীরবে জ্ঞানসাধনা ও সংস্কৃতিচর্চা করে গেছেন। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের কারুখচিত মূর্তির নানা বৈশিষ্ট্য তৎকালে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন যুগে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মমতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনেক মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলোও তৎকালীন বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনার পরিচয় বহন করে। খননকার্যে অনেক সময় বিভিন্ন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। তার মধ্যে আসীন, শয়ান ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিযুক্ত কোনো বিষ্ণুমূর্তি হয়তো পাল, চন্দ্র আমলের বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ধর্মের ভিত্তিতে তখন যেসব মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে, তার মধ্যে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্টভাবে দীপ্য হয়ে ওঠে।

শিকার ছিল এক সময় বাঙালির জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায়। বিশেষ করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে তখন জীবন জীবিকার বাহন হিসেবে শিকার-প্রথা প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে তার চমৎকার পরিচয় আছে। এতে ব্যাধ কালকেতুর নির্ভীক শিকার-নৈপুণ্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আমরা কৌমসমাজের শিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাই। এই ধারাটি এখনো বনাকীর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

প্রাচীন বঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি ছিলো কৃষিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা। শুধু বাঙালি কেন, একসময় ভারতবর্ষের সকল জাতিরই কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ধারার মূলে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার গুরুত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টের জন্মের দুই থেকে তিনশ’ বছর আগে বগুড়ার মহাস্থানে পাওযা একটি শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ আছে। এখান থেকে প্রাচীন বঙ্গে কৃষিকাজের প্রাধান্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওযা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত ‘রামচরিতে’ বঙ্গের ধানমাড়াইয়েব বর্ণনা আছে। সন্ধ্যাকর

নন্দী খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্ধনের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'রামচরিত' কারাখানি যদিও সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু তাতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ডাক ও খনার বচনে এই কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার কথা মৌখিকভাবে প্রবহমান (Oral Tradition) হয়ে এযুগে এসে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ব্রত উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রাক-বৈদিক যুগে আদিবাসী কৌমদের মধ্যে এই উৎসব পালিত হত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথমে ব্রত অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি না দিলেও পরে শিবপূজা, পুণ্যপুকুর, মধু সংক্রান্তি, সন্ধ্যামণি, জয়মঙ্গল, ভাদুলি, সেজুতি, লাউল, মাঘমঙ্গল, শিববাত্রি, পূর্ণিমা, ঋতু ইত্যাদি ব্রত পালনকে মেনে নেয়। বিভিন্ন মানত, দেব দেবীর পূজা, গার্হস্থ ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণ কামনায় হিন্দুনারী মাঙ্গলিক আচারের সঙ্গে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। নবান্ন বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম আদি উৎসব।

পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে খোদাই করে অঙ্কিত শিব ও শিবের বাহন নন্দী, ত্রিশূল, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলু ইত্যাদি চিত্র পরবর্তীকালে বিভিন্ন শিবমূর্তি নির্মাণের উৎস ও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এসব মূর্তির গঠন-সৌকর্য পুরাকালের বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। সপ্তম শতকে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মেরও প্রসার ঘটে। চৈনিক বৌদ্ধশ্রমণ ফা হিয়েন (খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক) ও যুয়ান চোয়াং (খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক), এদেব তথ্যবিবরণী থেকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। বঙ্গের রাঢ়, বরেন্দ্রী, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সব বিহার গড়ে উঠেছিলো, তার মধ্যে বাস করে বহু বাঙালি আচার্য নীরবে জ্ঞানসাধনা ও সংস্কৃতিচর্চা করে গেছেন। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীদের কারুখচিত মূর্তির নানা বৈশিষ্ট্য তৎকালে বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন যুগে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মমতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অনেক মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলোও তৎকালীন বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনার পরিচয় বহন করে। খননকার্যে অনেক সময় বিভিন্ন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। তার মধ্যে আসীন, শয়ান ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিযুক্ত কোনো বিষ্ণুমূর্তি হয়তো পাল, চন্দ্র আমলের বঙ্গ-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। ধর্মের ভিত্তিতে তখন যেসব মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে, তার মধ্যে তৎকালীন বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্টভাবে দীপ্য হয়ে ওঠে।

শিকার ছিল এক সময় বাঙালির জীবিকার অন্যতম প্রধান উপায়। বিশেষ করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ে তখন জীবন জীবিকার বাহন হিসেবে শিকার-প্রথা প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে তার চমৎকার পরিচয় আছে। এতে ব্যাধ কালকেতুর নির্ভীক শিকার-নৈপুণ্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আমরা কৌমসমাজের শিকার-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাই। এই ধারাটি এখনো বনাকীর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

প্রাচীন বঙ্গে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি ছিলো কৃষিনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা। শুধু বাঙালি কেন, একসময় ভারতবর্ষের সকল জাতিরই কৃষ্টি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ধারার মূলে কৃষিনির্ভর জীবন-জীবিকার গুরুত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টের জন্মের দুই থেকে তিনশ' বছর আগে বগুড়ার মহাস্থানে

পাওয়া একটি শিলালিপিতে ধানের উল্লেখ আছে। এখান থেকে প্রাচীন বঙ্গে কৃষিকাজের প্রাধান্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতে' বঙ্গের ধানমাড়াইয়েব বর্ণনা আছে। সন্ধ্যাকর নন্দী খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে উত্তববঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে পৌণ্ড্রবর্ধনের নিকটবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর 'রামচরিত' কারাখানি যদিও সংস্কৃতে লেখা, কিন্তু তাতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ডাক ও খনার বচনে এই কৃষিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থার কথা মৌখিকভাবে প্রবহমান (Oral Tradition) হয়ে এযুগে এসে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ হযেছে।

ব্রত উৎসব বাঙালি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রাক-বৈদিক যুগে আদিবাসী কৌমদের মধ্যে এই উৎসব পালিত হত। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রথমে ব্রত অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি না দিলেও পরে শিবপূজা, পুণ্যপুকুর, মধু সংক্রান্তি, সন্ধ্যামণি, জয়মঙ্গল, ভাদুলি, সেজুতি, লাউল, মাঘমঙ্গল, শিববাত্রি, পূর্ণিমা, ঋতু ইত্যাদি ব্রত পালনকে মেনে নেয়। বিভিন্ন মানত, দেব দেবীর পূজা, গার্হস্থ ও পারিবারিক জীবনের কল্যাণ কামনায় হিন্দুনারী মাঙ্গলিক আচারের সঙ্গে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। নবান্ন বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম আদি উৎসব।

আদিকাল থেকেই বাঙালি হিন্দুসমাজে বিভিন্ন দেবতা-উপদেবতার পূজা পদ্ধতি চালু হয়ে আসছে। আদিবাসী কৌমসমাজের দেবতা ধর্মঠাকুর প্রধানত অন্ত্যজ হিন্দুসমাজে পূজিত হয়। এছাড়া মনসার পূজা, শীতলা পূজা, চৈত্রমাসে চড়কপূজা, অম্বুবাচি অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজার দশমী তিথিতে শারদোৎসব, যক্ষ্মীপূজা, হোলি অনুষ্ঠান ইত্যাদি বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত চাষাবাদ, শিকার ছাড়াও তখন সমাজ উৎকর্ষের অন্যতম উপায় ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। পরবর্তী পর্যায়ে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের বিকাশ ও প্রসার ঘটে। বাংলার বস্ত্রশিল্প এক সময় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। পূর্ববঙ্গে তাঁতী এবং জোলারা সুতির বস্ত্র তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। পঞ্চদশ শতকের বাঙালি কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে জোলাদের সম্পর্কে বর্ণনা আছে। যোড়শ শতকের কবি মুকুন্দবাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও জোলা ও তাঁতীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। বাংলার মসলিন সেকালেই দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করে। মসলিন এবং জামদানী তন্তবায় সম্প্রদায়ের শিল্পনৈপুণ্যের চমৎকার পরিচয় নির্দেশ করে। রেশম পোকা থেকে তৈরি বাংলার তসর ও মুগা বস্ত্রাদি মসলিন এবং জামদানীর মতই প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশের পাটের কাপড়ের মিহি, চকচকে ও দ্যুতিময় ভাবটি সবাইকে মুগ্ধ করে। পূজা পার্বণ, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সামাজিক মেলামেশায় পট্টবস্ত্রের ব্যবহার এক সময় বাঙালির প্রায রেওয়াজে পরিণত হয়। বাঙালি যে শিল্পনিপুণ জাতি, প্রাচীন বঙ্গেব আবিষ্কৃত বিভিন্ন পদ্ধতির শিল্পের নমুনা থেকে তা প্রমাণিত হয়।

সেনযুগে ও পাল-আমলে সমাজে যে শিল্প এবং শিল্পীদের যথেষ্ট কদর ছিলো, ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন আবিষ্কৃত তখনকার তৈরি অনেক মন্দির মূর্তি বিহারে শিল্পের মনোরম কারুকাজ দেখা যায়। প্রাচীন বাংলার শিল্পী বা কারিগরদের 'কুলিক' বলা হতো। এই প্রসঙ্গে সূত্রধর বা ছুতোরদের কথা ওঠে। ছুতোর এক অর্থে কাঠমিস্ত্রিকে বোঝায়। তাদের কাজ শুধু কাঠখোদাই করা নয়, তারা স্থপতিও বটে। প্রাচীন বঙ্গের খরগেরস্থালির কাজ থেকে শুরু করে মন্দিব, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নদীতে চলমান জাহাজ,

এমনকি সমুদ্রপোতও ছুতোরগণ কাঠ দিয়ে তৈরি করত। ষোড়শ শতকের কবি শ্রীরায় বিনোদের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে তৎকালে ছুতোর কর্তৃক নৌকা গঠনের বর্ণনা আছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতীব ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃৎশিল্পের যেসব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, আজকের দিনের পোড়ামাটির শিল্পনমুনাগুলো যে তারই উত্তরাধিকার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্প্রতিক কালে বাঙালির স্থাপত্য কীর্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হযেছে। প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, মন্দির, মঠ আর মসজিদগুলো ভগ্নাবস্থায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুমিল্লার ময়নামতী ও নওগাঁর পাহাড়পুবে আবিষ্কৃত সোমপুরী বিহার, উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহার, দেবীকোট বিহার, বিক্রমপুরী বিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার ইত্যাদি বিহার প্রাচীন বঙ্গের ধর্মকর্ম ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস-কেন্দ্র ছিল। বিক্রমণীপুরের (বাংলাদেশের বিক্রমপুর) রাজা কল্যাণশ্রীর পুত্র অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান (জন্ম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, বিদ্যায় ও সংগঠনে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বরেন্দ্রভূমের বৌদ্ধ আচার্য জেতারির শিষ্য ছিলেন তিনি। অতীশ ছিলেন বিক্রমশীল বিহারেব (সম্ভবত ভাগলপুরে অবস্থিত ছিলো) মহাচার্য। অতীশ দীপংকবের সঙ্গে তাঁর আগে পরের আবো কয়েকজন স্বনামধন্য বাঙালি পণ্ডিতের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা

যায়। এঁরা হলেন বিক্রমশীল বিহারের আচার্য গৌড়ের জ্ঞানশ্রীমিত্র, বজ্রযানী গ্রন্থের রচয়িতা অভয়াকর গুপ্ত, হেরুক-সাধনের লেখক দিবাকর চন্দ্র, আচার্য রত্নাকর শান্তি, উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহাবের আচার্য বিভূতিচন্দ্র, কাপট্য-বিহারের পণ্ডিত প্রজ্ঞাবর্মা প্রমুখ। তাই বোঝা যায় প্রাচীন বঙ্গে বৌদ্ধবিহার সংঘারামগুলোই ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য- ব্যাকরণ-দর্শন-ইতিহাস চর্চার উৎস কেন্দ্র। বিভিন্ন মঠ মন্দিরে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস শেখা ছিল বাধ্যতামূলক। এছাড়াও ব্যাকবণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এসব বিষয়ের চর্চা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ হিসেবে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করে। বাঙালি সংস্কৃতির ধারাটি এভাবে তার উৎসমুখেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়।

নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার দাপটই বেশি ছিল। জ্যোতিষ, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, তর্ক, মীমাংসা ইত্যাদি শাস্ত্র পড়ানো হত বিপুল উৎসাহে। সাহিত্যের ভাষাও ছিল সংস্কৃত। তবে প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশও ভাষা হিসেবে মান্যতা পায়। তখন বাংলা প্রাকৃত ভাষা হিসেবেই গণ্য হতো। মাগধীপ্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। এই প্রাচীন বাংলায় সাহিত্য-রচনায় উৎসাহ দেখান প্রথমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। প্রাচীন চর্যাগীতিগুলো বাংলা ভাষার সেই আদিযুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবুও এই পর্বে বাঙালির সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসও যে তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরস্পরায় বিবেচ্য, এই কথাটি কোনোক্রমেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। এই সময় সংস্কৃতে বেদান্ত, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতে বেদান্ত-শাস্ত্রের চর্চা করেছেন উত্তর রাঢ়ের উমাপতি পণ্ডিত, দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট, ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত অভিনন্দ, বৌদ্ধ ব্যাকরণ ও চরকের টীকাভাষ্য অবলম্বনে রচিত 'আয়ুর্বেদ দীপিকা'র লেখক আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্ধ চক্রপাণি দত্ত, 'সারাবলী' শীর্ষক জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা কল্যাণবর্মা, লক্ষ্মণ-সেনের রাজসভার তিন সংস্কৃত পণ্ডিত ধোয়ী, শরণ ও মীমাংসা বচয়িতা হলায়ুধ প্রমুখ। প্রখ্যাত বাঙালি স্মৃতিকার ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ

জীমূতবাহনের (খ্রিস্টীয় ১১-১২ শতক) নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

সংস্কৃতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসও অক্লান্তভাবে চলে। সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা করেছেন তৎকালে অনেক বাঙালি কবি। গৌড়-অভিনন্দ নামক একজন বাঙালি কবি পদ্যে 'কাদম্বরী কথাসার' নামক গ্রন্থ লেখেন। অন্য এক অভিনন্দের লেখা 'রামচরিত' কাব্যের নাম পাওয়া যায়। তবে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। দ্বাদশ শতকের কবি শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিতে' বাঙালি জীবনাচরণের চমৎকার ছবি অঙ্কিত আছে। লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের দিক-নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়া তৎকালীন বঙ্গের অনেক বাঙালি কবির অপভ্রংশে লেখা কাব্যে বাঙালির জীবনাচরণের নানাদিকের বাস্তবসমৃদ্ধ প্রকাশ দেখা যায়।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিভিন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের পদের সংকলন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থ 'আবিষ্কার করেন। চর্যাপদ হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বঙ্গবলয় আক্রমণ করে লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করলে রাজনৈতিক কারণে বাংলা সাহিত্য ক্রমে মধ্যযুগের পথ তৈরি শুরু করে। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এতকাল যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে বাঙালির অধিবাস ছিল, ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তনের আভাস দেখা দেয়। বাঙালির এতদিনের লালিত সংস্কৃতিতে তখন মুসলিম সংস্কৃতি প্রায় সগৌরবে প্রবেশ শুরু করে। মুসলিম আইন-কানুন, ইরান-তুরানের ঐতিহ্য এদেশীয় সংস্কৃতির উপর নানাভাবে ছায়াপাত ঘটাতে থাকে। মুসলিম শাসকবর্গের প্রতিপোষণেই যে তা সম্ভব হয় তা বলা যায়। রাজকার্য পরিচালনায় মুসলিম সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সরাসরি হলেও সম্পূর্ণ নতুন এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে এদেশবাসী প্রথমে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তবুও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম শাসকশ্রেণি ইরান তুরান থেকে আনিত সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশীয় সংস্কৃতির একটা সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেন। ফলে এদেশে ইসলামি শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর কালক্রমে দেশীয় জনসংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশীয় সংস্কৃতির সংযোগ বাড়তে থাকে। তার আর একটি কারণ এই যে, মুসলমানগণও তখন আর বিদেশি ছিল না। কালচক্রে তারাও তখন বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়। রাজকার্যে ও ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে ফারসি জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য তথা আমলা ও মুনশীদেব কদর বাড়ে। ইরানের সুফীবাদও এদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করে। ক্রমে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি জনমনে আবেদন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়। পরিণতিতে সমাজে আউল-বাউল, ফকির-দরবেশদের আগমন ঘটে। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারাটিও সুফী ভাববাদের সংস্পর্শে নবরূপ লাভ করে। এছাড়া মুসলিম সংস্কৃতি থেকে বাংলার শাসনকার্যে উজির, নাজির, কাজী, মুনশি ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে। অনুরূপভাবে আদব, কায়দা, খেতাব খেলাত, উর্দি, কুর্তা ইত্যাদি মুসলমানি শব্দগুলোও অভ্যস্ত জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রেও ইসলামি সংস্কৃতির দান উপেক্ষণীয় নয়। শাল, মসলিন, কিংখাব, কার্পেট ইত্যাদির ব্যবহার এবং সোনার গয়না কিংবা রৌপ্য বা তামার থালা-ঘটি-বাটিতে মিনার কাজ এসব প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সংস্কৃতিরই দান। বিভিন্ন সৌধ বা মসজিদগাত্রে খোদিত কিংবা চিত্রকলায় প্রতিফলিত শিল্পকর্ম দেখলে ইসলামি সংস্কৃতির

মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া সংগীতের একটি বিশেষ ধারায়, খেয়ালে, ঠুমরিতে, গজলে ইসলামি সংস্কৃতিকেই অবলম্বন করা হয়।

মুসলমানদের আগমনে বিদেশি প্রভাব ছায়া ফেলায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই অভিনব সংযোজনায় দেশীয় সাহিত্য নতুনভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। ভাষা-ব্যবহারে ও সাহিত্যচর্চায়ও অতঃপর মুসলিম ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুরু করে। পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণু মুসলিম শাসকগণও হিন্দু ঐতিহ্য প্রভাবিত দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবিদের উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। হুসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে বঙ্গে সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার সাফল্য প্রায় তুঙ্গে ওঠে। এই মহান সম্রাটকে হিন্দু সম্প্রদায় কৃষ্ণের অবতার রূপে মনে করতেন। বৈষ্ণবদের কাছে তিনি ছিলেন 'নৃপতিতিলক' ও 'জগৎ-ভূষণ'। মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ও বিজয়গুপ্ত তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। হুসেন শাহেব পুত্র নসরত শাহও (১৫১৯-১৫৩২) বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহ ও নসরত শাহেব সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের ও পরাগল ও ছুটি খাঁর অনুপ্রেরণায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। শুধু বাঙলা নয়, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমান শাসকগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। পাঠানযুগে মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' রচিত হয়; সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবি আলাওল বাংলায় 'পদ্মাবতী' নামে কাব্যের অনুবাদ করেন। তাছাড়া কবীরের দোহা ও তুলসীদাসের 'রামচরিত'ও পাঠানযুগেরই অবদান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজীর বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, আবদুল হাকিম, দৌলত কাজী, আলাওল, ফকিব গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ মুসলিম কবির অবদানে সমৃদ্ধ হয়।

মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শুরুতে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মসূত্রে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে বঙ্গদেশে বহু হিন্দুস্তানি ও অবাঙালির আগমন ঘটে। এদের আগমনের ফলে বাঙালির কথার বুলিতে হিন্দি উর্দু অর্থাৎ হিন্দুস্তানি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে শিক্ষিত ও অভিজাত বংশের পারিবারিক জীবনে বাংলার সঙ্গে উর্দু হিন্দি মিশ্রিত ভাষার রেওয়াজ। তুর্কিদের বঙ্গবিজয়ের পর মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাবে বঙ্গে ফারসি দরবারি ভাষার মর্যাদা পায়। রাজকার্যে এবং ব্যবহারিক জীবনে সঞ্চারিত ফারসি ক্রমে সাহিত্যেও অনুপ্রবেশ করে। ফলে হিন্দু-মুসলমান অনেক কবির কাব্যে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে ভাবতচন্দ্রের কাব্যেও ফারসি শব্দের প্রযোগ দেখা যায়। উর্দুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষায় যেসব মুসলমানি পুথি রচিত হয়, যেমন ফকির গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলেখা', সৈয়দ হামজার 'জৈগুনের পুথি' ইত্যাদি কাব্য দোভাষী পুথি হিসেবে পরিচিত। এভাবেই বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন যুগে যুগে সাহিত্যে, শিল্পে, ধ্যানে-জ্ঞানে, সংস্কারে উপচারে নানাভাবে বিকাশ লাভ করে।

১.৭. অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন কোনটি?

২। দুটি দোভাষী পুথির উদাহরণ দিন।

৩। কুলিক কাদের বলা হয়?

৪। 'কজঙ্গল' কী

৫। বাঙালি জাতি বলতে কাদের বোঝায়?

৬। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থ আবিষ্কার করেন?

৭। বাঙলায় প্রচলিত দুটি ব্রতের নাম লিখুন।

৮। 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ রয়েছে এমন দুটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

৯। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

১০। নিষাদ কাদের বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। কর্ণসুবর্ণ, পুরাভূমি ও রাঙামাটি বলতে বাংলার কোন কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে?

২। লোকপ্রকৃতি বলতে কী বোঝায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। বৃহৎশিরস্ক জাতি বলতে নৃতত্ত্ববিদেরা কাদের বুঝিয়েছেন?

৪। অতিসম্প্রতি মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে কী তথ্য পাওয়া গেছে?

৫। প্রাক্ দ্রাবিড় শ্রেণী কিভাবে বাঙালিত্বের সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করুন।

৬। বাংলায় আদিম মানুষের বংশধর হল উপজাতিরা এই তথ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

৭। অতি সংক্ষেপে বাঙালি জাতির উদ্ভবের ইতিহাসটি চিহ্নিত করুন।

৮। বাংলার সংস্কৃতিতে ইসলামি অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

১। ভৌগোলিক পরিচয় বলতে কী বুঝি? এর সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক সূত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

২। বাংলার ভূ-প্রকৃতি জলবায়ু এবং লোকপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখুন।

৩। বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় মূল্যায়ন আপনি কিভাবে করতে চান, তার বিস্তার করুন।

৪। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নানান গবেষণা ও ধারণায় কিভাবে রূপ পেয়েছে, তার বর্ণনা দিন।

৫। বাংলার সংস্কৃতিতে ইসলামি অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৬। বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলাদাভাবে দেওয়ার প্রয়োজন কোথায় এবং তা কিভাবে দেওয়া হবে, তা সংক্ষেপে লিখুন।

৭। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির মূল প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করুন।

একক ২ ❒ বাংলার সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তি

২.১. উদ্দেশ্য
২.২. প্রস্তাবনা
২.৩. বাংলার সমাজ কাঠামো
২.৪. প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুগে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি
২.৫. আধুনিক যুগে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি
২.৬. উপসংহার
২.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১ উদ্দেশ্য

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কয়েকজন মানুষ বা ব্যক্তি মিলে একটা সমাজ গঠন করে। সেই সমাজ ব্যক্তিবর্গের কল্যাণের জন্যই নানান নিয়মকানুন বিধিনিষেধ তৈরি করে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানান সমাজের দেখা পাই। বাঙালিদেরও সমাজ আছে। সেই সমাজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অর্থ বা অর্থনীতি ছাড়া সমাজ জীবন অচল, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। তবে প্রাচীনকালেও অর্থনীতির নির্ভরতা ছিল। যদিও প্রাচীন ও বর্তমান কালের অর্থব্যবস্থায় অনেক পার্থক্য। বাঙালি সমাজের সেই গঠন ও বিবর্তনের ধারা এবং প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি ও বর্তমান বাংলার অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

২.২ প্রস্তাবনা

প্রথমে 'সমাজ' কথাটি স্পষ্টভাবে বোঝার দরকার আমরা অনুভব করেছি। সমাজের একক হল ব্যক্তি। ব্যক্তিদের সংহতি বা একত্রীভবন হল সমাজ। একই প্রয়োজনে কিংবা একই ফল লাভের জন্য একীভূত (unified) ভাবের নামই সমাজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে দেখি না, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দেখতে পাই। সমাজ ব্যাপারটা আসলে একটা বিমূর্ত (abstract) ধারণা বা ভাবনা। তার ক্রিয়াকলাপে (অন্যায়ের নিন্দা, সততার প্রশংসা, ব্যক্তিকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা) ঐ বিমূর্ত ভাবনাটি সাকার হয়ে ওঠে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসব বা মেলা বলতেও সমাজ শব্দ ব্যবহার করা হত। উপাসনাস্থলকে সমাজ বলা হত (যেমন ব্রাহ্মসমাজ)।

যখন আমরা সমাজ কাঠামো নিয়ে ভাবতে চাই, তখন সেখানে একটা গড়ার প্রশ্ন ওঠে। একজন নয়, অনেকে মিলে সমাজ কাঠামো তৈরি করে। কাঠামো বলতে এখানে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, সমষ্টির জন্য স্বার্থত্যাগ, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ, সাংসারিক বিধি-নিষেধ যেমন বোঝানো হয়, তেমনি এই কাঠামো খুব কঠোর বা শিথিলও হতে পারে। এই সমাজ বদ্ধ (closed) বা খোলামেলা (open) এই দুই ভাগে

ভাবা যেতে পারে। বন্ধ সমাজে নিজেদের গোষ্ঠীর অনেক কিছু গোপন থাকে বাইরের মানুষের জন্য। আর খোলামেলা বা open societyé-তে গোপনীয়তা থাকে না। সমাজ আবার দু'ধরনের হতে পারে: গ্রাম্য এবং নাগরিক (শহুরে)। নাগরিক সমাজ যত তাড়াতাড়ি পালটায়, গ্রাম্য সমাজ সে তুলনায় কম পরিবর্তনশীল।

অর্থ এবং সেই সংক্রান্ত নীতি-নিয়মাবলীকে আমরা সমাজের ভিত্তিমূল বলতে পারি (Baseéôé structure)। এর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতার বনেদ-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপায়ণ। যখন কোনো লেখকের বই বাজারে কাটে না কিংবা শিল্পীর ছবি-ভাস্কর্য কোনো সচ্ছলতা এনে দেয় না, তখন বুঝতে পারি এরা অর্থনৈতিক ভাবে নিষ্ফল। পরে যখন ওদের বই ছবি মূর্তি লাগামছাড়া দামে বিক্রি হয় সাধারণভাবে বা নিলামে, তখন এরাই সফল বলে গণ্য হন। হয়তো জীবৎকালে অর্থের প্রাচুর্য পেলেন না। কিন্তু পরে ঐসব নিদর্শনই অর্থনৈতিক বিচারে অমূল্য বা দামি বলে গৃহীত হল। অনেকদিন আগে ভবভূতি বলেছিলেন: ক্ষুণ্ণঅন্নচিন্তা চমৎকারা কবিতা কাতরে কুৎক্ষ্ম অর্থাৎ ভাতের অভাব হলে কবিতার কল্পনা কোথায় ভেসে যায়। এখানে 'অন্নচিন্তা'র বদলে 'অর্থচিন্তা' ব্যবহার করতে পারি। একটি রাষ্ট্রের মানুষদের সচ্ছলতা-সফলতা-মনীষার বিকিরণ (যেমন মহাকাশ যাত্রা) সবই অর্থের ওপর ভর দিয়ে চলে। একসময় অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ না মনে করায় সমস্যা ধরা যেত না। বিবেকানন্দ পরিহাসের সুরে বলেছিলেন: 'টাকা থাকলেও গোল, না থাকলেও গোল।'

অর্থনীতি সব কিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা শুধু সৃষ্টির জগৎ নয়, ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া রাজনীতিকেও চালনা করছে। এখন বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি যেমন স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য রাজস্বের পরিমাণ, করের পরিমাণের ওপর চলছে, তেমনি আমাদের রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, লেনদেন, জমা-খরচের দিকটা যথেষ্ট বিবেচনার বিষয়। ব্যক্তিগত মালিকানা সরকারি মালিকানা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বাণিজ্য জগৎ, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় সব কিছুর মূলে অর্থের ভূমিকা ধরা পড়ে।

বিখ্যাত বাগ্মী সাংসদ এডমন্ড বার্ক তাঁর 'Reflections in the Revolution in France' রচনায় লিখেছিলেন: "The age of chivalary is gone....that of Sophisters– economists and calculators, has succeeded, and the glory of Europe is extinguished for ever."-এর বাংলা অর্থ হল 'সৌজন্য-সম্ভ্রমের যুগ চলে গেছে। এখন কৌশলী প্রতারক, অর্থনীতিবিদ এবং হিসেবীরা উত্তরাধিকারী হয়েছে; য়ুরোপের গৌরববিভা নিভে গেছে চিরকালের মতো। ১৭৯০ সালে বার্ক অর্থনীতিবিদদের নিন্দাই করেছেন। অথচ আজকের যুগে অর্থনীতি ছাড়া দুনিয়া অচল, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই তার ওপর নির্ভরশীল।

এডমন্ড বার্ক হয়তো অষ্টাদশের শেষ দিকে ভদ্র সৌজন্যের বিদায় গ্রহণ এবং অর্থনীতির অভ্যুদয়কেই বুঝেছিলেন। আজকের জগতে যে রূঢ়তা অমানবিকতা ও সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করা মানসিকতা এসব হয়ত তারই ফলাফল।

২.৩ বাংলার সমাজ কাঠামো

গ্রামীণ সমাজ বংশানুক্রমে কৌলিক বৃত্তি (family profession) পালন করত? খাদ্য উৎপন্ন না

করলেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা তার অংশ পেতেন। শুধু খাদ্যই নয়, সারা জীবন গ্রামের মানুষের জীবন একটা নিয়মিত ছন্দে প্রবাহিত হত। একে বলতে পারি সামাজিক প্রথা (custom) এবং ঐতিহ্য (tradition)। এই দুইয়ের মধ্যে অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি বাঁধা পড়ত। ফলে কোনো পরিবর্তনের সামান্য ঢেউ সেখানেও লাগত। কিন্তু কোনো কিছু শিকড়হীন (rootless) হত না, বেপরোয়া কিছু ঘটত না।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণীরূপ (social classification) খানিকটা স্তরবদ্ধ (ramification) ছিল। রাজা বা শাসক এবং প্রজা বা শাসিতের মধ্যে ছিল অপার ব্যবধান। রাজা ছিলেন খানিকটা রবীন্দ্রনাথের রাজার মতো জনবিচ্ছিন্ন নির্জনতার শিখরে অদৃশ্য দেবতার মতো। প্রজারা থাকত বাস্তবের রাজ্যে কঠোর পরিশ্রমের মাঝখানে। তাদের মাঝে থাকতেন জমিদার বা জায়গিরদার শ্রেণী। খাজনা বা কোনো উৎসব প্রাঙ্গণে এদের দেখা সাক্ষাৎ হত নির্লিপ্ততা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠায়। জমিদারের কর্মচারীরা গ্রাম্য সমাজের শ্রেণীর মধ্যে পড়তেন না। হয়তো একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল, কিন্তু তারা নিষ্প্রভ ছিল।

গরিব ব্রাহ্মণ তার বৃত্তির জন্য প্রতাপ দেখাতে পারতেন। বণিক, কারিগর, কৃষক সেদিক থেকে সামাজিক প্রভাবে হীন ছিল। গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিভূমি ছিল শতকরা নব্বই জন চাষী। বাকি শতাংশের মধ্যে জমিদারী আমলা, রাজকর্মচারী, কারুশিল্পী, সম্পন্ন কৃষক (wealthy farmers), ব্রাহ্মণেরা ছিলেন। ইংরেজ আমলে এই কাঠামো খানিকটা নড়েচড়ে গেলেও মৌলিক কোনো বদল ঘটে নি। মুঘল যুগের চেয়ে ইংরেজ শাসন অনেক বেশি বিপর্যস্ত করেছিল গ্রাম্য সমাজকে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা, অর্থনৈতিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-ভাবনা চলে আসা গ্রামীণ সমাজকে সংকটের মুখোমুখি করেছিল।

১৭৯৩ নাগাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) চালু হল। ১৭৬৫ থেকে ২৮ বছর ধরে এদেশি জমিদারদের সামাজিক রূপ ইংরেজদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই স্পষ্টতা এসেছিল তাদের প্রশাসনিক স্বার্থ চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে। জমিদাররা ক্রমেই ধনী হয়ে উঠছিলেন, ক্ষমতার দিক থেকেও।

১৭৭০ সালে মন্বন্তরে বাংলার গ্রামগুলি জনহীন হয়ে পড়েছিল। জমিদাররা সূর্যাস্ত আইনের (sunset law) কঠোরতায় অনেকে নিঃস্ব হয়ে যান। আরেক দল কলকাতায় দেওয়ানী- বেনিয়ানী-মুৎসুদ্দিগিরি করে নব্য ধনীতে পরিণত হলেন। এরা শহর ও গ্রামে প্রচুর জমি কেনেন।

জমিদাররা যখন রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদার হলেন, তখন এক নতুন উপশ্রেণীর (subclass) সৃষ্টি হল। এরা হলেন গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক রইল না। নীলচাষ বাংলার কৃষিক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটাল। ফলে ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহ হল। ইতিমধ্যে কলকাতায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করে ইংরেজরা শিক্ষা বিস্তার করলেন। যদিও তাদের লক্ষ্য ছিল কেরানি তৈরি করা, সচেতন নাগরিক নয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্ম, সতীদাহ প্রথা রদ ইত্যাদির ফলে দেশে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেল। ১৮৯০ নাগাদ কলকাতায় নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ দেশ প্রচলিত ঐতিহ্য, ধর্ম, রাজনীতিকে, সমাজকে নতুন করে যাচাই করতে চাইলেন। কিছু আগের ডিরোজিয়ান, ব্রাহ্ম, হিন্দুদের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সমাজের পুরনোপন্থীদের সংঘর্ষ হল শারীরিক-মানসিকভাবে। সেকালের বইপত্র খবরের কাগজ এর সাক্ষ্য বহন করছে। পাইক-চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নবাবদের পরিবর্তে নতুন নবাব বা হঠাৎ নবাবদের (ঞ্জব্রন্দ্র ঞ্জুথত্নদ্রদ্রত্ন) দৌরাত্ম্য সব

মিলে বাঙালির জীবনে অস্থিরতা দেখা দিল। এতে গ্রামজীবনও জড়িয়ে পড়ল। কেননা কলকাতার শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই গ্রামীণ ছিলেন। তাদের নানান কাজকর্ম ও সব মিলে গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। এছাড়া বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল গ্রামাঞ্চলে, শহরে নয়।

একই সময়ে বাংলার সামাজিক মননে জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঞ্চার হল। ব্রিটিশ বা মোগল আমলের থেকে প্রাচীন হিন্দুরা ছিলেন শতগুণে ভালো-এরকম একটা চিন্তা যুবকদের একাংশকে মথিত করল। ফলে এই কালে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার পুনরুত্থান দেখা দিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এই মোহ থেকে সংস্কৃতি-শিল্পজগৎও বেরিয়ে আসতে পারে নি। এমনকি আশিস নন্দীর বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথও এক বিরাট সময় জুড়ে পুনরুত্থান বা নব অভ্যুত্থানে সাড়া দিয়েছিলেন। আসলে শিক্ষিত রুচিবান বাঙালিরা নিজেদের একটা আত্ম-আবিষ্কারের খোঁজ করছিলেন। সামাজিক জীবনে ইংরেজি আদব কায়দা, চালচলন যেমন জায়গা করে নিচ্ছিল, তেমনি নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে অনেকে হিন্দু সভ্যতার শরণ নিলেন। ব্রাহ্ম-ইংরেজ-হিন্দু সভ্যতার স্পর্শে শহুরে ও গ্রামীণ সামাজিকেরা শশব্যস্ত হলেন।

১ ৯ ১ ১ সল থেকে ব্রিটিশ স (মাঝখানে কালান্তর থাকলেও) বাঙালির জীবনকে বদলে দিল ভীষণভাবে। পুরনো সামাজিকতা, মূল্যবোধ নতুন কালের রঙে, অর্থের গরিমায় যাচাই হল। বাঙালি এর মধ্যে বিশ শতকের গোড়া থেকেই নানান প্রকারে স্বাধীনতা, স্বরাজের, অসহযোগের আন্দোলন চালিয়েছে।

স্বাধীনতার পথিকরা চরম (extremist) এবং নরম (moderate) দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। বাঙালির সামাজিক জীবনে যে জাতিবৈরিতা আগে দেখা দেয় নি, তা ইংরেজ দ্বারা লালিত হয়ে নতুন চেহারা নিল। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় বাঙালির দ্রোহ নজর কাড়ল। অনেক প্রাণের বিনিময়ে রাজনৈতিক যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম, তা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল। উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা, নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার জ্বালা বাঙালি বুঝল।

ধীরে ধীরে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অলসতা, আত্মসন্তুষ্টির সুযোগে, আত্মীয়তার সুবাদে একটা নতুন সমাজ জীবন তৈরি করল। সে শুধু শহরে নয়, গ্রামেও ঘটল। অথচ এই দুটি অঞ্চলের ফারাক ছিল বিস্তর। প্রথমে একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও পরে তা অনেকটা মসৃণ হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গে হারানো বাড়ি ঘর জমি নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো কেউ বিশেষ নেই। তারা মনে করছেন অতীত স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আর পশ্চিম বাঙালিরা এই ঘরছাড়া ছিন্নমূল মানুষের উদ্যোগ-প্রয়াসে সাড়া দিয়েছে। ফলে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে বাঙালির। গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত মানুষের শহুরে কিংবা বিশ্ব নাগরিক হওয়ার বাসনা বাঙালি সমাজে অভিপ্রয়াণের (migration) এক সুন্দর প্রয়াস। শিক্ষা, গবেষণা বা চাকরির জন্য গ্রামের অনেকে বিদেশে থাকছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে থাকার অভ্যাস প্রবাসী বাঙালি সমাজ গড়ে তুলছে। দুঃখের বিষয় অন্য রাজ্যে থাকার সময় তারা নানা কারণে নতুন রাজ্যের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বরণ করছেন। বাঙালি সেখানে অন্যের ভাষা সংস্কৃতি শিখছেন বাধ্য হয়ে কিংবা সুযোগ সুবিধা পাবার আশায়। ফলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একটা ভাষা সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটছে। একে আমরা বাঙালি হয়ে জন্মানো মানুষের আন্তঃসাংস্কৃতিক রূপবদলই (crosséôécultural transformation) বলব।

মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মহাযুদ্ধের অভিঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সর্বোপরি

রাজনৈতিক আসক্তি নিরাসক্তি কিংবা চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ বাঙালির চেনা পরিচয়, গ্রাম-শহরের ফারাক (জীবন ও চেতনায়), অনেকটাই পালটে যাচ্ছে। বহু জনপদ যেমন অভিপ্রয়াণের সূত্রে জনহীনতায় ভুগছে, তেমনি রাজ্যের প্রশাসনিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠছে। পাশাপাশি বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য যাটের দশক অবধি যেভাবে বর্ধমান ছিল, তা অভিনব মোড় নিয়েছে। বাঙালি ক্রমেই নিজের শক্তিতে আস্থা না রেখে সরকারি সাহয্যের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। সরকারি দাক্ষিণ্য সামাজিক মানুষের মধ্যে একটা আশা পূরণের জগৎ গড়ে তুলছে।

বাঙালি কৃষিজীবী হলেও একসময় সে চাকরিকেই পরমার্থ লাভ ভেবেছিল। এখন সমাজে সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ সাংঘাতিক। শিক্ষকতায় বহু গুণ বেতন বাড়ার ফলে সেদিকেও বাঙালি সমাজ ভিড় করছে। জমিজমা আগের মতো লাভজনক নয়। তাই বাঙালি সমাজ ছোট শিল্পে, চাকরিতে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে বাঙালি সমাজে কেরানি, ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে। নগদ নারায়ণের মহিমায় তার চাষবাস অবহেলিত, যোগাযোগের উন্নতিতে দূরের জায়গা এখন অদূর হয়েছে, শিক্ষা অনেক বাড়লেও ছাত্ররা মাধ্যমিকের আগে বা ঐ সময়ে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এই অপচয়িত ছাত্রদল সমাজের সমস্যা তৈরি করছে। যদিও সরকারী প্রয়াসে এদের শিক্ষাঙ্গনে ফেরানোর প্রস্তুতি চলেছে।

২.৪ প্রাচীন ও মধ্যযুগে যুগে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে জীবন ও সমাজের ভিত্তি বা বনেদ হল অর্থনীতি। সেখানে কোনো মন্দা বা বদলের স্রোত এলে তা ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজে আবর্ত ও স্থিতি (rotation and stabilisation) আনে। প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিকল্পনা হত, সেখানে অর্থ আসত কীভাবে? রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে উৎপাদিত ধনের আংশিক ভোগ করতেন। ব্রাহ্মণেরাও একইভাবে সুযোগ ও অধিকারে ধন ভোগ করতেন। আসলে ধন উৎপাদনের উপায় ছিল তিনটি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য। দেশের উৎপাদন যেমন আর্থিক শক্তি বাড়াত, তেমনি দেশ-বিদেশে বাণিজ্যের ফলে ধনাগম হত। এর ওপরেই নির্ভর করে রাজা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতি সবকিছুই বিকশিত হত।

প্রথমে কৃষি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক: কর্ষণযোগ্য ভূমির (উর্বর ঝিলভূমি) খুব চাহিদা ছিল। খনার বচনে (যদিও ভাষায় এ কালের ছাপ পড়েছে) কোন ঋতুতে কী শস্য বোনা হবে, শস্যশালিনী জমি, কৃষিপ্রধান সমাজের ছবি পাই। চৈনিক পরিব্রাজকও বলেছেন এ দেশের শস্যভাণ্ডার উৎকৃষ্টমানের। পুন্ড্রবর্ধনের বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি এবং শস্য উৎপাদন তাঁর চোখে পড়েছিল। স্থল ও জলপথের কেন্দ্র তাম্রলিপ্তিতে দুস্প্রাপ্য জিনিষ মজুত করা হত। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও খুব ধনী ছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকায় বাংলার আকর দ্রব্যের কথা জানা যায়। হীরার খনির উল্লেখ পাই সেখানে। আইন-ই-আকবরীতে গড়মান্দারণে হীরকখনির কথা আছে। গৌড়িক নামে খনিজ রূপার নাম সেখানে আছে। ভবিষ্য পুরাণে লোহার খনি, তামার খনি উল্লিখিত হয়েছে। তবে এসবই খ্রিস্টপূর্ব সময়ের তবে এ যুগে ছাড়াও গাঙ্গেয় মুক্তার সন্ধান পাই।

শিল্পজাত দ্রব্য-প্রাচীন ও মধ্যযুগ

১. বস্ত্রশিল্প। দুকূল, মুগা, ক্ষৌম এসব কাপড়ের উল্লেখ পাই। এগুলি বিদেশে রপ্তানি করাও হত। মসলিনের বিদেশে কদর ছিল।

২. এখানকার মুক্তো খুব উঁচুদরের না হলেও পশ্চিম এশিয়া, মিশর, গ্রীসে, রোমে চালান যেত।

৩. ত্রিপুরার যেসব বণিক ঢাকায় যেতেন, তারা সোনার টুকরোর বদলে প্রবাল, অয়কান্ত মণি, সমুদ্রশঙ্খের কিংবা কচ্ছপের খোলার বালা নিয়ে যেতেন।

৪. কার্পাস উৎপাদন ও তার ব্যবসার ছিল ফলাও কারবার। কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ এবং কাপড় শিল্পই বাংলার প্রাচীন পর্বের সবচেয়ে বড়ো শিল্প ছিল এবং এ থেকে প্রচুর ধন উৎপাদিত হত।

৫. মধ্যযুগের পট্টবস্ত্রের কথা খুব শোনা যায়। পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল। পাটের চাষ বহুল পরিমাণে না হলেও তা সামান্য হত, এমন বলতে পারি না।

৬. চিনি বিক্রি করে দেশে প্রচুর টাকা আসত। সিংহল, আরব, পারস্যে চিনি রপ্তানি হত।

৭. নুন ও মাছের ব্যবসা অষ্টাদশ শতক অবধি ভালই চলেছিল। মাছের একটা আন্তর্জাতিক বাজার ছিল।

কারুশিল্প: ভাস্কর্য এবং অলংকার শিল্প

সোনা, রূপা, মণি, হীরায় নানান অলংকার মথিত হয়ে ধনী মানুষ এবং দেবতার জন্য ব্যবহৃত হত। লক্ষ্মণ সেনের সোনার থালায় কিংবা রুপোর বাসনে আহার গ্রহণ সবটা গল্প নয়। একালেও বহু রাজবাড়িতে এই ধরনের সোনা রূপার থালা-পাত্রের ব্যবহার না করলেও সংগ্রহে রেখেছে।

লোহার তৈরি তরবারি (দু-মুখো), যুদ্ধাস্ত্র, কৃষিকর্মের যন্ত্রাদি কর্মকার (কামার) শ্রেণীর লোকের প্রাচুর্যের কারণ ছিল। কুম্ভকার-বৃত্তি গ্রামে দেখা গেলেও পোড়ামাটির নানান জিনিষ তৈরি হত (জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ, বাটি, থালা)।

হাতির দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। এমনকি পালকিতে যে হাতল ব্যবহার করা হত, তাতে হাতির দাঁতের ব্যবহার করত বড় মানুষেরা।

কাষ্ঠশিল্প

আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পাল্কি, গোরুর গাড়ি, রথ, নৌকা, জাহাজ সবই কাষ্ঠশিল্পের অন্তর্গত। কাজেই কাঠমিস্ত্রিদের এক বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল।

নৌশিল্প

নদী সমুদ্রগামী নৌকা ও জাহাজ শিল্পের প্রচলনও ছিল। ফলে বন্দর গড়ে উঠেছিল। মহানাবিক বৌদ্ধগুপ্তের নাম সুখ্যাত ছিল। নৌবাণিজ্যও সবচেয়ে বেশি হত।

মুদ্রাব্যবস্থা

গণ্ডক, তাক্ষণিক মুদ্রা প্রথম খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত থাকলেও এদের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে পারি নি। কলিত মুদ্রার আগে সীসা, রুপো, তামার মুদ্রা ব্যবহার করা হত। গুপ্ত আমলে সোনা-রুপোর মুদ্রা দেখতে পাই। সেন আমলে সোনার মুদ্রা নেই, এমনকি রুপোর মুদ্রাও পাই না। সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে প্রচুর সোনা রুপোর মুদ্রা আমদানি হত। অষ্টম শতক থেকে বাঙালির বহির্বাণিজ্য প্রায় ছিল না।

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক কাঠামো

সমাজে চাষবাস থেকে কারু-দারু ও চারুশিল্পের জন্য বিভিন্ন পেশার লোকজন ছিল। কামার, কুমোর, জুতোর, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, নুন তৈরিতে দক্ষ মুলুঙ্গি, পান উৎপাদক বারুই, পালকিবাহক কাহার এছাড়া চাষি, বণিক, অন্যান্য কর্মে যুক্ত শ্রমিক বাঙালির অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল। সমাজে ধনবৈষম্য ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর খণ্ডে নানান পেশার মানুষের কথা মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের মতো উদ্ধার করা হয়েছে।

মুদ্রা ও বিনিময়

বাংলা চিরকালই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। বিভিন্ন বিনিময় (ত্নথন্ষ্ঠত্রন) ব্যবস্থাও ছিল। অন্য রাজ্যের মুদ্রা ব্যবহার করা হত। কড়ির প্রচলন ছিল।

কৃষিশিল্প দ্রব্য

ধানই মুখ্য সম্পদ। পাহাড়ি জায়গায় তুলার চাষ হত। লঙ্কা, আখ, সুপারী প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন হত। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে গুড় চিনি উল্লেখ্য। পাহাড়ি সেগুন, জারুল, গর্জন কাঠের রপ্তানি চলত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

নেপাল-তিব্বতের পণ্য আমদানি হত তমলুক, সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), বাংলা, হুগলী, চট্টগ্রামের বন্দরের মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্য করত ধনীলোকেরা, বাকিরা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। চাষি ও অন্য পেশার মানুষরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। ঐ সব বন্দরে বাঙালি ছাড়াও মধ্য ইরান, আরব, উত্তর ভারতের বণিকরাও থাকতেন। যোল শতক থেকে য়ুরোপীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যের রাশ হাতে তুলে নিল। মুকুন্দ পণ্য বিনিময়ের তালিকা দিয়েছেন। তখনও মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হয় নি। গোমস্তা বেনেরাই ছিল মধ্যশ্রেণীর। এরা ছাড়া প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর ছিল। বারবোসা সোনার গাঁকে 'বাঙ্গালা শহর' বলেছেন। ফিচ ও পিরেঙ্গের বর্ণনায় এর সমর্থন মেলে। বারবোসা বলেছেন: বড় বড় বণিকেরা জাহাজের মালিক ছিলেন। অনেক মালপত্র বড়ো বড়ো জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হত। চোলমন্ডল, মালাস্কা, সুমাত্রা, পেরু, কাম্বোদিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখানকার পণ্যদ্রব্য যেত।

পিরেস যেমন বলেছেন বাঙালিরা খুব বণিক জাতের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্বাধীন প্রকৃতির। সব বাঙালি বেনেই সাধুতার ধার ধারতেন না।

সোনার গাঁয়ে চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হত। কেননা গঙ্গার মোহনা চট্টগ্রামের কাছেই ছিল। বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী বাংলার বহিঃ এবং আন্তঃবাণিজ্যের যে বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে অত্যুক্তি ছিল না। চন্দন, মুসাব্বর (ঘৃতকুমারী), চাল আবিসিনিয়া, গ্রীস, আরব, ইরান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে রপ্তানি হত। পর্যটকদের বর্ণনায় এর পক্ষে সাক্ষ্য পাই।

বারবোসা এখানে উৎপাদিত দ্রব্যের নাম করেছেন তুলো, আখ, আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, লেবু, শুকনো ফল (dry fruits)। শিল্প তালিকায় আছে মিহি ও রঙিন কাপড়, সারব্যস্ত, মামোলা, দাগায়জা (ওড়না), চৌতার (সুতির জামার কাপড়), বিতিলহা ইত্যাদি কাপড়, বিচিত্র সুতি কাপড় প্রভৃতি।

চতুর্দশ শতকে কড়িই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange)। এক টাকা মানে ১৫২০ কড়ি। তাল ও খেজুরের রস থেকে মদ তৈরি হত। গাছের ছাল দিয়ে কাগজ তৈরি করত (ভূর্জপত্র বা প্যাপিরাসের মতো)।

২.৫ আধুনিক যুগে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বাঙালির অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত্তি অনেক পালটেছে। এ যুগে যেমন চাষবাসের ধান আছে, তেমনি পাট একটা শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল। একেবারে হাল আমলে পাটের সেই বাজার বা রমরমা নেই। উৎপাদিত দ্রব্য প্রায় একই থাকলেও বস্ত্রশিল্পে বাঙালির প্রাচীন গৌরব আর নেই, সুতির জায়গায় নতুন কাপড় আসছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে। ফলে বাংলার বস্ত্র বা পাটশিল্প তার মহিমা হারিয়েছে।

এখনও বাংলার রফতানি হল ফলমূল, ফুল, প্রতিমাশিল্প, পাথর বা কাঠের কাজ, বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্প, বালুচরী, কাঁথা-শাড়ি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। আগে যেমন ভারতের শেফিল্ড বলে খ্যাত বাঙালির বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য এখন তার সেদিন নেই। প্রাচীন যুগ থেকে চিনির যে কারবার বাঙালি চালিয়েছে, তা এখন অস্তিত্বহীন। চিনিকলের পাশাপাশি ধানকল (রাইস মিল) আগের মতো দাপুটে ব্যবসা করে না। তবু বাংলার চাল, কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবসা এখন অনেকটা কেন্দ্রীয় অধীনে গেলেও সুখ্যাতি বজায় রেখেছে।

বাংলার রাজস্ব, বৃত্তিগত আয়, ব্যবসাগত আয়ের অনেকটাই চলে যায় যুক্ত তালিকায় (concurrent list)। এর থেকে যেমন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে বা অন্যান্য খাতে কিছু টাকা বাংলা পায় কিন্তু তার পরিমাণ যৎসামান্য। যানবাহন, পৌরনিগম, পৌরসংস্থা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি থেকে বাংলা সরকারের কিছু আয় হয়। তবে কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্যে সব রাজ্য সরকারের অর্থাভাব লক্ষ করি। বাংলা তার ব্যতিক্রম নয়।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও কর্মসংস্থান যেমন বাড়ছে না। বাঙালি এখন ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে বেশি মন দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সংস্থা, রাজ্য সংস্থা-সব জায়গাতে বাঙালি নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। ছোট ও মাঝারি ব্যবসা ছাড়া বাঙালির বাণিজ্য সাধনায় আর কিছু নেই। ব্যবসায় লাভালাভ অনিশ্চিত বলেই হয়তো চাকরির নির্দিষ্ট মাইনেতে অনেকে নিযুক্ত হয়েছেন। তবু বিজ্ঞান ও অন্যান্য গবেষণার

সুবাদে, পেটেন্ট আবিষ্কার করে বহু বাঙালি বিজ্ঞানী ব্যবসায়িক সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন।

বর্তমানকালে সমাজে প্রোমোটার, ডেভলাপার শ্রেণী অর্থনীতির অনেকখানি নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আবাসন তৈরির সঙ্গে সহায়ক শিল্প রূপে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। আবার পঞ্চায়েত কিংবা স্বশাসন ব্যবস্থা (local self-govt. or development board)-কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির নানা কর্মকাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। চিকিৎসা একসময় ব্যক্তিগত দক্ষতার বস্তু ছিল। এখন একে নিয়ে কয়েকশো বা কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বাংলায় চালু হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন যুগে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিকস শিল্প আলাদা করে বাণিজ্যিক শিল্পতালুক গড়ে তুলছে (commercial industrial hub)। বহু জায়গায় কৃষিজ ধান বা অন্যান্য ফসলের বাজার (hub) গড়ে উঠেছে। গাড়ি

শিল্প নিয়ে শিল্পতালুক (industrial estate), মিষ্টান্ন ব্যবসায় নিয়ে শিল্পতালুক, প্রতিমা শিল্প নিয়ে তালুক, বস্ত্র ও চর্মশিল্পের তালুক, হস্তজাত দ্রব্য বা কুটিরশিল্পের বিন্যাস অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

২.৬. উপসংহার

আমরা সূচনায় বলেছি সমাজ একটা ধারণা, ভাবনা (idea, thought)। এরই বহিঃপ্রকাশ মানুষের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কাজেই এই আলোচনার বহিঃপ্রকাশ (manifestation) এবং বহির্ঘটনার অভিঘাতকে এড়িয়ে তদাতভাবে বাঙালির সামাজিক পরিচয় দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

কোনো সমাজই স্থবিরতায় ভোগে না, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এভাবে পৃথিবীর বুক থেকে বহু জনসমাজ, তাদের সংস্কৃতি মুছে গেছে। ইদানীং অনেকে বলছেন বাঙালি তার সামাজিক ঐক্যবদ্ধ পরিচয় হারাচ্ছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যারা এ নিয়ে খুব সোচ্চার, তাদের ব্যক্তিজীবনে বাঙালিয়ানা নেই। সমাজের প্রতি একটা কৃত্রিম সমবেদনা, সংস্কৃতি বা ভাষা হারানোর বেদনাও তাদের মনের গহীন থেকে উঠে আসছে এমন নয়। তবে আগে বলা কিছু উদাহরণ থেকে আমরা নিশ্চয়ই মেনে নিই যে বাঙালির সমাজ আগের মতো নেই, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা বাড়ছে।

বাঙালি সমাজ যে একটা অন্তঃবিস্ফোরণ (implosion) এবং বহিবিস্ফোরণ (explosion) অনুভব করছে, একথা আমরা মানতেই পারি। যে ধর্মীয় ব্যাপারটা, আমরা সামাজিক অন্দরমহলের খোঁজে এই মুহূর্তে গুরুতর বলে ধরি নি, তার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। বাঙালির অনেক অংশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উচ্চস্থানে থাকলেও ভাগ্যের পাশাখেলা তার পরম অনুসন্ধেয় বিষয়। দেব-দেবী, ধর্মে সামনাসামনি অনাস্থা দেখালেও 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং' কিংবা 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' শাস্ত্রবাক্যে আমাদের অপার অনুরাগ, ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি। আসলে সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যার (তার মধ্যে পারিবারিকও) মর্মস্থলে পৌঁছতে না পেরে সেই ভাগ্যচক্র বা রাশিফলের দ্বারস্থ হচ্ছি। ফলে সমাজে জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, কবচ তাবিজের (এখন এর রূপ বদলেছে), গ্রহশান্তি-এইসব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই বৃত্তের বাইরে থাকা বাঙালির সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ধূলি পরিমাণ, নগণ্য, চোখে দেখা যায় না। বাঙালির সামাজিক কাঠামোর অদল বদলের প্রভাব বাংলার অর্থনীতিতেও দেখা গেছে।

অষ্টম শতকের পর যেমন বাঙালির সমুদ্র বাণিজ্য হারিয়ে গেছে, তেমনি মধ্যযুগীয়, ঊনিশ শতকী-বিশ শতকী বাঙালির অর্থনৈতিক কাঠামোসমূহ বদলেছে। স্বাধীন ব্যবসার স্বপ্ন সে আর দেখে না। বরং বাঁধা মাইনের দাসত্বে সে তৃপ্ত। তা বলে ব্যবসা নানাভাবে চলছে। বাঙালি এখন যানবাহনের ব্যবসায়ে পারদর্শী। অটো, টোটো, ওলা, উবের ইত্যাদি নানা ধরনের গাড়ির যন্ত্রাংশবিদ্যা ও চালনায় সে ভালোই কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। মাঝারি ব্যবসা বলতে নতুন একটা দিক বাঙালি জীবনে এসেছে। তা হল ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসা এবং বাড়ি তৈরির ব্যবসা, জমির ব্যবসা বাঙালির একটা বড়ো অংশ করছে। আসলে যেসব জায়গা-জমি নিয়ে কোনদিন কারুর মাথাব্যথা ছিল না, সেগুলি মহার্ঘ্য এবং লাভজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমাজে প্রোমোটার, ডেভলাপার শ্রেণী গড়ে উঠেছে।

এছাড়াও ব্যবসা যাতে দ্রুত গড়ে ওঠে, সেজন্য এক জানালা নীতি (single window policy) করে সরকারি লালফিতের জট ছাড়ানো হচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলিকে মানুষের ব্যবসার জন্য দ্রুত ঋণ মঞ্জুর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায় (সরকারি বা যৌথভাবে) পরিচালনার জন্য নানান সমিতি (Board) বা পর্ষদ (Council) গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য আলাদা কর্মসমিতি (working committee) তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য যাতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে সেজন্য জাতীয় রাজপথ (National Highway) এবং বন্দরগুলির পুনর্বিন্যাস হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা হালকা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উঁচুজাতের ব্যবসায়ীমহলকে (Corporate House) নানানভাবে কর ছাড় দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার দুজনে মিলে যদি বাংলার শিল্পে সুপবন বইয়ে দিতে পারেন, তাহলে বাঙালির অর্থনীতি মসৃণ এবং সুফলপ্রসূ হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলে সামাজিক কল্যাণসাধনও হবে। একে বলতে পারি জনকল্যাণের অর্থনীতি (Welfare Economy)। এই সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সমাজ ও আমাদের অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে বলে আশা করি।

২.৭. অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১) ঐতিহাসিক বারবোসা সোনার গাঁকে কি বলেছেন?

২) প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত কয়েক শ্রেণির কাপড়ের নাম উল্লেখ করুন।

৩) প্রাচীন বাংলার একজন সুবিখ্যাত মহানাবিকের নাম উল্লেখ করুন।

৪) প্রথম খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত কয়েক প্রকার মুদ্রার না লিখুন।

৫) ঐতিহাসিক পিরেস বাঙালি বণিকদের সম্পর্কে কি বলেছেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নঃ

১) গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী কাদের মনে করা হয়?

২) এখন সমাজে কৃষির চেয়ে কোন কোন অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়?

৩) মধ্যযুগে অর্থনৈতিক কাঠামো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৪) টীকা রচনা করুন: প্রাচীন বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য

৫) মধ্যযুগের বাংলায় বাণিজ্যের বিস্তার কেমনভাবে ঘটেছিল?

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্নঃ

১) সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞাটি পরিস্ফুট করুন।

২) বাঙালির সমাজকাঠামো ব্যাখ্যা করুন।

৩) প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

৪) আধুনিক যুগে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিচয় দিন।

একক ৩ ❐ বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত সাহিত্য

৩.১. উদ্দেশ্য

৩.২. প্রস্তাবনা

৩.৩. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

৩.৪. যুগবিভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মত

৩.৫. বাঙালির সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শন সমূহ

৩.৫.১. রামায়নমূলক কাব্য: অভিনন্দের ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'

৩.৫.২. মহাভারতমূলক কাব্য: নীতিবর্মার 'কীচকবধ' ও শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত'

৩.৫.৩. সংস্কৃত গীতিকাব্য: জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'

৩.৫.৪. সংস্কৃত কোশ বা সংকলন গ্রন্থ: 'সুভাষিত রত্নকোশ', 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

৩.৫.৫. দূতকাব্য: ধোয়ীর পবনদূত

৩.৫.৬. দৃশ্যকাব্য বা নাট্যকাব্য: 'মুদ্রারাক্ষস', 'অনর্ঘরাঘব', 'চণ্ডকৌশিক'

৩.৫.৭. প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ রচনাসমূহ

৩.৬. অনুশীলনী

৩.১. উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় এই সাহিত্যের ইতিহাস বা ধারার বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়াই এই পর্যায়ের মডিউল) উদ্দেশ্য। বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি সহস্রাধিক বছর। এই দীর্ঘকালের ইতিহাসে এর নানা বৈশিষ্ট্য, বিবর্তন, পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দীর্ঘকালের ইতিহাসকে লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে আলোচনার সুবিধার্থে। এই পর্যায়ে তার একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটা ছবি স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি কোন্ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিল তা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কী ধরনের সংস্কৃত সাহিত্য লেখা হয়েছে এ বিষয়ে সম্যক্ ধারণা করতে পারবেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে পারবেন। লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য সভাকবিদের কাব্য সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করতে পারবেন। বাঙালির নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা

করা সম্ভব হবে। বাঙালির লেখা প্রাকত ও অপভ্রংশ ভাষার সাহিত্য বিষয়ে জানতে পারবেন

৩.২. প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘকালের ইতিহাসের পর্ব বা যুগবিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভাষাগত সমাজগত ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিভিন্ন লক্ষণানুসারে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ধারা প্রধানত আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিন পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি যুগের সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ ঘটবে এই এককে। তার ফলে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন, বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ থেকে বর্তমান কালপর্বে পৌঁছনোর ইতিহাস। এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি যে-ভাষাতে রসসাহিত্যের চর্চায় বেশি নিমগ্ন থেকেছে সেটা হল সংস্কৃত ভাষা। মোটামুটিভাবে গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত এ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এমনকি মুসলমান শাসনকালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাংলার তুলনায় সংস্কৃতে কলম চালাতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এ ভাষায় কাব্য লেখা চলেছিল এবং একটি বিশিষ্ট আম্মলিক রীতির সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল তার প্রমাণ 'গৌড়ী রীতি'। বঙ্গদেশ পূর্বে 'গৌড়' নামে কথিত হতো, এ রীতি তারই নামে নামাঙ্কিত। সপ্তম শতকের আলংকারিক 'কাব্যালঙ্কার'-এ গৌড়ী রীতির প্রথম উল্লেখ মেলে। আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি'তে বৈদভী ও পাঞ্চালীর সঙ্গে 'গৌড়ীয়া' রীতিকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তাতে নিন্দনীয় কিছু নেই। অথচ অষ্টম শতকের আলংকারিক আচার্য দণ্ডী 'কাব্যাদর্শ'-এ যেভাবে বৈদভী রীতির বিপরীতে একে স্থাপন করেন তাতে এর অনুপ্রাসবাহুল্য ও সমতাগুণের অভাব 'দোষ' বলে পরিগণিত হতে পারে। রাজা হর্ষবর্ধনের রাজসভা কবি বাণভট্ট বোধহয় গৌড়ী রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'অক্ষরডম্বর' (শব্দাড়ম্বর) বিষয়ে বিরূপ ছিলেন। এছাড়া গৌড়ী রীতির রচনা অপরিচিত শব্দে পূর্ণ হয়ে থাকে। চতুর্দশ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ-এ গৌড়ীরীতির ওজঃ, সমাসবহুলতা ও বিপুল শব্দাড়ম্বরের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও এ রীতিতে বাঙালি সমস্ত লেখকই লেখেননি এবং বাংলার বাইরেও এ রীতি অনুসৃত হয়েছে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সব শ্রেণীর রসসাহিত্যকেই 'কাব্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নাটক মঞ্চায়ন ও দর্শনসাপেক্ষ বলে 'দৃশ্যকাব্য' নামে পরিচিত ছিল। আর পাঠযোগ্য কাব্যই 'শ্রব্যকাব্য' বলে কথিত। শ্রব্য কাব্য আবার ছন্দোময় ও ছন্দহীনতার মানদণ্ডে পদ্য, গদ্য ও গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে চম্পু-এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। বাঙালি কবির গদ্যকাব্যের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায়নি। বরং তাঁরা পদ্যকাব্যের মধ্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁদের অবলম্বিত বিষয়বস্তুর বৈচিত্রাও লক্ষণীয়। রামায়ণ, মহাভারত থেকেই বেশি বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ছিল দূতকাব্য, গীতিকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্যের উপযোগী কিছু বিষয়। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বে চম্পুকাব্য লেখার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তবে দুটি কোষ কাব্য খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। এগুলির বিষয়ে এই এককে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

৩.৩. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

সহস্রাধিক বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে জানা এবং তার ধারাবাহিক বিবর্তনের আলোচনা করার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া হয় যা সাধারণত অন্যান্য বিষয়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও করা হয়। ভাষাগত বিশেষত্ব, সামাজিক অবস্থা, রাজনীতিক পরিস্থিতি ও ধর্মীয় বাতাবরণ প্রভৃতির বিচারে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কালকে আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্ব বা যুগে ভাগ করা হয়েছে।

বাংলা ভাষায় রচিত অদ্যাবধি প্রাপ্ত গ্রন্থ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের লেখা পদসংকলন 'চর্যাগীতিকোষ', সংক্ষেপে 'চর্যাপদ' যা খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকে রচিত বলে ভাষাবিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সেটিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন অর্থাৎ একমাত্র এই গ্রন্থটি। এছাড়া ঐ যুগে রচিত অন্য কোনো গ্রন্থ এতাবৎ পাওয়া যায়নি। তাই এই গ্রন্থটিই বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের একমাত্র রচনা। কারণ এরপর ভাষাগত বিচারে যে-গ্রন্থটির নাম করা যায় তা হল বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি রাধাকৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত কাব্য। এটি খ্রিস্টীয় ১৩শ-১৪শ শতকে রচিত বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। এই গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম দিকে রচিত প্রথম গ্রন্থ বলা হয়ে থাকে। সেই দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালকে মধ্যযুগ ধরা হয়। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনার পর, উনিশ শতক থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। মধ্যযুগের ব্যাপ্তি প্রায় ৫০০ বছর। তাই এই যুগকে দুভাগে ভাগ করা হয়-আদি মধ্যযুগ ও অন্ত্যমধ্যযুগ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে মাঝখানে রেখে দুটি ভাগও অনেকে করেন-প্রাক্-চৈতন্যযুগ ও উত্তর-চৈতন্য যুগ। অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত কাব্যাদিকে 'প্রাক্-চৈতন্যযুগে'র ও চৈতন্যের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ চৈতন্যের প্রভাবে বঙ্গদেশে যে ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার প্রভাবে রচিত সাহিত্যিকে 'উত্তর-চৈতন্য' যুগের বলা হয়। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যুগকে আদি মধ্যযুগ বা প্রাচৈতন্য ও তারপর থেকে উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত যুগকে অন্ত্যমধ্যযুগ বা উত্তর চৈতন্য যুগ বলা হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম বিচারে অনেকে আবার চৈতন্যের সমকালে কাব্যাদিকে 'চৈতন্যযুগ' বলার পক্ষপাতী। অর্থাৎ কাব্যযুগকে তিনটি উপপর্বে ভাগ করতে চেয়েছেন অনেকে।

আদি-মধ্যযুগে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', শাহ্ মহঃ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা', অনুবাদ সাহিত্য, বিদ্যাপতির রচনা, দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী, জ্ঞানদানের পদাবলী প্রভৃতি। এবং অন্ত্য-মধ্যযুগের নিদর্শন গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি), শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি। ভারতচন্দ্রই মধ্যযুগের শেষ কবি। তারপরই পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যের যুগ, যাকে আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর বাংলার সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিল্পচর্চা, বিদ্যাচর্চায় পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়তে থাকে। বাঙালি জীবনের সেই প্রভাব সাহিত্যেও পড়ে। নতুন শাসক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের চর্চা

শুরু হয়। তার আগে বাংলা সাহিত্যে পদ্যের প্রাধান্য, সব পদ্যে লেখা হতো। ইংরেজদের এবং রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাংলা গদ্যে লেখালেখি শুরু হয়। এই সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য বাংলার বিদগ্ধ সমাজে পঠিত ও আলোচিত হওয়ার সুবাদে বাংলা সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়তে থাকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সেই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা। অদ্যাবধি সেই আধুনিক যুগ চলছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ আধুনিক যুগ

খ্রি. ১০ম-১২শ শতকপ্ত [খ্রি. ১২শ/১৩শ শতক থেকে ১৮শ শতকপ্ত [খ্রি. ১৯শ শতকথেকে বর্তমান কালপ্ত

তিন যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন

প্রাচীন যুগ: চর্যাগীতি কোষ গুআনুমানিক ১০ম-১২শ শতকপ্ত

মধ্যযুগ [আদি-মধ্য]: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি-দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী, শাহ্ মহঃ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা প্রভৃতি।

[অন্ত্য-মধ্য]: মঙ্গলকাব্য (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি), বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দৌলতকাজী, আলাওলের কাব্য প্রভৃতি।

আধুনিক যুগ: অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর সমাজ ধর্ম রাজনীতি, শিল্পচর্চা, বিদ্যাচর্চায় পাশ্চাত্য প্রভাব ব্যাপকভাবে বাঙালি জীবনে পড়ে। তারই প্রতিফলন দেখা যায় বাংলা সাহিত্যে। বাংলা গদ্যচর্চা ইংরেজ শাসনের অন্যতম ফল। কারণ উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতচন্দ্র রায় গুণ্যকর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পদ্যে রচিত। গদ্যে সাহিত্য রচনার নমুনা নেই। দু-একটি চিঠিপত্রে, বা প্রাচীন অর্বাচীন কোনো কোনো পুঁথিতে গদ্যের নিদর্শন দু'একটি পাওয়া যায় মাত্র, তা নিতান্তই নগণ্য। খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গদ্য রচনার উদ্যোগ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়নদের এদেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০ সাল)। মূলত এখান থেকেই বাংলা গদ্যরচনার প্রচেষ্টা ও পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা। গুপ্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮শ শতকের দুটি গ্রন্থের কথা: মান-এল দ্য আসাম্প সাঁউ-'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও দোম আন্তনিও-র 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, গ্রন্থ দুটি রোমান হরফে লিসবন শহর থেকে মুদ্রিত। এখানে বাংলা গদ্যের দেখা পাওয়া যায়।প্ত এই সময় থেকেই গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্য ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ লক্ষণীয় হয়ে উঠল। রাজা রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের লেখনীতে তার বিকাশ। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিহাসের আলোচনায় তা বিস্তারিতভাবে জানা যাবে।

৩.৪. যুগবিভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন মত

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের শাসক ও ধর্মমতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কেউ কেউ যুগবিভাগ করেছেন বলে এই মতানৈক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচনার গৌরব পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্বের প্রাপ্য। ১৮৭৩ সালে তিনি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন। তাঁর ইতিহাস তিনটি অংশে বিভক্ত হয়েছিল:

১. আদ্যকাল অর্থাৎ প্রাক-চৈতন্য পর্ব। এই অংশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের আলোচনা আছে,

২. মধ্যকাল অর্থাৎ চৈতন্যযুগ থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত,

৩. ইদানীন্তন কাল-ভারতচন্দ্র থেকে রামগতি ন্যায়রত্বের সমকালীন করি সাহিত্যিকদের বিবরণ রয়েছে।

১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাস তুলে ধরেন এবং সেখানে বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যুগবিভাগ করেছেন এ ভাবে:

ক. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০ থেকে ১২০০ সাল),

খ. গৌড়ীয় যুগ বা শ্রীচৈতন্য পূর্ব যুগ,

গ. শ্রীচৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ,

ঘ. সংস্কার যুগ এবং

ঙ. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সামনে তথ্যের অভাব ও গবেষণার অপূর্ণতা বিদ্যমান ছিল বলে তিনি যুগ লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রাচীন যুগকে তিনি যে অর্থে হিন্দু-বৌদ্ধযুগ বলে চিহ্নিত করেছেন তা একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ দিয়ে প্রমাণিত হয় না। কোন সঠিক সূত্র প্রয়োগে তিনি যুগবিভাগ করেন নি; কোথাও ধর্ম, কোথাও শাসক তাঁর যুগবিভাগে আদর্শ হয়েছে বলে তা সুষ্ঠু হতে পারে নি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগবিভাগ করেছেন তা হল:

ক. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০ সাল),

খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০),

গ. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০),

ঘ. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ (১৫০০-১৭০০) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) এবং

ঙ. আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০ সাল থেকে)।

উপরোক্ত যুগবিভাগও ত্রুটিমুক্ত নয় বলে মনে করা হয়। মুসলমানপূর্ব যুগ কথাটির সঙ্গে তুর্কি বিজয়ের যুগ, প্রাকচৈতন্য বা চৈতন্য যুগ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবাবি আমল বা ইংরেজি যুগ কথাও যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ অন্যান্য শাসকের নামানুসারে অপরাপর অংশ চিহ্নিত হয় নি। বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ নামে কোন যুগ চিহ্নিত হলে অন্যান্য সাহিত্যের পরিচয়সূচক যুগও চিহ্নিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সব কারণে এ ধরনের যুগবিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। ড. আহমদ শরীফ সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি যুগে বিভক্ত করেছেন:

১. মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন কাল-প্রাচীন যুগ।

২. তুর্কি-আফগান-মোগল শাসন কাল-মধ্যযুগ।

ক. আদি মধ্যযুগ-তের-চৌদ্দ শতক।

খ. মধ্যযুগ-পনের-আঠার শতক।

৩. ব্রিটিশ শাসন কাল আধুনিক যুগ।

৪. স্বাধীনতা-উত্তর কাল বর্তমান যুগ। এ ধরনের যুগবিভাগ করা হয়েছে রাজ্য-রাজত্ব হাত বদল হওয়ার ফলে মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে তার পরিপ্রেক্ষিতে।

গোপাল হালদার মধ্যযুগকে-

ক. প্রাকচৈতন্য পর্ব (১২০০-১৫০০),

খ. চৈতন্য পর্ব (১৫০০-১৭০০) এবং

গ. নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০)-এই তিন পর্বে ভাগ করেছেন।

অন্যদিকে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগকে-

ক. প্রথম পর্ব: প্রাকচৈতন্য যুগ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী,

খ. দ্বিতীয় পর্ব: চৈতন্য যুগ-ষোড়শ শতাব্দী,

গ. তৃতীয় পর্ব: উত্তর চৈতন্য যুগ-সপ্তদশ শতাব্দী এবং

ঘ. চতুর্থ পর্ব: অষ্টাদশ শতাব্দী-এ ভাবে বিভক্ত করেছেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্যযুগকে-

ক. পাঠান আমল (১২০১-১৫৭৬) এবং

খ. মোগল আমল (১৫৭৭-১৮০০) হিসেবে ভাগ করেছেন।

ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে মধ্যযুগ-

ক. তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০),

খ. সুলতানি যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) এবং

গ. মোগলাই যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭)- এই তিন পর্বে বিভক্ত।

ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

প্রথম যুগ:১৩-১৪ শতক-সৃজ্যমান লোকায়ত সাহিত্যের কথকতার যুগ।

দ্বিতীয় যুগ: ১৫ শতক- লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের যুগ।

তৃতীয় যুগ: ১৬ শতক ভাববিপ্লব যুগ বা রেনেসাঁস যুগ।

চতুর্থ যুগ: ১৭ শতক লোকায়ত পীর-দেবতাদের যুগ।

পঞ্চম যুগ: ১৮ শতক-অবক্ষয় যুগ।

এমনিভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের প্রকাশ ঘটেছে। এ সব মতপার্থক্য দূর করার জন্য কেউ কেউ মধ্যযুগকে আদি মধ্যযুগ (১২০০-১৫০০) এবং অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০)-এই দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন। ড. সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, ঐসলামিক ইত্যাদি যুগবিভাগকে একেবারে কাল্পনিক মনে করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগতভাবে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের বৈশিষ্ট্য যাদি বহিরাগত শক্তির অরবানে বিবেচনা। করতে হয় তাহলে এর তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় এমন হতে পারে:

ক. আদি পর্যায়: প্রাক-তুর্কি আগমন, ১২০০ সাল পর্যন্ত।

খ. মধ্য পর্যায়: তুর্কি আগমন পরবর্তী কাল, ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।

গ. আধুনিক পর্যায়; ইউরোপ প্রভাবিত কাল, ১৮০০ সাল থেকে পরবর্তী কাল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায় ১৮০০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৬০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রায় দেড় শ বছর বাংলা সাহিত্যের যে ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাতে সবখানে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে এমন দাবি করা সমীচীন হবে না। বিশেষত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের প্রেক্ষিতে এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র রূপ ফুটে ওঠার সুযোগ হয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের মহান শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন সহস্রাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্ব জুড়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের যে গুরুত্ব ও মর্যাদা তাতে এখানকার স্বতন্ত্র সাহিত্যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

৩.৫. বাঙালির সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শন সমূহ

বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার বা সাহিত্য চর্চার তেমন কোনো লক্ষণ বাংলায় পাল রাজত্বের পূর্বে প্রায় ছিল না বললেই চলে। চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকোষ একমাত্র নিদর্শন বলে এ-পর্যন্ত প্রমাণিত। তাই বলে বাঙালিরা সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত ছিল একথা বলা যায় না। গুপ্তযুগ বা তার আগেই বাংলার বিদ্যাচর্চার

পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত অপভ্রংশে বিভিন্ন ধরনের রচনায় বাঙালির সাহিত্যচর্চার পরিচয় লক্ষণীয়। এই গৌড়বঙ্গে সংস্কৃত চর্চা চলত তার প্রমাণ, সংস্কৃতে সারা দেশে যে-চারটি রীতিতে সাহিত্য রচনা হত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গৌড়ীরীতি। গৌড়ী অর্থাৎ গৌড়দেশীয়। আড়ম্বরপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগ এই রীতির বিশেষত্ব। কাব্য-সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতিতে গৌড়ী রীতির সংস্কৃতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সাহিত্য অপেক্ষা দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল তা তাঁদের রচনা থেকেই জানা যায়। এখানে উল্লেখ্য-সর্বানন্দের টীকা সর্বস্ব', ভবদেবের 'স্মৃতি মীমাংসা', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি। আবার অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গুজনের কাব্যের নাম একইগ্ন।

এছাড়াও সেন রাজাদের সভাকবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, যাঁরা হলেন-জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতি, গোবর্ধন। প্রধান কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দমে'র কথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যটি সারা ভারতে জনপ্রিয় কাব্য। তাছাড়া রাজসভার অন্যান্য কবিগণও তাঁদের দান রেখে গেছেন। উল্লেখ্য-ধোয়ীর 'পবনদূত' (কালিদাসের মেঘদূতের আদর্শ রচিত), গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী'। প্রসঙ্গত কয়েকটি সংকলন গ্রন্থের নাম করতে হয় যেগুলি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছে- 'সুভাষিত রত্নকোশ' (কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়), 'সদুক্তি কর্ণামৃত' ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'।

৩.৫.১. রামায়ণমূলক কাব্য: অভিনন্দের 'রামচরিত' ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'

রামায়ণমূলক কাব্যের মধ্যে অভিনন্দের লেখা 'রামচরিত' অন্যতম। অবশ্য সংস্কৃত কাব্যে একাধিক অভিনন্দের সাক্ষাৎ মেলে। তার মধ্যে যিনি 'গৌড় অভিনন্দ' বলে উল্লেখিত তাঁকে বাঙালি বলেই মনে হয়। অভিনন্দের বেশ কিছু শ্লোক সংকলিত হয়েছে 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সুক্তিমুক্তাবলী', 'পদ্যাবলী', 'সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্যে। কিন্তু এইসব শ্লোক রামচরিতে মেলে না। এটা হতে পারে যে, 'রামচরিত' ছাড়া অভিনন্দ অন্য প্রকীর্ণ শ্লোকও রচনা করেছিলেন। 'কাদম্বরী কথাসার'ও আর এক অভিনন্দ রচিত। ইনি বাঙালি ছিলেন কি না স্পষ্ট জানা যায় না। যাই হোক, অভিনন্দ রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থটি ৪০ সর্গে রচিত। এর কাহিনি গৃহীত হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড থেকে। কবি আখ্যানভাগে যে পরিবর্তন করেছেন তা রামের চরিত্রমহিমা প্রকাশের জন্যই। বৈষ্ণবীয় কাব্যেও দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এমন প্রসাদগুণবিশিষ্ট সাবলীল রচনা কালিদাসোত্তর যুগে বড় একটা দেখা যায় না। কবি গৌড় অঞ্চলের হলেও কাব্যটি বৈদভী রীতিতে রচিত।

অভিনন্দকে নিয়ে সংশয় থাকলেও আর এক 'রামচরিতে'র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী যে বাঙালি ছিলেন সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন গ্রন্থকার নিজেই। রামচরিতের শেষে যে কবি-পরিচয় মেলে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বরেন্দ্রের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনে সন্ধ্যাকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজ রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী। কাব্যটি বোধ হয় দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। কারণ কাব্যে মদনপাল দেবের (রাজত্বকাল ১১৪০-১১৫৫) রাজত্ব পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'রামচরিত' কাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মোট শ্লোকের সংখ্যা ২২০। কাব্যটি শ্লেষকাব্য, অর্থাৎ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দের সহায়তার কবি একই সঙ্গে রামায়ণের রামচন্দ্র ও বঙ্গাধিপতি রামপালদেবের কীর্তিকাহিনি যুগপৎ বর্ণনা

করেছেন। কবি তাঁর শ্লেষকে ‘অক্লেশন’ বললেও কাব্যটি যে যত্নকৃত প্রয়াসে রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবির আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে নিজেকে ‘কলিকাল বাল্মীকি’ বলে অভিহিত করায়। যদিও বাল্মীকির রচনার সরসতা তাঁর লেখনিতে অনুপস্থিত। অবশ্য পালযুগের শেষ পর্বের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৩.৫.২. মহাভারতমূলক কাব্য: ‘কীচকবধ’ ও ‘নৈষধচরিত’

মহাভারতমূলক কাব্যের মধ্যে নীতিবর্মা রচিত ‘কীচকবধ’ বিখ্যাত। একাদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে ইনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবে লেখক বাঙালি ছড়িলেন কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য দুটি কারণে একে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়। প্রথমত, কীচকবধের ওপর প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথির লিপিই বাংলা এবং দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটির যতগুলি টীকা এ যাবৎ পাওয়া গেছে সেগুলির লেখক বাঙালি। যাই হোক, কীচকবধের কাহিনি নেওয়া হয়েছে বিরাটপর্ব থেকে। পাঁচ সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যে মোট শ্লোক সংখ্যা ১৭৭। কাব্যটিতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন তৃতীয় সর্গটি শ্লেষ অলংকারে রচিত। বাকি চারটি সর্গে যমক অলংকারের ছড়াছড়ি। শব্দপ্রয়োগে কবি চাতুর্য দেখিয়েছেন, কোথাও কোথাও কৃত্রিমতা দোষেও দুষ্ট হয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই রচনায় কবি প্রায় বারোটি ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁর ছন্দনৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছেন।

'মহাভারতের অপর এক আখ্যান নল-দময়ন্তীর বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রীহর্ষ লিখেছিলেন ‘নৈষধচরিত’। মাত্র দুই শত শ্লোকে নিবদ্ধ এই কাহিনি শ্রীহর্ষের হাতে পড়ে প্রায় আড়াই হাজার শ্লোকের মহাকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। মূল গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে কবি কামশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, তর্কবিদ্যা ও বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানগর্ভ তথ্য পরিবেশন করেছেন। পদলালিত্যই শ্রীহর্ষের রচনার অন্যতম বিশেষত্ব। অবশ্য কেউ কেউ আধুনিক রুচির মানদণ্ডে রচনাটিতে বিকৃতি অনুভব করবেন। এটি নানাবিধ দোষেরও আকর। যে-কারণে এই গ্রন্থকে নিয়ে একটি চালু তামাশা সমাজে প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি যে, প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী আলঙ্কারিক ‘কাব্যপ্রকাশ’-এর লেখক মম্মটভট্ট শ্রীহর্ষের মাতুল ছিলেন। তিনি ভাগিনেয়র কাব্যটি পড়ে নাকি মন্তব্য করেছিলেন, তিনি ‘দোষ পরিচ্ছেদ’ লিখতে বৃথাই অসংখ্য কাব্য অন্বেষণ করেছেন, শ্রীহর্ষের এ রচনা আগে হাতে এলে তাঁর অনুসন্ধানের পরিশ্রম লাঘব হতো। আসলে কবি উচ্ছ্বসিত কবিত্বের চর্চা করায় মাঝে মাঝে মাত্রাবোধ লুপ্ত হয়েছে। যেমন, দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনায় অনর্থক পাঁচটি দীর্ঘ সর্গ যোজনা করে কাব্যকে অহেতুক ভারি করে ফেলেছেন। শ্রীহর্ষের কবি পরিচিতি নিয়ে এখনও সংশয় রয়ে গেছে। কবির পিতার নাম শ্রীহীর, মাতা মল্লদেবী। কাব্যের শেষে কবি জানিয়েছেন যে তিনি কনৌজরাজের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ‘প্রবন্ধকোষ’-এর রচয়িতা রাজশেখর সূরির সাক্ষ্যে মনে হচ্ছে কবি দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনৌজরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। আসলে তাঁর বাঙালিত্বের বড়ো দাবিদার তাঁর কাব্যটি। কাব্যটিতে কিছু বঙ্গদেশীয় আচার ও সংস্কারের উল্লেখ আছে। যেমন, বিবাহিতা নারীর শাঁখা পরা, বিবাহে মাছ-ভাত খাওয়া, উলুধ্বনি দেওয়া, চালের পিটালির আলপনা আঁকা, বরের মস্তকে মুকুট ও হাতে দর্পণ ধারণ এবং কিছু স্ত্রী-আচার বাঙালিত্বের ইঙ্গিতবাহী। ভাষারীতির দিক থেকেও এটি বঙ্গদেশের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা চলে। এই কাব্যে ভাষারীতির দিক থেকে

ন/ণ, জ/য, বর্গীয় ব/অন্তঃস্থ ব-এর মধ্যে ভেদ করা হয়নি। সর্বোপরি কাব্যটি গৌড়ীরীতিতে রচিত। বঙ্গীয় কুলজীগ্রন্থে শ্রীহর্ষকে মেধা তিথির পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এইসব প্রমাণও অন্য তথ্যসূত্রে খণ্ডনের চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়।

৩.৫.৩. সংস্কৃত গীতিকাব্য: জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'

বাঙালি রচিত সংস্কৃত গীতিকাব্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী' কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র কথা। জয়দেব গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। সেন রাজসভার পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন এই জয়দেব। কাব্যে যতটুকু আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, তার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম রামা বা বামাদেবী, কেউ কেউ মনে করেন পদ্মাবতী তাঁর পত্নী, যিনি নর্তকী ছিলেন। আর কবি ছিলেন এর নৃত্যকালীন বাদক। গীতগোবিন্দের গায়েন পরাশর কবির প্রিয়বন্ধু ছিলেন। কিন্তু জয়দেব তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে কোন তথ্য পরিবেশন করেননি। তার ফলে এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশের দাবি জয়দেব ছিলেন বাঙালি। তাঁর জন্মস্থান বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রাম। এছাড়া পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার কেন্দুল নামক গ্রামকেও কেউ কেউ জয়দেবের নিবাসস্থল বলে উল্লেখ করেন। জয়দেবের কবিখ্যাতির বিপুলতা তাঁকে বাংলার বাইরেও টেনে নিয়ে গেছে। মিথিলাবাসীরা তীরহুত জেলায় অবস্থিত ফেজারপুর শহরের কাছে কেন্দোলি গ্রামকে জয়দেবের জন্মস্থান বলে দাবি করেন। ওড়িয়ারাও বলেন পুরীর কাছে বিন্দুবিল্ব গ্রামে কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের বসন্তকালীন রাসলীলাকেই কবি দ্বাদশ সর্গে কাব্যরূপ দিয়েছেন। রাধা ভিন্ন অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ রাসলীলায় মত্ত থাকলে রাধা ঈর্ষায় মানিনী হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের ত্যাগ করে মানিনী রাধার চিত্তের প্রসন্নতা আনয়নে যত্নবান হলেন। অবশেষে অনুতপ্ত কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়ে এবং সঙ্গিনীদের অনুরোধে রাধা কৃষ্ণের প্রতি বাম্যতা ত্যাগ করলে দু'জনের মিলন হল। কাব্যবেত্তাদের মতে গীতগোবিন্দে খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্যই আছে। এর বিষয়বস্তু তুচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও বারোটি সর্গে বিভক্ত হওয়ার দরুন মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি পেয়েছে। ধীরে ধীরে চরিত্রগুলিও উন্মোচিত হয়েছে। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, রাধাকে একটি কাব্যের একক নায়িকা করে কাব্য রচনার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। কৃষ্ণ চরিত্রাঙ্কনে কবি ভাগবত অথবা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন তা নিয়ে সংশয় থাকলেও এটা খুবই স্পষ্ট যে তাঁর কাব্যের নায়ক একই সঙ্গে ধর্মতৃষ্ণা ও জীবনতৃষ্ণা রস পরিবেশনে সমান দক্ষ। কবি কাব্যের শুরুতেই এ কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পদে পাঠককুলকে অবহিত করেছেন এই বলে-

যদি হরিস্মরণে সরসংমনো/যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীম/শৃণু তথা জয়দেব সরস্বতীম্।।'

বস্তুত অলৌকিক দেবকাহিনিকে লৌকিক প্রেমগাথায় পরিণত করতে গিয়ে কাব্যে কৃষ্ণের বহুবল্লভ, নাগর রূপটিকেই মুখ্য করে তুলেছেন। মধুর রসাশ্রিত কৃষ্ণই তাঁর উপজীব্য, যদিও সূচনায় দশাবতার স্তোত্র রচনা করে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি সম্পর্কে সচেতন করেছেন। আর কবির রাধা চরিত্রের উৎস

সম্ভবত কিছু অর্বাচীন পুরাণ, প্রাকৃত-অপভ্রংশের কবিতা এবং সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক। বাকিটা তাঁর নিজস্ব। বিশেষ করে অষ্টম থেকে দশম সর্গে যে প্রেমিকা রাধার সাক্ষাৎ মেলে তা একজন রোম্যান্টিক শিল্পীর তুলিজাত ভাবসম্পদ। একাদশ সর্গের অভিসারিকা রাধার মানবীপ্রতিমা পরবর্তীকালে খুব কম কবিই অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন।

গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক গোত্র বিচারে ধন্ধে পড়েছেন পণ্ডিতেরা। কেননা, এতে যেমন মহাকাব্যের লক্ষণানুসারে অষ্টাধিক সর্গ, শৃঙ্গার অঙ্গীরস, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন নায়ক আছে, তেমনি মহাকাব্যের পক্ষে হানিকর অসামান্য গীতিময়তা জড়িয়ে রয়েছে এর সর্বাঙ্গে। বিশেষ করে ২৪টি গানে, যে গানগুলির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু ছন্দে অপভ্রংশের মধুরতা মাখা। কীথ, ম্যাকডোনাল্ড, ভিন্টারনিৎসের মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা রচনাটিকে গীতিকবিতা বলে বিবেচনা করেছেন। তবে গীতগোবিন্দ কাব্যে নাট্যলক্ষণও কম নেই। মুখ্যত তিনটি চরিত্রের কৃষ্ণ, রাধা ও সখির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। এর ফলে উইলিয়ম জোন্স একে 'Pastoral Drama' বলতে দ্বিধা করেননি। লসেনের মতে এটা 'Lyrical Drama'। আর লেভি ও পিশেলের ধারণায় গীতগোবিন্দ গান ও নাটকের মাঝামাঝি গুঞ্জবগ্রন্থ শ্রেণির রচনা। কবি নিজে তাঁর রচনা সম্পর্কে সামান্য ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে এটি 'প্রবন্ধম্'। যদিও প্রতি সর্গের পুষ্পিকায় 'মহাকাব্য' কথাটি যুক্ত হতে দেখা যায়। সামগ্রিক বিবেচনায় মনে হয়, গীতগোবিন্দ একটি অনন্যপূর্ব রচনাবন্ধ, যাতে একই সঙ্গে গীতিকাব্যের সুরমূর্ছনা, নাটকীয়তা, বর্ণনামূলকতা ও নৃত্যোপকরণ উপস্থিত। বোধ হয়, এই রূপবন্ধটির অনুসরণ করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। গীতগোবিন্দের ভাষা কাব্যটিকে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। বাহ্যিক ভাষাবরণে এটি সংস্কৃত, কিন্তু শাব্দিক প্রয়োগকলায় তীক্ষ্ণ নজর রাখলে বোঝা যায়, সমকালের অপভ্রংশ ও প্রাকৃত কাব্যের ভাষার কোমল কমনীয়তা এবং নবসৃজ্যমান বাংলাভাষার মধুর বাংকার কবি তাঁর কাব্যভাষায় অনুরণিত করতে কতটা সক্ষম হয়েছেন।

এই পর্বেই লেখা অপর এক সংস্কৃত গীতিকাব্য গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী'। কবির পিতার নাম নীলাম্বর। নীলাম্বরও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কাব্যশেষের একটি পুষ্পিকা শ্লোকে কবি শিষ্য উদয়ন ও ভ্রাতা বলভদ্রের নামও করেছেন। গোবর্ধন আচার্যের কাব্যের নাম 'আর্যাসপ্তশতী'। নামে 'সপ্তশতী' হলেও কবি রচিত শ্লোক সাতশ' ছাড়িয়ে গিয়েছে। শ্লোকগুলি প্রেমমূলক। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, ক্ষ্মপ্রেম, প্রেমের বহিরঙ্গ বিলাস ও অন্তর্মুখী গভীরতা, প্রেমের ভুজঙ্গ কুটিল গতি ও স্বাভাবিক ঋজুতা এবং সর্বোপরি প্রেমের সূক্ষ্ম গভীর মনস্তত্ত্ব আর্যার শ্লোকাবলীতে বর্ণ সুষমায় চিত্রিত হইয়াছে। জীবন পরিচয়ের নিবিড়তায়, বস্তুদৃষ্টির প্রখরতায় এবং কৌতুকের স্মিত দীপ্তিতে গোবর্ধন আচার্যের রচনা বিশিষ্টতার দাবি রাখে।ক্ষ্ম এটা ঘটনা যে, জয়দেব ও গোবর্ধন একই প্রেমবীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলেছেন। তবে জয়দেবের কৃতিত্ব যেখানে শ্রুতিমধুর কোমল নিক্বণ সৃষ্টিতে, সেখানে গোবর্ধনের দক্ষতা ঘাতগম্ভীর নাদ সৃজনে। জয়দেবের প্রেম রাধাকৃষ্ণের দেবায়ত সীমায় আবদ্ধ, আর গোবর্ধন সেই দেওয়াল অতিক্রম করে মানবের প্রেম বিচিত্রার বর্ণময় আঙিনায় উপস্থিত। কোনো ধারাবাহিক আখ্যান নয়, বরং খণ্ড খণ্ড ভাবের মননপ্রধান প্রকীর্ণ কবিতা দিয়ে 'আর্যাসপ্তশতী' পরিপূর্ণ। কবি হালের প্রাকৃত কবিতা সংকলন 'গাহাসত্তসঈ'-এর অনুপ্রেরণায় যে গ্রন্থ রচিত তা একপ্রকার সন্দেহাতীত। গোবর্ধনের কবিত্বশক্তি বিষয়ে কবির নিজেরই একটা পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল। কালিদাস কিংবা ভবভূতির সমানধর্মা বলেও তিনি একস্থলে

দাবি করেছেন। তবে অতটা না হলেও কবি যে সর্বশাস্ত্রবেত্তা ও সুপণ্ডিত ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.৫.৪. সংস্কৃত কোশ বা সংকলন গ্রন্থ: 'সুভাষিত রত্নকোশ', 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

কোশকাব্য বা সংকলন গ্রন্থ রচনায় বাঙালি কাব্যরসিকদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এ ধরনের কাব্যে পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোক ব্রজ্যা বা প্রকরণক্রমে সজ্জিত হয় (অন্যোন্যানপেক্ষকঃ ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ)। এতে সংকলকের সৃষ্টি প্রতিভার তুলনায় আস্বাদন-দক্ষতার মহনীয়তা অনুভূত হয়। এ ধরনের সংকলন গ্রন্থ তখনই দেখা দেয় যখন সাহিত্যের নানা শাখা অভূতপূর্ব পরিপুষ্টি লাভ করে। যাইহোক, প্রাপ্ত কোশকাব্য সমূহের মধ্যে বাঙালি সংকলকদের রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে বিদ্যাকর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোশে'র নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। ইনি বোধহয় পাল রাজত্বের শেষ দিকে আবির্ভূত হন। গ্রন্থটি সংকলনের কাল হিসাবে দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। গ্রন্থের আরম্ভে 'সুগত ব্রজ্যা' সংযুক্তির কারণে অনেকে বিদ্যাকরকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে মনে করেন। কবিদের মধ্যেও অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন। যেমন, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, সংঘশ্রী, জিতারি নন্দী প্রমুখ। এই কোশকাব্যে এমন কিছু কবির শ্লোক সংকলিত হয়েছে যাঁদের অন্য কোন পরিচয় নেই কিংবা অন্য কোনো সংকলন গ্রন্থে তাঁদের শ্লোক সংগৃহীত হয়নি। যাঁরা কাব্য রচনা ব্যতীত অন্য কোনো বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন ও তাতেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বিদ্যাকর তাঁদের কবিতাও সংকলনে স্থান দিয়েছেন। সংকলনে বিধৃত অঙ্গোক, ডিম্বোক, বিত্তোক, ললিতোক, সরোক, হিন্দ্দোক প্রভৃতি '-ওক' অন্তক নামধেয় কবিরা যে বাঙালি ছিলেন এমন অভিমত কোনো কোনো পণ্ডিতের। এই গ্রন্থটির একটি খণ্ডিত পুঁথি নেপালে প্রথম পান এফ, ডব্লু, টমাস। খণ্ডিত হওয়ার কারণে তাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম ছিল না। সেজন্য এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৯১২ সালে টমাস সম্পাদনা করে এর নাম দিয়েছিলেন 'কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'। পরে সম্পূর্ণ পুঁথির আবিষ্কারে সংকলকের নাম ও গ্রন্থের আসল নাম জানা যায়।

সাল-তারিখের সঠিক নিরিখে বিচার করলে তুর্কি আক্রমণের (১২০৩ খ্রিঃ) অব্যবহিত পরেই যে কোশকাব্যের সংকলন কার্য সমাপ্ত হয়েছিল (১২০৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ) সেটি হল শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। শ্রীধরের পিতা বটু দাস ছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও রাজকর্মচারী। সংকলক শ্রীধরও মহামাণ্ডলিক পদে বৃত ছিলেন। এই কোশকাব্যের শ্লোকগুলি মোট পাঁচটি প্রবাহে বিভক্ত। দেবদেবী সম্বন্ধীয় পদগুলি সংকলিত হয়েছে অমরপ্রবাহে। মূলত পৌরাণিক দেবতাদের স্তুতি জানানো হয়েছে এখানে। কৃষ্ণ তথা বিষ্ণু বিষয়ক পদের সংখ্যাই বেশি। এর থেকে কেউ কেউ ধারণা করেছেন সংকলক শ্রীধর বোধহয় ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবাহ শৃঙ্গারপ্রবাহ। যেখানে প্রাকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের বিভিন্ন স্তর কাব্যভাষায় রূপপ্রাপ্ত। রাজপ্রশস্তি বিষয়ক কবিতাগুলি জায়গা পেয়েছে চাটুপ্রবাহে। আর অপদেশপ্রবাহ ও উচ্চাবচপ্রবাহে অন্যান্য বিষয়ক পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রতিটি প্রবাহ কয়েকটি বীচিতে বিভক্ত এবং পাঁচ-পাঁচটি শ্লোক নিয়ে গড়ে উঠেছে এক-একটি বীচি। গ্রন্থে সংকলিত মোট কবির সংখ্যা ৪৮৫ জন। যে সব কবিদের নাম অজ্ঞাত তাঁদের ক্ষেত্রে 'কস্যচিৎ' বলে নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীধর বহু কবিকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে রক্ষা করে স্মৃতির আলোয় চির সমুজ্জ্বল

করে রেখেছেন। গৌড়বঙ্গের কবিদের ভাগ্যে সর্বভারতীয় অনুমোদন তেমন জোটেনি। শ্রীধর তাঁদের অমরত্ব দানের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে যদিও স্পষ্টাকারে কবিদের জাতিনির্দেশ করা হয়নি, তবুও লেখকদের নাম, পদবি ইত্যাদি বিবেচনা করে বাঙালি বলে শনাক্ত করা যায়। যেমন, লক্ষ্মণসেন, কেশব সেন, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, কমল গুপ্ত, যজ্ঞ ঘোষ, তিল চন্দ্র, লড়হ চন্দ্র, প্রভাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল ইত্যাদি। সেকালের সকল কবিই যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা নয়, কায়স্থ, বৈদ্য, নট, কেওট প্রভৃতি জাতির লোকেরাও প্রকীর্ণ শ্লোক রচনা করেছেন। 'সুভাষিত রত্নকোশ'-এ সংকলিত কিছু পদও এখানে লভ্য। অপদেশ ও উচ্চাবচপ্রবাহের শ্লোকসমূহ থেকে তুর্কি আক্রমণ পূর্ববর্তী বাংলার জনজীবন সম্বন্ধে অনেক খাঁটি তথ্য মেলে। এর কোনো কোনো পদে পল্লীজীবনের শান্ত ছবি ও দরিদ্র গৃহস্থালির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, দারিদ্র্য, সম্পন্নতা, ধর্মাচার ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে পারে ত্রয়োদশ শতকের সূচনাভাগের এই সংকলন।

৩.৫.৫. দূতকাব্য: ধোয়ীর 'পবনদূত'

সংস্কৃত কাব্য প্রকরণের একটি বিশিষ্ট ভাগ হল দূতকাব্য। কালিদাসের অমর লেখনি প্রসূত 'মেঘদূত'-ই পরবর্তী সমস্ত দূতকাব্যের প্রেরণা ও আদর্শ। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় দূতকাব্য লিখে যে কবি খ্যাতিলাভ করেছিলেন সেই কবিপতি ধোয়ীর 'পবনদূত' কল্প-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত এক বিচিত্র প্রেমকাব্যও বটে। স্তাবক কবি পৃষ্ঠপোষক রাজাকেই করেছেন তাঁর কাব্যের ধীরললিত নায়ক। কবির বর্ণনামতে রাজা নাকি একদা দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন কুবলয়বতী-নামী এক গন্ধর্বকন্যা। অতঃপর রাজা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে সেই বিরহিনী নায়িকা মলয় বায়ুকে দূত করে তাঁর প্রিয়তমের কাছে প্রেমবার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেই বার্তাটিই কালিদাসীয় ভঙ্গিতে মন্দাক্রান্তা ছন্দে কবি কাব্যের আকার দিয়ে বলেছেন। বস্তুত কাব্যটিতে মৌলিকতার বিশেষ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবগভীরতাও তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে ধোয়ীর কল্পনার অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে সমকালের একজন জীবিত নরপতিকে কাব্যের নায়ক রূপে গ্রহণ করায়। কাব্যটি ১০৪ শ্লোকে রচিত। এই রচনাটি ছাড়া ধোয়ীর আরও ২০টি শ্লোক সংকলিত হয়েছে সদুক্তিকর্ণামৃতে। অবশ্য সেখানে ধোই, ধোয়ীক, ধুয়ী ইত্যাদি নাম উল্লেখিত। 'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে ধোয়ী সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তিনি প্রথম জীবনে মূর্খ ছিলেন এবং জাতিবর্ণের বিচারে তন্তুবায় গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। কাব্যে যেভাবে সুহ্মদেশের স্নিগ্ধ মধুর প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তিনি রাঢ় অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

দূতকবি উমাপতি ধরের কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি। বস্তুত তাঁর কবিপ্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রশস্তি ও প্রকীর্ণ কবিতার জগতে। উমাপতির অনেক আগেই গৃহীত হয়েছে শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত, 'কলহনের 'সুক্তিমুক্তাবলী' ও রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে। প্রথম কোশকাব্যটিতে কবির ৯০টি শ্লোক সংকলিত। কবি যে পল্লবিত বাক্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ কেবল সঙ্কলনে বিধৃত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতেই নেই, বিভিন্ন প্রশস্তিলিপিতেও আছে। উমাপতি অনেকগুলি প্রশস্তিলিপিরও হয়। যেমন বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপি তাঁর লেখায় বেশ প্রকট। কবিত্ব বলতে তিনি বোধ হয় বুঝতেন আলঙ্কারিক তথ্য মেনে মেরুতুঙ্গের লেখা 'প্রবন্ধচিন্তামণি'-তে। ইনি

জাতিতে করণ- কায়স্থ ছিলেন। কবি কেবল রাজ সভাকবির পদ অলঙ্কৃত করেননি, কবি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের একজন যোগ্য মন্ত্রী। একদা যাকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতায় তিনি বধ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তখন মৃত্যুপথযাত্রী কবি রাজার উদ্দেশ্যে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলে তাঁর বোধোদয় হয় এবং বধের আদেশ প্রত্যাহৃত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে বৃত হন।

৩.৫.৬. দৃশ্যকাব্য বা নাট্যকাব্য: 'মুদ্রারাক্ষস', 'অনর্থরাঘব' ও 'চণ্ডকৌশিক'

প্রায় এক সহস্রাব্দ ধরে ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারের হাতে ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। অনুমান করা যায় এই ঐতিহ্য কম-বেশি বঙ্গদেশেও বিস্তার লাভ করেছিল। ঐ সব নাট্যকারদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন হয়তো কোনো কোনো অক্ষম লেখক, যার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ রয়ে গেছে ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে লেখা সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ'-এ। তিনি বাঙালি রচিত অনেকগুলি নাটকের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেগুলি বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। নাটকগুলির অপ্রতুলতা থেকে একটা ধারণা করা যায় যে, অবশিষ্ট রচনা বলে সেগুলি কখনোই পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি এবং কালের নির্মম হস্তাবলেপে সেই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কোনো কোনো সাহিত্য-ঐতিহাসিক দাবি করেছেন যে, 'বেণীসংহার' প্রণেতা ভট্টনারায়ণ, 'অনর্থরাঘব'-এর লেখক মুরারি, 'মুদ্রারাক্ষস'-এর স্রষ্টা বিশাখ দত্ত ও 'চণ্ডকৌশিক'-র রচয়িতা ক্ষেমীশ্বর নাকি বাঙালি ছিলেন। এই দাবির পিছনে সুস্পষ্ট কোনো যুক্তি কিংবা প্রমাণ নেই। যেমন, ভট্টনারায়ণের ঐতিহাসিকত্ব এখনও অপ্রমাণিত। বঙ্গদেশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত একটি জনশ্রুতিই তাঁর বাঙালিত্বের দাবিদার। বঙ্গাধিপতি আদিশূর নাকি কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে পাঁচজন বৈদিক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন বঙ্গদেশে। আগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভট্টানারায়ণ অন্যতম, যা কুলজী গ্রন্থগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে যে, কুলজীগ্রন্থগুলির ঐতিহাসিকত্ব নিঃসন্দিগ্ধ নয় এবং কথিত আদিশূর প্রকৃতপক্ষে কোন্ রাজা তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। অবশ্য 'বেণীসংহার' যে সাহিত্যরীতিতে ও ভাষাছাঁদে লেখা হয়েছে তাতে গৌড়ীরীতির ছাপ আছে। মূলত জনশ্রুতি ও রচনাপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভট্টনারায়ণকে বাঙালি বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। দশম শতকের নাট্যকার মুরারির 'অনার্থরাঘব'-এর কাহিনি রামায়ণ থেকে নেওয়া। মুরারিকে বাঙালি বলে দাবি করা কতটা সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ এ নাটকে নর্মদা তীরবর্তী মাহিস্মতী নগরীর কথা আছে, যে স্থানে একদা কলচুরি রাজবংশের রাজধানী ছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ মুরারি ও নাট্যকার মুরারি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা সন্দেহ আছে। ক্ষেমীশ্বরের লেখা 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, নাটকটি লেখা হয়েছিল রাজা মহীপালের সভায়। পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান, এই মহীপাল বাংলার পালবংশীয় রাজা মহীপালদেব। অন্যদিকে পিশলের বক্তব্য, উক্ত মহীপাল গুর্জরপ্রতিহার রাজ প্রথম মহীপাল। লক্ষণীয়, নাটকটির প্রাচীনতম পুথি মিলেছিল নেপালে। 'চণ্ডকৌশিক'-এ হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের কাহিনি নাট্যকারে বিন্যস্ত হয়েছে। ক্ষেমীশ্বর আনুমানিক দশম শতকের মানুষ ছিলেন। নবম শতকের পূর্ববর্তী নাট্যকার ছিলেন বিশাখ দত্ত। নাটকে বাঙালিত্বের কোন চিহ্ন নেই। 'মুদ্রারাক্ষস'-এর অবলম্বন ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন-প্রাপ্তি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাণক্যের ভূমিকা পর্যালোচনা।

৩.৫.৭. প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ রচনাসমূহ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের শেষ পর্বে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা রূপে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উদ্ভব ঘটেছিল। এগুলি সবই প্রথমে দেখা দেয় সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হিসেবে, পরে তা গৃহীত হয় সাহিত্যের মাধ্যম রূপে। খ্রিষ্টপূর্বকালেই প্রাকৃতের আবির্ভাব। সম্রাট অশোকের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত শিলালিপিগুলির অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতে লেখা। পরে তা থেকে সাহিত্যিক প্রাকৃত গড়ে ওঠে। পূর্বভারতে মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতো। এই প্রাকৃতে লেখা খুব অল্প রচনাই মিলেছে। অবশ্য বাঙালী কবি ও পন্ডিতেরা যে অন্য প্রাকৃত ভাষা জানতেন না এমনটা নয়। তুর্কী আক্রমণের আগে অনেকগুলি প্রাকৃত ও অপভ্রংশে লেখা গ্রন্থ পাওয়া গেছে। তবে সেগুলি কতটা বাঙালির লেখা তা নিয়ে সংশয় করা চলে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা চলে হালের 'গাহাসত্তসঈ' কিংবা প্রাকৃত ছন্দ শিক্ষার বই 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এর নাম। প্রথম গ্রন্থটি সর্বপ্রাচীন কবিতা সংগ্রহ। এর ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত এবং সংকলক হাল। অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন সাতবংশীয় রাজা হালই গ্রন্থকর্তা। সেই হিসাবানুসারে এটি খ্রিষ্ট্রীয় প্রথম শতক নাগাদ সংকলিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সংশয় জাগছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের দুইজন বিশিষ্ট রচনাকার প্রবর সেন (১/৬৪, ৩/২, ৩/৮, ৩/১৬) ও বাপ্পতিরাজের (১/৯৫) কবিতা সংকলিত সংকলিত হওয়ার কারণে। এগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? যাইহোক গ্রন্থটি কয়েকটি কারণে বিশিষ্ট। পরবর্তীকালে সংস্কৃতে যেসব শ্লোকসংগ্রহ রচিত হয়েছিল তাদের মূল আদর্শস্বরূপ ছিল এই বই। এই বইয়ে রাধার প্রথম উল্লেখ মিলছে। আর মধ্যযুগে লেখা বাংলা বৈশ্ববপদের বেশ কয়েকটা এর কোন কোন শ্লোকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। গাহাসত্তসঈদের দুই-একটি শ্লোকে বাংলাদেশের জনজীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে। হতে পারে সংশ্লিষ্ট পংক্তিগুলি লিখেছিলেন বাঙালী কবিরাই 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'ও এক ধরনের সংকলনগ্রন্থ, তবে সে সংকলন বিশেষ উদ্দেশ্যে-প্রাকৃত ছন্দে কাউকে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য এ বই। বইটি লেখা হয়েছিল শৌরসেনী প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে। এর সংকলন কাল আমাদের আলোচ্য সীমার বাইরে। যতদূর মনে হয়, চতুর্দশ শতকে কাশীতে এর সংকলন-কার্য সমাপ্ত করা হয়েছিল। সংকলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বিখ্যাত ছন্দোশাস্ত্রবিদ পিঙ্গলের নাম। এ গ্রন্থের লেখক যে বাঙালি ছিলেন না তা অনুমান করা যায় গ্রন্থে প্রকাশিত বাঙালির প্রতি কিছু কটাক্ষপাতে। তবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় কৃষ্ণকথার কিছু বিশিষ্ট উপাদান এতে নথিবদ্ধ আছে। তাছাড়া বেশ কিছু শ্লোকে বাংলার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষাকৌশল আভাসিত হয়েছে এর কোন কোন শ্লোকে বাঙালি জীবনে ও ছায়াপাত ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। কথ্যরূপের তিনটি আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়। কথ্য রূপগুলি থেকে জন্ম হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অর্থাৎ প্রাকৃতের। মধ্য ভারতীয় আর্যের চারটি উপভাষা (১) উত্তর-পশ্চিমা, (২) পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা (৩) প্রাচ্য-মধ্যা এবং (৪) প্রাচ্যা। এই আঞ্চলিক রূপগুলির উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক ভাষার রূপ গড়ে ওঠে। সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি উপভাষা (১) পৈশাচী (উত্তর-পশ্চিমা থেকে), (২) শৌরসেনী (পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে), (৩) মাহারাষ্ট্রী (পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে) (৪) অর্ধমাগধী (প্রাচ্য-মধ্যা থেকে) এবং মাগধী (প্রাচ্যা থেকে)।

প্রত্যেক শ্রেণির সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় যে মৌখিক প্রাকৃত ছিল তা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি করেছিল। অপভ্রংশেরই শেষ রূপ অবহট্‌ঠ।

'প্রাকৃত পৈঙ্গল-এ' বাঙালি অবহট্‌ঠ কবির কবিতা পাওয়া যায়। যেমন

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।।

অনুবাদ- সেই মোর কান্ত দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে আঁচল দোলাচ্ছি।

কোনো কোনো অবহট্‌ঠ কবিতায় বাঙালির বাস্তব জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,-

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গায়িক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।

অনুবাদ- 'ওগরা ভার, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘী, জুতসই দধি, ময়না মাছ, নালিতা গাছ। কান্তা (রাঁধিয়া বাড়িয়া) দেয়, পুণ্যবান খাইতে পায়' (সুকুমার সেন)

৩.৬. অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কার রচনা?

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কোনটি?

৩. বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনযুগের ব্যাপ্তি উল্লেখ করুন।

৪. 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' কার লেখা?

৫. কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কোন্ কালপর্বটি নির্দেশিত হয়?

৭. 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি' কার লেখা?

৮. গৌড়ী রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি?

৯. সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কি ধরনের কাব্য?

১০. 'কীচক বধ'-এর রচয়িতা কে?

১১. 'গীতগোবিন্দ' কী শ্রেণীর রচনা?

১২. সুভাষিত রত্নকোশের সংকলক কে?

১৩. শ্রীধর দাস সংকলিত গ্রন্থটির নাম কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। টীকা রচনা করুন: 'সুভাষিত রত্নকোশ', 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

২। রীতি কি? গৌড়ী রীতি কোথাকার রীতি? গৌড়ীরীতিতে লিখিত সাহিত্যের পরিচয় দিন।

৩। সংস্কৃত রামায়ণের উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে বাঙালি কবিরা যে সব কাব্য লিখেছেন তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

৪। গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক গোত্র বিচার করে আপনার মতামত দিন।

৫। জয়দেব ব্যতীত সেন রাজসভায় আবির্ভূত কবিদের কাব্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৬। প্রাকৃত ভাষায় লেখা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করুন।

অপভ্রংশ কি? এ ভাষায় লেখা সাহিত্যের পরিচয় দিন।

বিস্তারিত প্রশ্ন

১। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত আছে। আপনি এই মতগুলির সমন্বয় সাধন ক'রে নিজের মতামত দান করুন।

২। সাহিত্যে যুগবিভাগ কি যুক্তিসঙ্গত? বাংলা সাহিত্যে আপনার গ্রহণযোগ্য যুগবিভাগের একটি পরিকল্পনা দেখান এবং সেইরূপ বিভাগের যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।

৩। যুক্তি-প্রমাণযোগে বাংলা সাহিত্যের ক্রম-বৈচিত্র্য ভিত্তিক যুগবিভাগ দেখান।

৪। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত বিশ্লেষণ করে এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সর্বাধিক যুক্তিসম্মত যুগবিভাগ আপনার মতে কেমন হওয়া উচিত? বিভিন্ন ঐতিহাসিকের এতদ্বিষয়ক মতামত স্মরণ রেখে আপনার বক্তব্য পেশ করুন।

৬। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ সংক্রান্ত একটা সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

৭। 'বাংলা সাহিত্যের পত্তন হবার অনেককাল আগে, এমন কি বাংলা ভাষা উদ্ভবের পূর্ব হতেই বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টি, চলে এসেছে এবং তাতে বাংলা সাহিত্যের পূর্বাভাস ধরা পড়েছে।' এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিপূর্ণ তা তথ্যসহকারে আলোচনা করুন।

৮। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বাঙালি-রচিত সাহিত্যের পরিচয় দিন।

৯। জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ নির্দেশ করে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

১০। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় বাঙালির সাহিত্যচর্চার পরিচয় দিন।

একক ৪ ❒ চর্যাপদ

৪.১. উদ্দেশ্য
৪.২. প্রস্তাবনা
৪.৩. পুঁথি পরিচয় ও অনুবাদ
৪.৪. রচনাকাল
৪.৫. কবি-পরিচয়
৪.৬. ধর্ম ও দর্শন
৪.৭. ভাষা-লক্ষণ
৪.৮. সমাজচিত্র
৪.৯. অনুশীলনী
৪.১০. গ্রন্থপঞ্জি

৪.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ কবে কোথা থেকে কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে জানতে পারবেন। চর্যার পুঁথি কিসে লেখা হয়েছিল, তাতে মোট কত পদ ছিল, রচনায় কোন্ বিশেষ রীতি গৃহীত হয়েছিল এ বিষয়ে সম্যক ধারণা করতে পারবেন। চর্যার রচনাকাল ও গ্রন্থনাম নিয়ে যে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক প্রচলিত আছে তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন এবং মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের হদিস করতে পারবেন। চর্যার কবি কারা ছিলেন, কী ছিল তাঁদের ব্যক্তিজীবন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে পারবেন। চর্যার গানগুলি লিখিত হয়েছিল যে দার্শনিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে সে বিষয়ে ধারণা তৈরি হতে পারবেন। চর্যার ভাষার ব্যাকরণগত দিক ও ধর্মতত্ত্বের দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন। চর্যা যে কেবল ধর্মমূলক দর্শনগ্রন্থ নয়, তার মধ্যে সাহিত্যমূল্য রয়েছে ব্যাপক পরিমাণে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন। চর্যাগানে প্রতিফলিত তদানীন্তন সমাজচিত্র বিভিন্ন উদাহরণের মধ্য দিয়ে আপনার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

৪.২. প্রস্তাবনা

বিশ শতকের প্রায় সূচনাভাগে চর্যাপদসমূহের আবিষ্কার বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নথিকরণ শুরু হলেও কোথায় যেন তার ধারাবাহিকতায় অসম্পূর্ণতা ঘটছিল। চর্যাপদ লোকসমক্ষে আসার পর প্রাচীন বাংলার হারিয়ে যাওয়া এক অমূল্য সম্পদের হদিশ পেল সমগ্র পণ্ডিত সমাজ। যিনি সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সকলের

কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তিনি হলেন প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কান্ডারী ও বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডারী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ আবিষ্কারের পিছনে বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতি চর্চার একটু ইতিবৃত্ত আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উনিশ শতকীয় বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট। ছিল দেশের অতীত ভাবসম্পদের পুনরুদ্ধার ও নবমূল্যায়ন করা। এর সূচনা অবশ্য আঠারো শতকের শেষ দিকে এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) স্থাপনের মধ্য দিয়ে। প্রথম দিকে কেবল পাশ্চাত্য পন্ডিতেরাই অতীত ভারতের অবগুণ্ঠন মোচন করে তার লুপ্ত সম্পদ উদ্ধারে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, পণ্ডিতাগ্রগণ্য B. H. Hodgson ও Wright নেপাল থেকে কিছু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে বিদেশের কিছু খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করে পশ্চিমী গবেষকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিলেন। এ ব্যাপারে বাঙালি পন্ডিতেরাও পিছিয়ে ছিলেন না। এর প্রমাণ ১৮৯২ সালে শরৎচন্দ্র দাসের উদ্যোগে 'Buddhist Text Society'-র প্রতিষ্ঠা এগিয়ে এসেছিলেন আর এক বাঙালি পন্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কিছু পুঁথি উদ্ধার করে এনে "The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal" (১৮৮২) শীর্ষক পুস্তিকায় তাদের নাম প্রকাশ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর পুরনো পুঁথি আবিষ্কারের কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থ নিয়ে ফিরলেন কলকাতায়। আর ১৯০৭সালে তাঁর তৃতীয় বারের নেপাল যাত্রা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো চর্যাপদের আবিষ্কারে। চর্যাপদ ছাড়া সেবার এনেছিলেন তিনি সরহপাদের দোহা এবং কৃষ্ণাচার্যের দোহা। এরপর ১৯২২ সালেও নেপালে গিয়ে আরো কিছু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে সংগৃহীত উপরোক্ত তিনটি বইয়ের সঙ্গে পূর্বে আবিষ্কৃত 'ডাকার্নব'কে সংযুক্ত করে শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের নাম দিলেন-'হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ভূমিকায় তিনি চারটি গ্রন্থকেই বাংলা ভাষায় লেখা বলে দাবি করলেও পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিকরা কেবল চর্যার গানগুলিকেই বাংলা ভাষায় লেখা বলে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সেই দিক থেকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন হল চর্যাপদ।

৪.৩. পুঁথি পরিচয় ও অনুবাদ

পুরনো অনেক পুঁথির মতো চর্যাপদের পুঁথিও লেখা হয়েছিল তালপাতায়। নেপাল থেকে আনা পুঁথি আবার রাজদরবারে ফেরৎ দেওয়ার আগে হরপ্রসাদ সে পুঁথির অনেকগুলি ফটোকপি করে নিয়েছিলেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, তালপাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই পদগুলি লেখা হয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায় আছে পাঁচটি করে টানা লাইন। মাঝখানে সামান। একটু ফাঁক। বোধহয় এখানে ছিদ্র করে সুতো বা ঐ জাতীয় কিছু পরাবার কথা ভাবা হয়েছিল। পাতাগুলি সংখ্যাত ছিল এবং সংখ্যাটি ছিল প্রতি পাতার শেষ পৃষ্ঠায়। এইভাবে প্রাপ্ত পুঁথিতে শেষ পাতার অঙ্ক সংখ্যা মিলেছে ৬৯। বিষ্ণু এর পরেও যে পুঁথি বাকি ছিল তার প্রমাণ রয়েছে ঐ পাতার অসমাপ্ত পদে। শুধু শেষের পাতা নয়, চর্যার পুঁথিটির মাঝের কয়েকটি পাতাও অদৃশ্য।

পত্র সংখ্যাগুলি হল-৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৬৬। তাহলে উক্ত পাঁচটি লুপ্ত পাতা বাদে চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিটি মোট ৬৪ পাতার। পুঁথিটিতে আরো একধরনের ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে, মোট পদের সংখ্যা নির্দেশক। বলা বাহুল্য লুপ্ত পাতাগুলিতে যে পদগুলি ছিল স্বভাবতই সেগুলি অপ্রাপ্ত হয়েছে। এরকম অপ্রাপ্ত পদেরসংখ্যা ৩১/ টি। শেষ পাতায় যে পদসংখ্যা মেলে সেটি ৪৯। সেখানেই শুরু হয়েছে ৫০ নং পদ, যার বাকিটা রয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়া পাতায়। মুনিদত্তের টীকার সূত্রে জানা যায়, কোন একটি শতপদী সংকলন থেকে অর্ধেক সংখ্যক পদ নিয়ে তার টীকা ভাষ্য রচনা করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অর্থাৎ চর্যার পুঁথিটি সাকুল্যে ৫০টি পদের সংকলন গ্রন্থ ছিল। তার মধ্যে ৩১/ টি পদ না পাওয়া যাওয়ায় মোট প্রাপ্ত পদের সংখ্যা দাঁড়াল। ৪৬১͵। অবশ্য পরবর্তীকালে এই গ্রন্থেরই তিব্বতী অনুবাদ মিলেছে। অনুবাদক ছিলেন কীর্তিচন্দ্র। সে বইটি অক্ষত। তার থেকে লুপ্ত ৩১/ টি পদের বিষয় ও তার ব্যাখ্যা জানতে পারা গেছে।

গ্রন্থটি রচনায় একটি বিশেষ রীতি গৃহীত হয়েছে। একই সঙ্গে মূল গান ও তার টীকা লিখিত হয়েছে। সাধারণত টীকার পুঁথিতে মূল গানগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয় না। এখানে কিন্তু তা করা হয়নি। সমগ্র পদ টীকাকার উদ্ধৃত করে পরে তার ব্যাখ্যা লিখেছেন। পদগুলি বাংলা ভাষায় লেখা, টাকার ভাষা সংস্কৃত। টীকার নাম 'নির্মল গিরা টীকা'। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। গানগুলি একজন পদকর্তার নয়-নানা জনের। প্রত্যেকটি পদের সূচনায় রাগের উল্লেখ ও পদকর্তার উল্লেখ আছে। তারপর পুরো গান। সবশেষে ব্যাখ্যা বা টীকা। টীকার পর গানের ক্রমিক সংখ্যা। অবশ্য গ্রন্থের সূচনার পদটিতে একটু ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষিত হয়। প্রথমেই নমস্ক্রিয়ার পর সদগুরু বন্দনা ও বস্তুনির্দেশ। তারপর 'কায়া তরুবর' দ্বারা মূল চর্যাগীতির আরম্ভ। অতঃপর গানটির রাগের উল্লেখ। এছাড়া অন্য ধরনের ব্যতিক্রমও আছে। যেমন-১ নং গানে চর্যাপদের নাম উল্লেখিত হয়নি, যদিও গানের মাঝে ভণিতা থেকে জানা যায় এটি কাহ্নপদের রচনা। ১০ নং চর্যার পরে টীকাকার বা লিপিকর লিকে রেখেছেন 'লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি। চ্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।' অর্থাৎ এখানে অপেক্ষিত ব্যাখ্যাটি নেই। তাছাড়া মূল গানগুলির পাঠ এবং টীকায় উদ্ধৃত অংশগুলির পাঠে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই অসমতার কারণে কোন কোন গবেষক মনে করেছেন যে, মূলগীতি সংযোগ ও তার টীকা রচনা দুটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির কাজ। টীকা লেখার পর হয়তো পরবর্তী সেই গানগুলিকে টীকার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন, মুনিদত্তের টীকা পরে কারও দ্বারা সংমার্জিত হয়েছিল। ঐ পরবর্তী সংস্কারক ও অন্য কোন গীতিসংগ্রহ থেকে মূল গানগুলিকে নিয়ে ব্যাখ্যার পূর্বভাগে সংযোজন করে দিতে পারেন। টীকারম্ভের প্রথম বাক্যটি রচনা এবং সম্ভবত গানের সূচনায় কবির ও রাগরাগিনীর নাম সেই সংস্কর্তারই বসানো। পাঁচটি পাতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে ২৩ সংখ্যক গানের ছটি চরণ ছাড়া ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং গান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে। টীকার ক্ষেত্রে ২৩ ও ২৪ সংখ্যক গানের সম্পূর্ণ টীকা এবং ২৫ নং গানের প্রথমাংশের টীকা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। অন্যদিকে ৪৭ নং গানের ব্যাখ্যার সামান্য অংশ হারিয়েছে, আর ৪৮ সংখ্যক গানের শেষ পদটির ব্যাখ্যা ছাড়া গানসহ গোটা টীকাই লুপ্ত। তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কারের পর তার ছায়া অনুসরণ করে ড. সুকুমার সেন লুপ্ত গানগুলির সম্ভাব্যরূপ পুর্নগঠিত করে তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলি' তে প্রকাশ করেছেন। এরও আগে গানগুলি সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন তিব্বতী অনুবাদটির আবিষ্কারক ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

৪.৪. রচনাকাল

চর্যাপদ বা চর্যাগীতি বা চর্যাগীতিকোষ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু এই গীতিগুলি সঠিক কবে রচিত হয়েছিল তা সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। যদি চর্যাগীতির কবি বা রচয়িতাগণের জীবৎকাল সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি লাভ করা যেত, তবে পদগুলির রচনাকাল সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব হত। এই উপাদানগত অভাবের কারণে চর্যাগীতিগুলির ভাষার বৈশিষ্ট্য ও যুগলক্ষণ, পুথির বয়স ও লিপিকাল এবং কবিগণের জীবৎকালের সম্ভাব্য যুগ ও অন্যান্য কিছু বাহ্য ও আভ্যন্তর যুক্তির উপর নির্ভর করে চর্যাগীতির রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রয়াস আনুমানিক হলেও নিতান্ত কল্পনা নয়, অবশ্যই এগুলি ঐতিহাসিক অনুমান এবং গবেষকেরা এখনও পর্যন্ত এগুলি গ্রহণ করেছেন।

চর্যাগীতির আবিষ্কার-লগ্ন থেকেই গীতিগুলির রচনাকাল নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। গীতির ভণিতা অংশ থেকে কবির নাম জানা যায়। কিন্তু জানা যায় না কবির সময়কাল। তবে রচনার ভাষাতাত্ত্বিক বিচার অবশ্যই চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল বিষয়ে প্রামাণ্য যুক্তি উপস্থাপিত করে। দেখা যায়, অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে ভারতীয় ভাষাগুলি যখন আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করছিল- সেই সময়কালের ভাষার নিদর্শন চর্যাগীতিগুলির মধ্যে বিদ্যমান। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-কালের দিক থেকে চর্যাগীতিগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। সুনীতিকুমারের প্রখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ ‘ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ’-এ উল্লেখিত হয়েছে-"The period 950-1200 A.D. would thus seem to be a reasonable date to give to these poems"- O.D.B.L. এই গবেষণা গ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্তে প্রমাণ করেছেন চর্যাগীতির ভাষা অপভ্রংশ নয়, কিংবা হিন্দি-ওড়িশি নয়, অবশ্যই প্রাচীনতম বাংলা। এই প্রাচীন বাংলার কালের ব্যাপ্তি থেকে চর্যাগীতিগুলির রচনাকালের উভয় সীমা নির্ধারণ করা যায়।

পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন ভাষার যুগ-লক্ষণ বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চর্যাগীতিগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত।

ভাষার লক্ষণ ধরে চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল নির্ণয়ে কতকগুলি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তা হল-

প্রথমত চর্যাগীতির পাওয়া পুথি কবিদের স্বহস্তে রচিত নয়, কিংবা টীকাকারদের স্বহস্তে রচিত পুথিও নয়। জনপ্রিয় গীতিগুলি গায়কদের মুখে মুখে কিংবা লিপিকরদের অনুলিপির দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভাষা-বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু গবেষকরা মনে করেন চর্যাগীতিগুলির ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয়ত চর্যাগীতির কবিগণ সমসাময়িক যুগের না-ও হতে পারেন। তাঁদের মধ্যে সময়গত ব্যবধান থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। এসব সত্ত্বেও লক্ষ করা যায় ভাষার মধ্যে এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। এ থেকে অনুমান হয় চর্যাগীতি কবিদের সময়সীমার ব্যবধান দুশো বছরের অধিক নয়। তাই, এ সমস্ত সমস্যার কথা স্মরণ রেখেও বলা চলে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই চর্যাগীতিগুলি রচিত হয়েছিল।

চর্যাগীতির রচনাকাল সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষকের মতবাদ হল

১। চর্যাগীতির পুথি আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলে মনে করেছিলেন।

২। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল প্রসঙ্গে বলেছেন পঞ্চদশ শতকের পরে নয়, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রচনা এবং চর্যাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি অপেক্ষা অর্বাচীন।

৩। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাখালদাসের অনুসরণে চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল 'Post 14th Century' বলে উল্লেখ করেছেন।

চর্যাগীতির রচনাকাল ও পুথির লিপিকাল প্রসঙ্গে আলোচনায় দুই দিকের সময়-সীমা হল দ্বাদশ ও ষোড়শ শতক। তবে সবদিক বিবেচনা করে চর্যাগীতির মূল গীতিগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালের রচনা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য বাহ্য আভ্যন্তর প্রমাণ হল- চর্যাগীতিগুলির বিষয়বস্তু সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি সম্পর্কিত। বাংলা দেশে পাল যুগ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম রাজানুকূল্য লাভ করেছিল। সেন-বর্মন যুগ এ থেকে বঞ্চিত হয় এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় নানাভাবে নিগৃহীত হয়। চর্যাপদে ধর্ম বিষয়ক তথ্য ও সমাজচিত্র নির্ভুলভাবেই পাল যুগের পতন ও সেন-বর্মন যুগের সূচনাকে ইঙ্গিত করে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই।

অন্য একটি দিক হল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে গমন করেন। ওই সময় তিনি লুইপাদকে 'অভি-সময়-বিভঙ্গ' নামে একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, লুইপাদের জীবৎকাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধ। আর সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে চর্যার পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম ধরা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত-সংকলিত সংস্কৃত কোশ গ্রন্থ 'মানসোল্লাস'-এ চর্যার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তাই চর্যাগীতির রচনার সন-তারিখ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা না গেলেও সিদ্ধান্তে আসা যায়, চর্যাগীতিগুলি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

৪.৫. কবি-পরিচয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাগীতিসংগ্রহে মোট বাইশজন কবির ভণিতা পাওয়া যায়। ছদ্মনাম, গুরুর নাম, শিষ্যের নাম সেগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে। লাড়ীডোম্বীপাদ এবং তন্ত্রীপাদের পদ হারিয়ে গেছে।

- লুইপাদের চর্যা দিয়ে সংগ্রহটি শুরু। ১নং পদ ছাড়াও তাঁর আর একটি পদ আছে (২৯)। তিনি আদি সিদ্ধাচার্য। তেঙ্গুরের বর্ণনা অনুসারে তাঁকে বাঙালী বলে অনুমান করা হয়। 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থে লুইপাদ দীপঙ্করের নাম উল্লেখ করেছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দশম শতাব্দীর মানুষ। সেই হিসাবে লুইপাদকে ঐ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে ধরতে হবে।

- তিব্বতীয় ঐতিহ্যে কুকুরী পাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি একটি নেড়ি কুকুর পুষেছিলেন। সুকুমার সেন মনে করেন নামটি সংস্কৃত 'কুকুটিপাদ' শব্দের বিকৃতি। যাঁরা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁদের বলা হত কুকুটপাদ। সংস্কৃত সাহিত্যে একজন কুকুটপাদের উল্লেখ আছে। মুরগির মত এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পায়ের আঁচড় দিয়ে খুঁটে খাওয়ার সঙ্গে তাঁদের শাস্ত্রবিচারের মিল থাকায় উপহাস করে এরকম নাম দেওয়া হয়েছে। যাইহোক, চর্যার কুকুটিপাদ দুটি প্রহেলিকাময় চর্যা লিখেছেন।

- বিরুআ ভণিতায় একটি চর্যা পাওয়া গেছে। নামটির মূল সংস্কৃত বিরূপক। বিরূপ বজ্র বলে টাকাকার উল্লেখ করেছেন। গানটি কোনো শিষ্যের বা ভক্তের রচনা। গুঁড়িবাড়ির বাস্তব চিত্রাঙ্কন দক্ষতার জন্য করি প্রশংসনীয়।
- চাটিল ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে। এটি সম্ভবত ধামের রচনা। চাটিল তাঁর গুরু (ধামার্থে চাটিল সম্ভম গটই)।
- ভুসুকুর আটটি গান আছে। তিব্বতী ঐতিহ্যে এঁকে রাজার ছেলে বলা হয়েছে। ভুসুকুর গানে সেকালের অতি সাধারণ মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগধ্যানের মহিমার কথা তাঁর গানে এসেছে। তাঁর একটি গানে ডাকাতির ছবি আঁকা হয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে তা মূল্যবান।
- কাহ্ন, কাহ্নু ইত্যাদি ভণিতায় বারটি পদ আছে। অবহটঠে লেখা দোষাকোষও আছে কাহ্ন-এর নামে। হয়তো সবগানগুলি এক ব্যক্তির লেখা নয়। দ্বাদশ শতকে রামপালের রাজত্বকালে কৃষ্ণাচার্য নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। অন্য কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত রচনা একই ব্যক্তির বলে ধরতে হবে। বাসনা নিবৃত্তির কথা তিনি বারবার বলেছেন।
- কামলি ভণিতায় একটি পদ পাওয়া যায়। তাঁর পদটি ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান।
- শান্তির নামে দুটি গান আছে। শাস্তি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য ছিলেন। একজন শান্তিকে ভুসুকুর শিষ্য মনে করা হয়।
- মহিন্ডা ভণিতায় একটি গান আছে। নামটিতে পাগলা হাতির দৌরাত্ম্য কর্ণনার ছলে যোগী সাধকের সিদ্ধাবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সরহপাদের গান আছে চারটি। ইনি প্রাচীন সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। এঁর ভণিতায় অবহট্ওঠে লেখা দোহাকোশ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাগানগুলির সঙ্গে ছেপেছিলেন। তিব্বতী পণ্ডিতেরা নামটিকে 'সরোজ' শব্দ জাত মনে করেছেন। কিংবদন্তী অনুসারে রত্নপাল নামে কোন রাজাকে তিনি স্বীয় মতাবলম্বী করেন। ওড়িশা থেকে তিনি মন্ত্রযান শিক্ষা করেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে সিদ্ধাচার্য হন। তিব্বতী ঐতিহ্যে সরহ দুজন। তারানাথ দুজন সরহের নাম উল্লেখ করেছেন। একজন হলেন আচার্য সরোরুহ। অন্যজন কবরী পাদের সঙ্গে অভিন্ন (শবরীর নামান্তর সরহ)।
- একটি গান বীণাপাদের রচনা বলে টীকাকার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই নামে গানটিতে ভনিতা নেই। সেকালের নৃত্যগীতবাদ্যের বিবরণ আছে গানটিতে।
- আজদেব (আর্যদেব) এর নামে একটি গান পাওয়া যায়। তবে নামটি গুরুর হতে পারে। রচয়িতা আলাদা ব্যক্তি।
- ঢেন্ডন পা-এর নামাঙ্কিত গানটি অনামা কবির রচনা। 'ঢেন্ডন' অর্থাৎ যে ঢেঁড়ি বা ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা করে। লোকপরিচিত প্রহেলিকাময় পদ রচনা করেছেন তিনি।
- দারিকের ভণিতায় একটি গান আছে। সেটিতে লুইপাদের উল্লেখ আছে। সম্ভবত দারিক লুইপাদের

শিষ্য। কিন্তু ভণিতাটি এমনভাবে আছে তাতে রচনাটিকে দারিকের বলে মনে হয় না। সুকুমার সেন মনে করেন লুইপাদ ও দারিকের কোন ভক্ত গানটির রচয়িতা। গানটি তত্ত্ব ঘটিত।

- ভাদে ভণিতায় একটি পদ আছে। রাবুল নামটিও পদে আছে। সম্ভবত রাবুল ভাদের গুরু। ভুসুকুর একটি নাম পাওয়া গেছে রাউত। যা থেকে তাকে রাজপুত্র বলে মনে করা হয়। রাবুল এবং রাউত এই নামসাদৃশ্যে ভাদের ভণিতা যুক্ত পদটিকে ভুসুকুর পদ বলে সন্দেহ হয়।
- তাড়ক ভণিতায় একটি গান আছে। একটি রচয়িতার অভিধা হতে পারে (যিনি তাল দেন)। গানটির বিষয় সহজানন্দ বিষয়ক তত্ত্বকথা।
- কঙ্কণ ভণিতায় একটি গান আছে। কঙ্কণ নামটি ঢেন্ডনের মত পদ্যবিষয়ক নাম (ঝুমঝুমি)। গানটির বিষয় তত্ত্বকথা।
- জঅনন্দির নামে একটি গান পাওয়া গেছে। এই গানটির বিষয় তত্ত্বকথা। কবিকে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়।
- ধাম ভণিতায় যে গানটি আছে সেটির ঐতিহাসিক মূল্য গুরুত্বপূর্ণ। কবি ধাম চাটিলের শিষ্য ছিলেন।

পরিশেষে আমরা পদ-রচয়িতাদের নাম ও তাদের রচনার একটি তালিকা তুলে ধরছি-

কাহ্ন-৭/৯/১০/১১/১২/১৩/১৮/১৯/৩৬/৪০/৪২/৪৫

ভুসুকু- ৬/২১/২৩/২৭/৩০/৪১/৪৩/৪৯

শান্তি-১৫/১৬	শবর- ২৮/৫০	সরহ- ২২/৩২/৩৮/৩৯	
ডোম্বী ১৪	ধাম ৪৭	বীণা ১৭	কুকুরী- ২/ ২০
আজদেব ৩১	লুই-১/২৯	গুন্ডরী ৪	কঙ্কন ৪৪
চাটিল ৫	কামলি-৮	জঅনন্দি-৪৬	তাড়ক-৩৭
ঢেগুণ ৩৩	দারিক ৩৪	বিরুআ ৩	মহিত্তা ১৬
ভাদে ৩৫			

৪.৬. ধর্ম ও দর্শন

চর্যাগীতিতে সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনপ্রণালী গুরুত্ব পেয়েছে। সাধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে এর দার্শনিক পটভূমি আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ যেমন নাগার্জুনের শূণ্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ এবং মৈত্রেয় অসঙ্গ বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেব মনে করতেন জীবসত্তা পঞ্চস্কন্ধের দ্বারা গঠিত। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধের দ্বারা ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। অবিদ্যার জন্যই জীবের জন্ম-জরা-মৃত্যু চক্রে আবর্তন। অনন্ত দুঃখের মূল এখানেই। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের সাধনা বৌদ্ধদের সাধনা। তাদের কাম্য হল নির্বাণ।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। ধর্মের

নীতি নির্ধারণ কল্পে চারবার অধিবেশন হয়। বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে হীনযান ও মহাযান। হীনযানীর ব্যক্তিগত নির্বাণ চান। আর মহাযানীরা সর্বজীবের নির্বাণ চান। হীনযানের দুটি বিভাগ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। সৌত্রান্তিকেরা বুদ্ধের সূত্রকে মান্য করতেন। বিজ্ঞান বা চৈতন্যের বাইরে বস্তুসত্তাকে তাঁরা স্বীকার করেননি। এঁরা ভাববাদী দার্শনিক। অন্যদিকে বৈভাষিকরা মনে করতেন মনোজগৎ ও জড়জগৎ দুয়েরই পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

মহাযানও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিক শূন্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের কাছে বস্তু ও চৈতন্য কোনোটারই পারমার্থিক সত্তা নেই। সব কিছুই শূন্যস্বভাব। এই মতবাদের প্রবক্তা নাগার্জুন। এই মতবাদে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কোনটাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করা হয় না। দুয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে মধ্যপথ অবলম্বন করা হয়। সেই জন্য এই মতবাদের নাম মাধ্যমিক।

যোগাচারবাদীরা মনে করে বিজ্ঞান বা চেতনাই সব কিছুর মূলে। চৈতন্যের শান্ত অবস্থাই তাঁদের কাছে নির্বান। সেইজন্য তাঁদের মতবাদরে আর এক নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞানবাদীদের শূণ্যতা মাধ্যমিকদের মত একেবারে শূণ্য নয়। প্রকৃত সত্তা না থাকলেও বস্তুর আছে সাংকৃতিক সত্য। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তখনই বস্তু সম্বন্ধে বোধ জাগে। বিজ্ঞানের নিবৃত্তিতে এর নিনাশ ঘটে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত মাধ্যমিকবাদের প্রসার ছিল। ঐ সময়ের পরে বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব ঘটে। মন্ত্রতন্ত্রের তিনভাগ কালচক্রযান, বজ্রযান এবং সহজযান। কালচক্রযানে বলা হয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের ভেদ লুপ্ত হলে অদ্বয় শূন্যতাবোধের উপলব্ধি হয়। বজ্র কথার অর্থ শূন্য স্বভাব। বজ্রযানে সাধকের গুণ অনুসারে পাঁচটি ধর্ম কল্পিত হয়েছে বজ্র (ডোম্বি), কর্ম (নটী), পদ্ম (রজকী), তথাগত (ব্রহ্মণী) এবং রত্ন (চণ্ডালী)। বজ্রযানীরা স্বভাবশূন্য শূণ্যতত্ত্বের পথে বিশ্বাসী। সহজযানীরা অদ্বয় মহাসুখে বিশ্বাসী। মহাসুখই নির্বাণ। সুখ চার রকম আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সহজানন্দ হল সাধকের উপলব্ধির শেষ স্তর। সেটিই মহাসুখ। খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকে সহজযান ধর্ম মগধ, উড়িষ্যা বাংলা ও কামরূপে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত। চর্যাগীতির কবিরা নানা রূপকের মাধ্যমে চিত্ত নিরোধের কথা বলেছেন। সাধকেরা দেহকে অবলম্বন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। চঞ্চল চিত্তে অবিদ্যার প্রভাব থাকে। চঞ্চলচিত্তকে দৃঢ়চিত্তে পরিণত করে তারা মহাসুখধামে পৌঁছাতে চান। সহজসুখের অধিকারী হয়ে জগৎকে তাঁরা শূন্যময় দেখেন। শরীরের বামা ও দক্ষিণা নাড়ি ললনা ও রসনার গতি নিম্নমুখী। এগুলি জীবকে ভোগের পথে চালিত করে। জীব জরা মরণের বশীভূত হয়। সাধক ললনা ও রসনাকে একত্র করে মধ্যগা নাড়ি অবধূতিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। অবধূতিকার গতি উর্ধমুখী। নির্মাণকায় থেকে সহজকায়ের দিকে সাধকের যাত্রা। নাভিদেশে নির্মাণকায়। এটি প্রথম চক্র বা পদ্ম। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে তার নাম ধর্মচক্র বা ধর্মকায়। তৃতীয় কণ্ঠে নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থ চক্র মস্তকে অবস্থিত সহজকায় বা মহাসুখকায়। বোধিচিত্ত যখন নির্মাণচক্রে উৎপন্ন হয়, তখন সাধকের আনন্দানুভূতি জাগে। বোধিচিত্ত যখন ধর্মকায়ে অবস্থান করে তখন সাধকের পরমানন্দের অনুভূতি হয়। সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দ এবং মহাসুখচক্রে সহজানন্দের অনুভব ঘটে। গুরু নির্দেশ দিয়ে শিষ্যকে সাধন প্রণালী শেখান। কিন্তু সহজানন্দ ভাষণ শ্রবণের অতীত। সহজের স্বরূপ গুরু ব্যাখ্যা করেন না আভাসমাত্র দিয়ে থাকেন। সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়।

চর্যার দেহ সাধনার কথা হরিণ শিকার, নৌচালনা, সাঁকোর সাহায্যে নদী পারাপার, শবর-শবরীর জীবনযাত্রা, ইঁদুরের উৎপাত, মদ-চোলাই ইত্যাদির রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪.৭. ভাষা-লক্ষণ

আমরা জেনেছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারকাল খ্রিস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দ। বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতে। এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার

যোগাচারবাদীরা মনে করে বিজ্ঞান বা চেতনাই সব কিছুর মূলে। চৈতন্যের শান্ত অবস্থাই তাঁদের কাছে নির্বান। সেইজন্য তাঁদের মতবাদরে আর এক নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞানবাদীদের শূণ্যতা মাধ্যমিকদের মত একেবারে শূণ্য নয়। প্রকৃত সত্তা না থাকলেও বস্তুর আছে সাংকৃতিক সত্য। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তখনই বস্তু সম্বন্ধে বোধ জাগে। বিজ্ঞানের নিবৃত্তিতে এর নিনাশ ঘটে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত মাধ্যমিকবাদের প্রসার ছিল। ঐ সময়ের পরে বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব ঘটে। মন্ত্রতন্ত্রের তিনভাগ কালচক্রযান, বজ্রযান এবং সহজযান। কালচক্রযানে বলা হয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালের ভেদ লুপ্ত হলে অদ্বয় শূন্যতাবোধের উপলব্ধি হয়। বজ্র কথার অর্থ শূন্য স্বভাব। বজ্রযানে সাধকের গুণ অনুসারে পাঁচটি ধর্ম কল্পিত হয়েছে বজ্র (ডোম্বি), কর্ম (নটী), পদ্ম (রজকী), তথাগত (ব্রহ্মণী) এবং রত্ন (চণ্ডালী)। বজ্রযানীরা স্বভাবশূন্য শূণ্যতত্ত্বের পথে বিশ্বাসী। সহজযানীরা অদ্বয় মহাসুখে বিশ্বাসী। মহাসুখই নির্বাণ। সুখ চার রকম আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সহজানন্দ হল সাধকের উপলব্ধির শেষ স্তর। সেটিই মহাসুখ। খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকে সহজযান ধর্ম মগধ, উড়িষ্যা বাংলা ও কামরূপে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত। চর্যাগীতির কবিরা নানা রূপকের মাধ্যমে চিত্ত নিরোধের কথা বলেছেন। সাধকেরা দেহকে অবলম্বন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। চঞ্চল চিত্তে অবিদ্যার প্রভাব থাকে। চঞ্চলচিত্তকে দৃঢ়চিত্তে পরিণত করে তারা মহাসুখধামে পৌঁছাতে চান। সহজসুখের অধিকারী হয়ে জগৎকে তাঁরা শূন্যময় দেখেন। শরীরের বামা ও দক্ষিণা নাড়ি ললনা ও রসনার গতি নিম্নমুখী। এগুলি জীবকে ভোগের পথে চালিত করে। জীব জরা মরণের বশীভূত হয়। সাধক ললনা ও রসনাকে একত্র করে মধ্যগা নাড়ি অবধূতিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। অবধূতিকার গতি উর্ধমুখী। নির্মাণকায় থেকে সহজকায়ের দিকে সাধকের যাত্রা। নাভিদেশে নির্মাণকায়। এটি প্রথম চক্র বা পদ্ম। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে তার নাম ধর্মচক্র বা ধর্মকায়। তৃতীয় কণ্ঠে নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থ চক্র মস্তকে অবস্থিত সহজকায় বা মহাসুখকায়। বোধিচিত্ত যখন নির্মাণচক্রে উৎপন্ন হয়, তখন সাধকের আনন্দানুভূতি জাগে। বোধিচিত্ত যখন ধর্মকায়ে অবস্থান করে তখন সাধকের পরমানন্দের অনুভূতি হয়। সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দ এবং মহাসুখচক্রে সহজানন্দের অনুভব ঘটে। গুরু নির্দেশ দিয়ে শিষ্যকে সাধন প্রণালী শেখান। কিন্তু সহজানন্দ ভাষণ শ্রবণের অতীত। সহজের স্বরূপ গুরু ব্যাখ্যা করেন না আভাসমাত্র দিয়ে থাকেন। সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়।

চর্যার দেহ সাধনার কথা হরিণ শিকার, নৌচালনা, সাঁকোর সাহায্যে নদী পারাপার, শবর-শবরীর

জীবনযাত্রা, ইঁদুরের উৎপাত, মদ-চোলাই ইত্যাদির রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪.৭. ভাষা-লক্ষণ

আমরা জেনেছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারকাল খ্রিস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দ। বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতে। এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরের যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা হলে সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিসাবে বাংলার জন্ম হল। তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল এবং তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল। যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ‘পর্বত’ মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় হয়েছিল ‘পব্বত’। চর্যাপদে অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় তথা প্রাচীন বাংলায় আমরা পাচ্ছি ‘পাবত’।

(খ) নাসিকা ব্যঞ্জন লোপ পেল এবং এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল। যেমন বেগেন বের্গে।

(গ) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় আছে চর্যার ভাষায় বা প্রাচীন বাংলায়। মধ্য বাংলায় এদুটি মিলে একটি স্তরে পরিণত হবে। যেমন ভণতিগ্নভনই। (মধ্য বাংলায় ‘ভণে’)

(ঘ) পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে শ্রুতিধনি আসত। যেমন- নিকটেগ্ননিঅড্ডীগ্ননিয়ড্ডী

(ঙ) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন মহাসুখ মহাসুহ (চ) ‘শ’ স্থানে ‘স’ ব্যবহার। যেমন আশা গ্ন আস।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহার। যেমন চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল। কখনো কখনো কর্তায় ‘এ’ বিভক্তি। যেমন রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

(খ) প্রাচীন বাংলা থেকেই গৌণকর্ম ও সম্মাদান কারকের রূপ একই রকম হতে থাকে। দুই কারকেই শূন্য বিভক্তি ‘ক’ বিভক্তি ‘রে’ বিভক্তির প্রয়োগ হতে থাকে। যেমন লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান। (এখানে ‘গুরু’তে শূন্য বিভক্তি)। ‘মতিএ ঠাকুরক পরিণিবিত্তা। (এখানে ‘ঠাকুরক’তে ‘ক’ বিভক্তি। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই। (এখানে ‘তোহোরে’তে ‘রে’ বিভক্তি। অর্থ ‘তোকে’)

(গ) করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি এ (এন)। যেমন মতি এ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (মতি ঐ ঐ

বিভক্তি) করণ ও অধিকরণ দুই ক্ষেত্রেই এ বিভক্তি। অধিকরণ ঘরে (এ বিভক্তি)।

(ঘ) অধিকরণে আরও বিভক্তি ছিল। সেগুলি হল ই, এ, হি, তে, তা।'

যেমন- নিঅড়ি, চীত্র, কাহি, সুখদুখেতে, হাঁড়িত।

(ঙ) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি 'এর', 'র', 'ক'। যেমন 'রুখের' (গাছের), 'মোহোর' (আমাদের), ছান্দক (ছন্দের)

(চ) অপাদানের বিভক্তি 'হুঁ'। যেমন 'রতনই' (রত্নাৎ- রত্ন থেকে)।

(ছ) ক্রিয়া রূপে বর্তমানকালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে 'মি', হুঁ, মধ্যম পুরুষে 'অ' ও প্রথম পুরুষে 'ই'। যেমন 'পুছমি', 'লেই' (উত্তমপুরুষ), 'জাণ' (মধ্যমপুরুষ), 'ভণই' (প্রথম পুরুষ)

(জ) ধাতুর সঙ্গে 'ল', 'ইল' যোগ করে সাধারণ অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত।

যেমন গমূল-গেল, ভুইল-ভইল-ঈ(স্ত্রী) ভইলী

এছাড়া Past Participle বা নিধ্বান্ত পদ দিয়েও অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত।

যেমন গউ (গমুক্তগত গঅগ্নগউ)

(ঝ) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত 'ইব' যোগ করে। যেমন ভাইব (ভাববো)।

চর্যাপদে এমন কিছু কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে যা বাংলা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন শুনিয়া 'লেই' (গুণে নিই), 'দুহিল দুধু' (দোয়া দুখ) ইত্যাদি। বাকভঙ্গি ও শব্দযোজনের ক্ষেত্রে মধ্যবাংলার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে জাত নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত হিন্দির সঙ্গেও চর্যার ভাষার ক্ষেত্র বিশেষে মিল আছে। তবে বাংলার সঙ্গে যোগই বেশি। দু'চারটি ওড়িয়া ও মৈথিল শব্দও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এর ভাষা বাংলা।

৪.৮. সমাজচিত্র

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। কবি তাঁর কল্পনার সাহায্যে কাব্যজগৎ নির্মাণ করেন ঠিকই কিন্তু তার আধার মানবসমাজ। সাহিত্যিক বিশেষ দেশ-কালে আবির্ভূত হন সুতরাং তাঁর চারপাশের জীবনকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। সমকালীন জীবন তাঁর কল্পনা বলে রসরূপ লাভ করে। তাই সমাজ ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাগীতি তার ব্যতিক্রম নয়। চর্যাগুলি তৎকালীন সমাজের অসামান্য দলিল। এই অংশের আলোচনায় কিছু উল্লেখযোগ্য পদের দৃষ্টান্ত দিয়ে সমাজচিত্রের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

লুইপাদ রচিত ১নং পদে সমাজ তেমনভাবে না এলেও তখনকার লোকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ খুঁজেত এমন তথ্য পাওয়া যায়। কুকুরীপাদের পদ (২নং) থেকে আমরা জানতে পারি তখন সমাজে চোর-বাটপাড়ের উপদ্রব ছিল। মাঝরাতে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে চোর গৃহিনীর কানের অলঙ্কার চুরি করে নিয়ে যেত। গৃহবধূরা 'কানেট' নামের কর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত। সব গৃহবধূ সতীসাধ্বী ছিল না। কোনো কোনো পুত্রবধূ শ্বশুরকে ঘুম পাড়িয়ে জেগে থাকত। এই পদে বর্ণিত পুত্রবধূটির দিনে এক রূপ রাত্রে আর এক।

দুধ, ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের নামও পাওয়া গেছে পদটিতে।

বিরুআপাদের পদে (৩নং) আছে মদ ঢোলাই এর বিবরণ এবং মদ্যপায়ীদের বর্ণনা।

কবি চাটিলপাদ রচিত ৫নং পদটিতে দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর খালবিল অধুষিত নদীমাতৃক পল্লী বাংলার অন্তরঙ্গ চিত্র আছে। খরস্রোতা নদীর একপার থেকে আর এক পারে যাবার জন্য লোকেরা কাঠ দিয়ে সাঁকো নির্মাণ করত। 'টাঙ্গী'-র কথা বলা হয়েছে যা কাঠ কাটার কাজে লাগত।

৬নং পদে আছে ব্যাধ সমাজের কথা হরিণ শিকারের বর্ণনা। হরিণের মাংস সেযুগের মানুষের প্রিয় খাদ্য ছিল। হরিণ তার মাংসের জন্য নিজেই নিজের শত্রু এমন কথা বলেছেন কবি ভুসুকু। ব্যাধেরা দল বেঁধে হরিণ শিকারে বেরোত। বনের এক একটা অংশকে তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলত। তাদের হাঁকডাকে হরিণের দল ভীত হত।

১০নং পদে আছে ডোম সমাজের কথা। ডোমনি বাস করে নগরের বাইরে। অন্ত্যজ নিম্নবর্গীয় মানুষেরা কুঁড়েঘর বেঁধে নগরের বাইরে বাস করত। ডোমকন্যার প্রতি অনেক ব্রাহ্মক্ষণ তনয় আকৃষ্ট হত। ডোমকন্যারা তন্ত্রী ও চাঙ্গারি বিক্রি করত। তারা পথের ডাঁটা খেত। যোগী কাপালিকরা হাড়ের মালা পরত। তাদের সাধনসঙ্গিনী থাকত। সাধারণত নিম্নবর্গীয় নারীদের তারা সাধনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করত। কাহ্নপাদের বিবরণ থেকে সমাজের বিচিত্র দিকের পরিচয় পাওয়া গেল।

১৩নং পদে নদীমাতৃক বাংলার কথা আছে। মহাসুখকারের প্রতীক হিসাব নৌকাকে ব্যবহার করেছেন কবি। কারা এখানে কেড়ুয়াল বা মাঝি। তত্ত্বপ্রধান এই কবিতাটিতে সেকালের মানুষের একটি প্রধান জীবিকার কথা পাওয়া গেল।

ডোম্বীপাদ রচিত ১৪নং পদে আছে নৌকা চালনার দৃশ্য। অভিজ্ঞা মাতঙ্গী নৌকা চালনা করে। দাঁড়, কাছি, সেচনী, পাল, মাস্তুল ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিবরণ আছে। যোগীদের কাছ থেকে পারের কড়ি নিত না পাটনিরা।

২১নং চর্যায় ইঁদুর মেরে নিরুপদ্রব জীবন-যাপন করার কথা বলা হয়েছে। ২২নং চর্যায় আছে জপ, তপ, পূজা ইত্যাদি লোকবিশ্বাসের কথা ও তীর্থভ্রমণের কথা। ২৮নং পদে আছে শবর-শবরী কথা। এরাও নিম্নবর্গীয় মানুষ। উচ্চবর্ণীয় মানুষেরা সমতলে বাস করত। আর এরা বাস করত উচু পাহাড়ের টিলার উপর। শবরী নিজেকে শোভিত করাত ময়ূর পালক, গুঞ্জমালা ও কুন্ডল দ্বারা। যারা শৌখিন জীবনযাপন করত তারা আসবাব হিসাবে খাট-পালঙ্ক ব্যবহার করত। শৌখীন পুরুষেরা কপুর-তাম্বুল ব্যবহার করত। ব্রাত্য নরনারীর প্রেমের মধ্যে তীব্রতা ছিল।

৩৩ সংখ্যক পদে আছে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার কথা। পাহাড়ের টিলার উপর যেসব দরিদ্র মানুষ বাস করত সংসারে তাদের অন্নাভাব ছিল। সন্তান-সন্ততির এবং অতিথির অভাব ছিল না। এরা পশুপালন করত। চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। তবে দারোগা ও পাহারাওয়ালাও ছিল। সুযোগ বুঝে রক্ষক ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হত এমন তির্যক মন্তব্যও কবি করেছেন।

৩৭ সংখ্যক পদে মাঝির কথা আছে। যাত্রীরা পারানির কড়ি ফাঁকি দিলে মাঝি তাদের দেহ তল্লাশ করত। কবি তাড়ক সমাজের এই বিচিত্র দিকটিকে তুলে ধরেছেন। কবি এক জায়গায় বলেছেন যে যারা মনে করে বৃদ্ধি দ্বারা সহজসত্য লাভ করেছে তারা মায়া ফাঁসে (গলে গলপাস) আবদ্ধ হয়ে করছে। গলায়

ফাঁস দিয়ে মরার এবং মারার পদ্ধতি ছিল।

৪২ নং পদে সাহ্নপাদ একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তত্তব কথা বোঝাতে গিয়ে। মৃত্যুতে আত্মা বিনষ্ট হয় না একথা বোঝাতে গিয়ে কবি বললেন দুধের মধ্যে পলি থাকে লোকে তা দেখতে পায় না।

চর্যার ধর্ম, দর্শন ও তত্ত্বকথা পরিবেহনের জন্য যেসব রূপকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিতে সমসাময়িক সমাজ ও সমকাল গুরুত্ব পেয়েছে। তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাগুলিকে বাদ দিয়ে রূপকাশ্রয়ী কবিতাগুলির আলোচনা দ্বারা সমাজচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। দেখা গেল সহজিয়া বৌদ্ধ কবিরা দৈনন্দিন জীবনের উপকরণগুলিকেই রূপক হিসাবে ব্যবহার করে ধর্মীয় উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন।

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের কথা তেমনভাবে চর্যাগানগুলিতে বলা হয়নি। সর্বত্রই সমাজের অন্ত্যজ দরিদ্র মানুষের জীবন-যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু চোখে পড়ার মত। শবর, তাঁতি, শুঁড়ি, ধুনুবি, জেলে, মাজ্ঞ, ডোম, নিষাদ এদের কথা বেশি আছে। সমাজে অস্পৃশ্যতা ছিল। দেশের মানুষের কথা যেমন আছে তেমনি মাটির কথাও আছে। বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, কাদামাখা নদীতীর, প্রবল স্রোত, বিচিত্র নামের নৌকা ইত্যাদির বিবরণে চর্যাগান সমৃদ্ধ। লোকজীবনের নানা ক্রিয়াকর্ম, আচার অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদির বর্ণনাগুলি মুখর। ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে বিবাহের শোভাযাত্রার বর্ণনা যেমন পাওয়া যায় তেমনি নাটকাভিনয়ের সংবাদও পাওয়া যায় চর্যা থেকে। বাঙালির আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বারবার এসেছে।

৪.৯. অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারে রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের অবদান কি?

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কত খ্রিষ্টাব্দে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

৩। চর্যাগ্রন্থে মোট কত গান সংকলিত হয়েছে?

৪। চর্যার তিব্বতী অনুবাদকের নাম কি?

৫। চর্যাপদ কোন্ সময়ে লিখিত হয়?

৬। চর্যাসংকলনের হরপ্রসাদ প্রদত্ত নামটি কী?

৭। চর্যা-সংকলনে কার সবচেয়ে বেশি পদ গৃহীত? কত?

৮। সহজযানের পরম লক্ষ্য কী?

৯। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থটির নাম কী?

১০। সন্ধ্যা ভাষা বলতে কী বোঝায়?

১১। চর্যাপদের কোন দুই কবির পদ পাওয়া যায় নি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। নির্মল গিরা টীকা সম্মন্ধে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

২। চর্যাপদ সংকলনের বিশেষ রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৩। মহাযান ধর্মমতের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। অদ্বয় মহাসুখের প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখুন।

৫। চর্যার ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৬। চর্যাগানে সন্ধ্যাভাষার প্রয়োগকৌশল নিয়ে আলোচনা করুন।

৭। চর্যাপদে অন্ত্যজ জাতি বা বর্ণের প্রসঙ্গ কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৮। চর্যার ভাষা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

বিস্তারিত প্রশ্ন:

১। চর্যাপদের আবিষ্কার ও তার পুঁথির প্রাথমিক পরিচয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।

২। চর্যাপদ কোন্ সময়ের রচনা? এ বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিতের অভিমত জ্ঞাপন করে আপনার সিদ্ধান্ত দিন।

৩। চর্যাপদের প্রকৃত নাম কি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়?' গ্রন্থনাম বিষয়ে আপার সুচিন্তিত অভিমত দিন।

৪। চর্যার কবিদের বিষয়ে সংক্ষেপে লিখুন।

৫। চর্যাগানে ব্যবহৃত ভাষা কী নামে অভিহিত? এর ব্যাকরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করুন।

৬। যে গভীর তত্ত্বকথার আশ্রয়ে চর্যাপদগুলি সাহিত্যরূপ লাভ করেছিল তা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।

৭। 'সন্ধ্যাভাষা' কি? চর্যার সন্ধ্যাভাষা সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৮। বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করুন।

৯। চর্যাগনে তদানীন্তন সমাজের ছবি কতখানি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

৪.১০. গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস:

- 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খন্ড সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯১, কলকাতা।
- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', প্রথম খন্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় খন্ড, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।
- 'বাংলা সাহিত্যের কথা', মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, ঢাকা।
- 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা।
- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা।
- 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', প্রথম খন্ড, গোপাল হালদার, কলকাতা।
- 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা।
- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস: (আদি পর্ব)', নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পোরিয়ম, কলকাতা, ১৩৫৬ ব.

চর্যাপদ

- 'চর্যাপদ', মণীন্দ্রমোহন বসু, কমলা বুক ডিপো, পরিমার্জিত সং, এস, কে, চ্যাটার্জি, ১৯৬৬
- 'চর্যাগীতি পদাবলী', সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৬
- 'চর্যাগীতি পরিচয়', সত্যব্রত দে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৩৬৭ ব.
- 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', নির্মল দাশ, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা।
- 'চর্যাপদ', অতীন্দ্র মজুমদার, নয়া প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬১
- 'চর্যাগীতি', তারাপদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
- 'চর্যাগীতির ভূমিকা', জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডি, এম, লাইব্রেরি, ১৩৮২ ব.
- 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা', সুমঙ্গল রাণা, ফার্মা কে. এল, এম,, ১৯৮১
- 'ভাষার ইতিবৃত্ত', সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১১শ সংস্করণ, ১৯৭১
- 'Caryagiti-Kosa of Buddhist Siddhas, Dr. P. C. Bagchi, Santi Bhiksa, Viswabharati
- Origin and Development of Bengali Language, Dr. Suniti Kumar Chatterjee, C.U., Rupa– 1985.

মডিউল-২

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ)

একক ৫ ❒ চৈতন্যপূর্ব কৃষ্ণকথার ধারা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

৫.১. উদ্দেশ্য

৫.২. প্রস্তাবনা

৫.৩. ত্রয়োদশ শতকের বাংলা: সাহিত্যের ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ'

৫.৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা

৫.৫. কবি সমস্যা: চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ

৫.৬. কাব্যের প্রকৃতি

৫.৭. চরিত্র বিচার

৫.৮. বিদ্যাপতি: জীবন ও রচনাপঞ্জি

৫.৯. বিদ্যাপতির পদাবলি

৫.১০. পদকর্তা চণ্ডীদাস

৫.১১. অনুশীলনী

৫.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক অরিস্থিতি কেমন ছিল তা জানা যাবে। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাবে। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের এই এককের মাধ্যমে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়াও এই এককটির উদ্দেশ্য। এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা এই কাব্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন। তাঁরা কাব্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি পড়লে শিক্ষার্থীরা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্ লগ্নে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অবদান, কবি-বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারবেন।

৫.২. প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের পর বাংলা সাহিত্য জগতে যে বন্ধ্যা দশা দেখা দিয়েছিল, বাংলার সমাজজীবনে হতাশার যে কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল-সেই সময়ে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্য জগতে যে আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কিত আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে। কাব্যটির আবিষ্কার, প্রকাশ, তার বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে লৌকিক জীবনের ভাবনা, দেহাতীত প্রেমের আর্তি বিশেষভাবে লক্ষ করা যাবে। তৎকালীন সমাজচিত্র, নাটকীয়তা, চরিত্রচিত্রণ, ভাষাভঙ্গীও এখানে

আলোচনার বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পাবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্যের নতুন গতিপথের সন্ধান পাবেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের আবিষ্কার এবং বৈষ্ণব পদাবলিতে দ্বিজ, দীন ইত্যাদি যুক্ত চণ্ডীদাসের ভণিতায় নানা পদ একই ব্যক্তির লেখা কি না-কার সৃষ্টির রস চৈতন্যদেব আস্বাদন করেছেন ইত্যাদি নানা জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গবেষকগণ কি মতামত দিয়েছেন, তা জেনে বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলির চন্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও চন্ডীদাস সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। ঐতিহাসিকদের অভিন্ন মতামত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সঠিক সমাধানের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলির স্বর্ণ-ফসলে ভরা। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই সাহিত্য শাখাটি সুসমৃদ্ধ রূপ পায়। কিন্তু প্রাক্ চৈতন্য যুগে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদ রচনা করে যেভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন-তা বিস্ময়কর। তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবও স্মরণীয়। বিদগ্ধ রাজসভার কবির হাতে বিচিত্র সৃষ্টি হলেও বৈষ্ণব পদ রচনার জন্যই তিনি বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগেই গ্রামীণ সাধক কবি চন্ডীদাসের হাতে সহজ সুরে গভীর প্রেমের বেদনার্তিও শুনতে পাওয়া যায়। তন্ময়-মন্ময় কবির সৃষ্টি সম্ভার অনির্বচনীয় প্রেমালোকে পাঠককে নিয়ে যায়। বিদ্যাপতি চন্ডীদাসের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তাই এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

৫.৩. ত্রয়োদশ শতকের বাংলা: সাহিত্যের ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ'

১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দীন-মুহম্মদ-বখতিয়ার খলজী অতর্কিতভাবে নদিয়া আক্রমণ করলেন। বৃদ্ধ রাজ্য লক্ষ্মণসেন প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পূর্ববঙ্গে চলে গেলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইখতিয়ারুদ্দীন রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণবতী সমেত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা অধিকার করলেন। উত্তরবঙ্গের দেবকোটে নিজের রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তিনি ছিলেন মুহম্মদ ঘোরীর অনুচর। দিল্লি থেকে দূরে রাজত্ব করলেও তিনি দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে চলতেন।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার নিহত হলেন তাঁরই একজন আমীর আলি মর্দানের হাতে। এরপর চলতে থাকল সিংহাসন নিয়ে হত্যার রাজনীতি। ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজী বঙ্গের রাজধানী দেবকোট থেকে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে স্থানান্তরিত করলেন। দিল্লির সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করলেন তিনি। দিল্লির বাদশাহ ইলতুৎমিশ বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য শাহজাদা নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে পাঠালেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দীন মাহমুদের হাতে নিহত হলেন গিয়াসুদ্দীন। আমীর-ওমরাহের অধীনে বাংলার শাসনের পর্ব শেষ হল। দিল্লির সুতলানদের অধিকারে বাংলার শাসন শুরু হল। তাঁরা তাঁদের অনুগত শাসনকর্তাদের দ্বারা বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন-এর রাজত্বকালে তুগ্রল খান বিদ্রোহী হন। তাঁকে দমন করার জন্য বলবনকে তিন বৎসর বাংলার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে তুগ্রলকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজ কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লক্ষ্মণাবর্তীতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে চলে যান। পিতার মৃত্যুর পর ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে বুগরা খান সুলতান নাসিরুদ্দীন নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের পরে তাঁর পুত্র সুলতান রুকনুদ্দীন

কায়কাউস দশ বৎসর (১২৯১-১৩০১) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তিনি বলবন বংশের শেষ সুলতান।

ত্রয়োদশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলা হল। এবার সমাজ-ইতিহাসের পরিচয় নেওয়া যাক। বাঙালি সমাজে বিবর্তনের পর্যায় শুরু হল। তুর্কি বিজয়ে ভারতীয় পল্লি সমাজ ধ্বংস হল না। ভারতীয় বর্ণভেদ অক্ষুন্ন রইল। গোপাল হালদার দেখিয়েছেন সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে তুর্কি আক্রমণের ফলে। (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা)। উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হয়: পরাজিত হিন্দু সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয় এবং ক্রমে মুসলমান বিজেতারা বাঙালি হয়ে ওঠেন। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজে ঝাঁকুনির ফলে উঁচুনিচু সমান হবার সুযোগ পায়।

তুর্কি আক্রমণের সময়ে এদেশে চারটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল (১) গ্রামদেবদেবী পূজা (২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ (৩) যোগীমত এবং (৪) পৌরাণিক গ্রাহ্মণ্যমক। ঘুসলমান অধিকারের প্রথম দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে এই চারটি ধারার মিশ্রণে সাহিত্য প্রবাহিত দুটি প্রধান ধারার সৃষ্টি হয়- পৌরাণিক ও অপৌরাণিক। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা মুসলমান অভিযানে বিপন্ন হয়ে অন্যদেশে চলে গেলেন যাঁরা থেকে গেলেন তাঁরা হীন অবস্থায় লুকিয়ে থাকলেন। রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি-পণ্ডিতেরা অনাথ হলেন। সেই সময় সাহিত্যচর্জী ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল না।

দ্বাদশ শতাব্দীর পরে দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশি সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছিল এক শূন্যতাময় যুগ। দেড়শ বছর ধরে বাংলায় কিছু লেখা হয়নি এ কথা সহজে মেনে নিতে কষ্ট হয়। আমাদের সান্ত্বনা পেতে হয় এই ভেবে যে, কিছু কিছু অপ্রধান রচনার উদ্ভব হয়তো হয়েছিল কিন্তু কানের হাতে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপের মধ্যযুগকে ইতিহাসে The Dark Age বলা হয়। তারই নামসাদৃশ্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট সময়টিকে 'অন্ধকার যুগ নামে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। অনেকে এই সময়টিকে 'সন্ধি যুগ'ও বলেছেন। আবার একে বন্ধ্যাযুগও বলা হয়ে থাকে। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই সময়ের বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিবেশ উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ছিলনা। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মজীবনে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা প্রায় সীমাহীন হয়েছিল। তার কারণ বিদেশি তুর্কিদের দ্বারা বাংলাদেশের উপর আক্রমণ। ঐ সময়ের বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস আলাচনা প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ করেছি। সুকুমার সেন বলেছেন ''১২০০ হইতে ১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাই-ই বাঙ্গালা ভাষারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ যষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ-৮১)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ''বস্তুত মুসলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা এই ১২০১ হইতে ১৩৫২ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বা সন্ধি-যুগ বলিতে পারি।" 'বাংলা সাহিত্যের কথা', মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ১১) ।

দুই বাংলার দুই সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের উদ্ধৃতি দিলাম। আর উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করছিনা। সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে সেই সময় বাংলাদেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজকতার ঝটিকা চলে। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি যেসব প্রধান কেন্দ্র ছিল সেইগুলি আগে বিধ্বস্ত হয় এবং

বুদ্ধি-বিদ্যাচর্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এর আগে বাংলা দেশে কোন বিদেশি শক্তির ব্যাপক আক্রমণ হয়নি। জনসাধারণ এই অতর্কিত আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বিনা প্রতিরোধে বিদেশিরা বাংলা দখল করে। তারপর নবীন শাসক-সমাজে হত্যা ও প্রতিহত্যার পাপচক্র পুনরাবর্তিত হতে থাকে। মন্দির ভেঙে মসজিদ আর পাঠশালা ভেঙে মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ আরো পরে হয়েছিল। যাইহোক বনেদি বাঙালিরা বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গমভূমিতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাই প্রাচীন বাংলা কাব্য কবিতার বহু দুর্লভ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্ত দেশ থেকে। সার্বিক বিধ্বংস ও পলায়ন-এস্ততার মধ্যে শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। পলায়নের পথে বিলুপ্তিও অসম্ভব নয়। ক্ষ্মএই সব কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০২ থেকে প্রায় ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি এই দেড়শ বছর নিষ্ফলা হয়ে আছে বলে মনে করা হয়।ক্ষ্ম- বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ-২১।

পরবর্তীকালের সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি ও বস্তু বিচার করে সুকুমার সেন অনুমান করেছেন ওই সময়ে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি চণ্ডীর কাহিনি ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ-কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনি ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটোবড়ো গানে অথবা পাঁচালিতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে। সেন তাঁর অনুমানের ভিত্তি হিসেবে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যও নিয়েছেন।

তুর্কি আক্রমণের একটি ভালো ফলের কথা উল্লেখ করেছেন সেন। বাংলাদেশের দুই স্তরের (শিষ্ট এবং দেশীয়) মিলনের জন্য তুর্কি অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। দুই স্তরের সংস্কৃতিগত অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসগত, আচার ব্যবহারগত ও ভাবধারাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতি বিলুপ্ত হয়ে একটি জমাট বাঙালি জাতি হয়ে ওঠার অন্তরায় ছিল একটি প্রধান বস্তুর অভাব বাইরের আঘাত অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সংঘাত।

দেড়শ বছরের সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না শুধু এই দিক থেকেই যুগটিকে অন্ধকার যুগ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তবে সন্ধিযুগ নামটি অনেক বেশি সতর্ক উচ্চারণ। কেননা মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে বাংলার ওই সময়টি সার্বিকভাবে তুলনীয় নয়। আবার বাংলার ওই সময়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসও কম অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

৫.৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তুর্কি আক্রমণ ও পরবর্তীতে মুসলমান শাসনের অত্যাচারে সারা দেশে বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে সময়ে মানুষের জীবন-প্রাণ বিপন্ন। সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত না হলেও ক্ষীণ ধারায় চলছিল। অনেকেই তুর্কি আক্রমণোত্তর এই প্রাক্চৈতন্য (আনুমানিক ১২০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দে) পর্বকে অন্ধকার যুগ বা অনুর্বর পর্ব নামে অভিহিত করেন। কারণ এই সময়ে রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন সেভাবে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পাওয়া যায়নি বলেই যে রচিত হয়নি একথাও সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই দীর্ঘ বছর পর আদি-মধ্যযুগ বা প্রাক্চৈতন্য পর্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর আবিষ্কার এক চঞ্চল্যকর ঘটনা। সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'

কাব্যকে উপেক্ষা করে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ সম্ভব নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের কাছে কাঁকিল্যা গ্রাম শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাঁচা থেকে অযত্নে রাখা অনেকগুলো পুঁথির মধ্য থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর খণ্ডিত পুঁথিটি খুঁজে পান। পরবর্তীতে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এই পুঁথি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথির প্রথম, মধ্যের ও শেষের দিকের বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ফলে কাব্যের নাম, রচয়িতা ও লিপিকাল কোনো কিছুই সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা সম্ভব হয়নি। যে কারণে অনুমানের উপর ভিত্তি করেই কাব্যের নামকরণ, রচনাকাল, কবির নাম ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়েছে আর ফলস্বরূপ এই কাব্য নিয়ে জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমান নির্ভর হওয়ায় বিভিন্ন গবেষক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

পুঁথির মধ্যে একটি ছিন্ন কাগজে এই কাব্যকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলা হয়েছে। কিন্তু এই নামই যে লেখক দিয়েছিলেন তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। যেহেতু এই পুঁথি রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক তাই বসন্তরঞ্জন রায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়েই প্রকাশ করেন। কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে (জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, বস্ত্রহরণখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ) এবং ৪১৫ মতান্তরে ৪১৮টি পদ নিয়ে রচিত। রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তবে এই চণ্ডীদাস নামকে ঘিরেও বিভ্রান্তি ও মতবিরোধের শেষ নেই। তুলট কাগজে লেখা এই পুঁথিকে তিন ধরনের হস্তাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই পুঁথি একজনের হাতে লিখিত নাকি বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত, না কয়েকজন কবির ভাবনা-চিন্তার মিলিত ফসল তা নিয়ে দ্বিধা ও মতভেদ রয়েছে। অনুমান করা হয় পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন বিষ্ণুপুরের কোন ব্রাহ্মণ লিপিকরের হাতের লেখা এই পুঁথিতে রয়েছে। পরবর্তীতে ওই লিপিকরের কোনো সহকারী কর্মচারী এবং তারপর কোনো সাধারণ কর্মচারীর হাতের লেখা পুঁথিতে থাকা সম্ভব। এ পুঁথি রচনার সঠিক কাল নির্দেশ করা সম্ভব না হলেও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে চর্যাপদের ঠিক পরবর্তী স্তরের ভাষার লক্ষণ এই কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। 'ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যের ভাষাকে খ্রিস্টিয় বারো থেকে পনেরো শতকের বাংলা ভাষার প্রতিনিধি বলে মনে করেছেন। খুব সম্ভবত এই লিপি বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লিখিত হয়েছিল। তবে গবেষকরা এই পুঁথির ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দেশ করেছেন। সুকুমার সেন প্রথমে মনে করেছিলেন ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকেই এ কাব্য লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ।' ঐতিহাসিক ও প্রাচীন লিপি বিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতো পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তেরোটি খণ্ড সম্বলিত এই কাব্যে শেষ খণ্ড 'রাধাবিরহ' ছিল অসমাপ্ত। ২২৬ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত এই পুঁথির সমাপ্তি কেবল রাধার বিরহ বেদনায় নাকি শেষপর্যন্ত রাধা কৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই। তবে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ ব্যক্তি মনে করেন 'রাধাবিরহ'-র পরেও একটি খণ্ড ছিল, তার পৃষ্ঠা হয়তো পাওয়া যায়নি। আদি-মধ্যযুগের কাব্য সম্পর্কে নানামত পাওয়া গেলেও এই কাব্যের 'পদগুলি ভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী হবার সম্ভাবনা তার ভাষাও যথেষ্ট প্রাচীন, তার

লিপির ছাঁদও বেশ পুরনো। সম্ভবত সত্যই রচিত হয়ে থাকবে খ্রি. ১৪৫০-১৫০০-এর মধ্যে।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি আবিষ্কারের ১০০ বছরেরও বেশি পার হয়ে যাওয়ার পরেও এই কাব্য নিয়ে ধোঁয়াশা আজও সম্পূর্ণভাবে কাটেনি। আগামী দিনে আরো অনুসন্ধিৎসু গবেষণা সব ধোঁয়াশা কাটিয়ে নতুন আলোর সন্ধান দেবে নিশ্চয়ই।

৫.৫. কবি সমস্যা: চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর লেখনি নৈপুণ্যে পাঠক চিত্তে আজও চিরন্তন হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এই মর্মস্পর্শী লেখক ঠিক কোন সময়ের এবং কতজন চণ্ডীদাস রয়েছেন তা নিয়েই নানা তর্ক-বিতর্ক, বিভ্রান্তি, মতান্তর ও মতবিরোধ। চণ্ডীদাসের নামে অসংখ্য পদের সন্ধান মিলেছে।

বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করার পর থেকে চণ্ডীদাস সমস্যার জটিলতা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। চণ্ডীদাসের নামে একাধিক রাধাকৃষ্ণের বিষয় সম্পর্কিত পদ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন- 'চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি পদ পাওয়া যায়।' এইসব বিভিন্ন পদে চণ্ডীদাসের নামে যে সকল ভনিতা পাওয়া যায় তা হল-আদি চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি। তবে এটা কী একজন কবির ভিন্ন ভিন্ন নাম নাকি একাধিক কবি চন্ডীদাস নাম ধারণ করে পদ রচনা করেছেন তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। চণ্ডীদাস প্রাকচৈতন্য পর্বের নাকি চৈতন্য সমসাময়িক না পরবর্তীকালের সে বিষয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সনাতন গোস্বামী তাঁর 'শ্রীমৎভাগবত'-র টীকা 'বৈষ্ণব তোষিণী'-তে চণ্ডীদাসের নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডে উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এ উল্লেখ করেছেন মহাপ্রভু নীলাচলে থাকা অবস্থায় চণ্ডীদাসের পদ, স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সাহায্যে আস্বাদন করতেন। 'অন্তত দুজন বা তিনজন পদকর্তা চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করে থাকবেন। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস, তিনিই সম্ভবত 'আদি চণ্ডীদাস'; তিনি প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি।' এবং 'দ্বিতীয়জন দ্বিজ চণ্ডীদাস-তিনি চৈতন্যের হয় সমসাময়িক, না হয় অল্প পরবর্তী। পদাবলীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদই তাঁর রচনা। তৃতীয় জন ছিলেন 'দীন চণ্ডীদাস'- যিনি খ্রি. ১৭৫০-এর দিককার লেখক।' অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লা মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা এবং তিনি অন্য কোন পদ রচনা করেননি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক যেসব বৈষ্ণব পদ রয়েছে তা অন্য কোনো চণ্ডীদাসের রচনা হতে পারে। 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (প্রথম সংখ্যা)-য় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ নাই। বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন কবিতা হিসাবে পদাবলী রচনা করেন নাই।' আবার মনীন্দ্রমোহন বসু পদাবলীর চণ্ডীদাস বলতে দীন চণ্ডীদাসকেই বুঝিয়েছেন। ঠিক অন্যদিকে ড. সুকুমার সেন চণ্ডীদাসকে অত্যন্ত ক্ষীণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন পদকর্তা বলেছেন- 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত বাজে মাল অনেক কিছুই আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু 'দ্বিজ' বা 'দীন' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত অনেক পদের মত অবিমিশ্র জঞ্জাল অন্য কোন ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া অবগত নহি।' চণ্ডীদাসের বাসস্থানকে

ঘিরেও নানা মতপার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস একজন কবি না হলে তাঁর বাসস্থানও একাধিক জায়গায় হবে এটাই স্বাভাবিক। বীরভূমের নানুর গ্রামকে যেমন চণ্ডীদাসের বাসস্থান বলে মনে করা হয়, তেমনি বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামও এই গৌরব দাবিদার। 'চণ্ডীদাসের একটি পদে নান্নুরের নিকটে শালতোড়া গ্রাম এবং তথায় নিত্যাদেবীর উল্লেখ আছে। ছাতনার চারি পাঁচ ক্রোশ পূর্বের শালতোড়া নামে গ্রাম আছে, এবং তথায় নিত্যাদেবীর আলয় আছে। নান্নুর ও ছাতনা দুই জায়গাতেই একাধিক প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া গেছে। তাই ঠিক কোন অঞ্চলে চণ্ডীদাসের জন্ম ও বাসস্থান ছিল নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যদি প্রাক্ষ্ণচৈতন্য পর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হয়ে থাকে তবে চৈতন্য পরবর্তীতে চণ্ডীদাস ভণিতায় যে সকল বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছে তাঁরা দুজনে এক নন। এত দীর্ঘ বছর ধরে একজন ব্যক্তির পক্ষে বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। অন্ততপক্ষে দু'জন বা তিন জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব আছে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

এই কবিসমস্যা চন্ডীদাস-সমস্যা নামে পরিচিত। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' গ্রন্থে। তিনি ১১টি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, সেগুলির উত্তর পাওয়া গেলে চন্ডীদাস সমস্যার সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে-

ক্ষ্ম১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকেই চণ্ডীদাস-সমস্যার সূত্রপাত। এর আগে অবধি সকলেই জানতেন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চন্ডীলদ নামে মাত্র একজন কবিই আবির্ভূত হয়েছিলেন; তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ ('সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম', 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' প্রভৃতি) রচনা করেছিলেন। এই চন্ডীদাসের সময় সম্বন্ধেও কারও কোন সংশয় ছিল না; যেহেতু চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছিলেন বলে চরিতগ্রন্থে উক্ত হয়েছে, অতএব চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী-এই কথাই সকলে জানতেন।

ক্ষ্মশ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশের আগেও চণ্ডীদাস ভনিতায় কিছু নিকৃষ্ট পদের আবিষ্কার বিশে শতাব্দীর প্রথম দিকে কোন কোন গবেষকের মনে একটা ক্ষীণ সংশয় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তা দানা বাঁধেনি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হবার পরে এই সংশয় শুধু প্রবল রূপ ধারণ করল না, তা সরব হয়ে উঠল। কারণ চন্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানা দিক দিয়েই প্রভেদ দেখা গেল......

ক্ষ্মমোটের উপর, কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উপর চন্ডীদাস সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। প্রশ্নগুলি এই-

(১) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে কতজন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁরা কোন কোন সময়ের লোক?

(২) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন সময়ের রচনা?

(৩) চৈতন্যদেব কোন চণ্ডীদাসের কী রচনা আস্বাদন করেছিলেন?

(৪) চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ পদগুলি কোন সময়ের রচনা?

(৫) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং শ্রেষ্ঠ পদ একই চণ্ডীদাসের লেখা হতে পারে কিনা?

(৬) শ্রেষ্ঠ পদগুলি চৈতন্য-পরবর্তী দীন চণ্ডীদাসের রচনা হতে পারে কিনা?

(৭) দীন চণ্ডীদাস ছাড়াও অন্য কোন 'চণ্ডীদাস' নামক বিশিষ্ট পদকর্তা চৈতন্য-পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিনা?

(৮) চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত ক্ষ্মসহজিয়াক্ষ্ম পদগুলি কার রচনা?

(৯) 'পদকল্পতরু'তে সংগৃহীত কয়েকটি পদে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলনের যে বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে কোন সত্য নিহিত আছে কিনা?

(১০) চণ্ডীদাসের (বা চণ্ডীদাসদের) বাসভূমি কোন জায়গায় ছিল?

(১১) চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম সম্বন্ধে যে সমস্ত কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে, তাদের কোন ভিত্তি আছে কিনা?

এখানে সব প্রশ্নের আলোচনা সম্ভব নয়। আমাদের দেখতে হবে, চণ্ডীদাস কতজন, চৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন, চন্ডীদাসের আবাসস্থল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ইত্যাদি।

চৈতন্য-পূর্বকালে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই কারণ চৈতন্যচরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে চারবার চৈতন্যদেবের চণ্ডীদাসের পদের কথা বলেছেন। যে চারটি স্থানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল-

(১) বিদ্যাপতি জয়দেব চন্ডীদাসের গীত।

আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।। (আদিলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ)

(২) চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে

গায় শুনে পরম আনন্দ। (মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

(৩) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ। (মধ্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ)

(৪) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।

ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে যায় রামানন্দ।। (অন্ত্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ না হলেও, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার এক প্রত্যক্ষদর্শী স্বরূপ দামোদরের কড়চা পড়ে এবং আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী রঘুনাথ দাসের কাছে শুনে তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় একবার, মধ্যলীলায় দু'বার এবং অন্ত্যলীলায় একবার চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন। উপরে লিখিত পদগুলি তার পরিচায়ক।

আবার, চৈতন্যদেবের কৃপালাভধন্য জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন জয়দেব-বিদ্যাপতির সঙ্গে। তা থেকে বোঝা যায়, চৈতন্যদেবের আগে চণ্ডীদাস নামক একজন কবি

কৃষ্ণকথা লেখেন।-

ক্ষ্মজয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।ক্ষ্ম

এই দুই সাক্ষ্য থেকে প্রকাশ হয়, চৈতন্যদেবের পূর্বেই চণ্ডীদাস নামক একজন কবি ছিলেন, যিনি কৃষ্ণকথা লেখেন।

এরপর চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত আরো কিছু পুথি আবিষ্কৃত হলে জটিলতা অনেক বাড়ে।

১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় একটি পুথি পান যা চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রামলীলার ৭১টি পদ। ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তাফী ৬২টি পদ আবিষ্কার করেন। সেগুলি জন্মলীলার পদ। তারপর মনীন্দ্রমোহন বসু দুখানি পুথি আবিষ্কার করেন। এরপর বর্ধমান জেলার বনপাশ থেকে এই আখ্যান কাব্যের একটি পুথি পাওয়া যায়। তখন অনুমান করা হয়, শ্রীকৃষ্ণলীলার সম্পূর্ণ কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই আখ্যানধর্মী রচনাগুলি বিচার করে দেখা যায়, এগুলি চৈতন্যোত্তর কালের রচনা। ইনি, দীন চণ্ডীদাস নামে পরিচিত ছিলেন। তাহলে মোট দুজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া গেল-চৈতন্য পূর্বকালের একজন, অন্যজন চৈতন্য-উত্তর কালের।

কবির কাল নির্ণয় করতে গিয়ে পুথির কাগজ, কালি, হস্তাক্ষরের ছাঁচ এই সমস্তও বিচার করা হয়। এসব বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি ও কাল-প্রাক্-চৈতন্য বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। এসম্পর্কে আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য দেখতে পারি-

ক্ষ্মযা হোক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল সুনির্দিষ্টভাবে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বা চৈতন্য-পরবর্তী-কোন কালেই স্থাপন করা যায় না। এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, এ বইয়ের চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে রচিত হবার সম্ভাবনাই বেশি, এর মধ্যে একটু-আধটু যে অর্বাচীনতার লক্ষণ দেখা যায়, তা প্রক্ষিপ্ত হতে পারে; অবশ্য নিজের ধারণার সঙ্গে কোন কিছু না মিললেই তাকে প্রক্ষিপ্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যদি চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে ও ১৫৫৪ খ্রি.-র আগে রচিত হয়ে থাকে, বলতে হবে এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী বলতে পারেনি যে, কে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের আদি রচয়িতা-চণ্ডীদাস, না আর কেউ। এর থেকেই মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের ও সনাতন গোস্বামীর পূর্ববর্তী ছিলেন, সমসাময়িক ছিলেন না।

বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালের ঊর্ধ্বতম নির্ধারণ করা দুরূহ নয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বহু জায়গায় বিদ্যাপতির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় (ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য পৃ ২৭১-২৭৮ দ্রঃ)। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পরবর্তী। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বড়ু চণ্ডীদাস বর্তমান ছিলেন। -দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৮)

এরপর কোন চন্ডীদাসের পদ বা কোন রচনা চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন, দেখা যাক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির রচনা চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন না। কারণ এর ভাষা ও রুচি সেরকম মার্জিত নয়। তাছাড়া, চৈতন্যদেব 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আস্বাদন করলে গ্রন্থটি এইভাবে বিস্মৃতির অতলে চলে যেত না। ক্ষ্মএই সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি যে, চৈতন্যপূর্ববর্তী চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখুন বা না লিখুন তিনি কিছু বিচ্ছিন্ন পদ লিখেছিলেন এবং চৈতন্যদেব সেইসব পদ আস্বাদন করেছিলেন।দ(পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ. ৭১)

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হল সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে-

১. চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যে সব পদ পাওয়া যায় সেগুলির কিছু প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কিছু পরবর্তী কালের কোনো কবির লেখা।

২. চৈতন্যদেবের পূর্বে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখুন বা না লিখুন উৎকৃষ্ট কিছু পদ রচনা করেন।

৩. চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আস্বাদন করেনি।

৪. চৈতন্য-পরবর্তীকালে একজন চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন, যিনি 'দীন চণ্ডীদাস' নামে খ্যাত।

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্য-পূর্বকালে রচিত।

৬. চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন যিনি চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় বেশ কিছু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেন।

৫.৬. কাব্যের প্রকৃতি

এই কাব্যের ধরন নিয়ে নানা মতান্তর আছে। 'জাগের গান', 'কুমুর গান', 'ধামালি' ইত্যাদি। তবে-'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত আখ্যানকাব্য, কিন্তু নানা স্থানে নাট্য ও গীতিকাব্যের স্পর্শ আছে'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ১৩টি খণ্ডে ৪১৫টি (মতান্তরে ৪১৮) পদে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কাব্যটি কাব্যনাট্য লক্ষণাক্রান্ত। রাধা-কৃষ্ণ ও বড়ায়ি পারস্পরিক সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনির পথচলার সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে। আগেই বলেছি, এ কাব্যের কাহিনি অনেকখানি নাট্যধর্মী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি-এই তিনটি চরিত্রের ভিতর রাধার মধ্যে সবথেকে বেশি অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাধা চরিত্রটি বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। নাটকে খুব দ্রুত পট-পরিবর্তন হতে দেখা যায়। এই কাব্যের মধ্যেও সেই লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম খণ্ড থেকে পর পর খণ্ডগুলির নামের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায় কাহিনি কত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। কবি তাঁর সমস্ত বক্তব্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, তিনি কাহিনির মধ্যে কোথাও নিজে প্রবেশ করেননি যা নাটকের একটি অন্যতম ধর্ম বলা যায়। তাই এই কাব্যকে শুধু মাত্র কাব্য না বলে নাট্যকাব্য বলা অধিক সমীচীন বলে মনে হয়। কাব্যে কবির সংগীত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই পদের উপরে রাগ তাল উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন-আহের, মালব, গৌড়ী, বেলাবলী, বসন্ত ইত্যাদি। তাই এই কাব্যকে নাটগীতিও বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সঙ্গে ঝুমুরের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ঝুমুরে যেমন শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেখা যায় তেমনি এই কাব্য আদিরসাত্মক। এ কাব্য গঠনে বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন ধরনের পয়ারের ব্যবহার করেছেন। কোথাও প্রচলিত চোদ্দ অক্ষরের পয়ার, কোথাও দীর্ঘ ত্রিপদী, উপাঙ্গ জাতীয় স্তবক, কোথাও আবার লাচাড়ি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

৫.৭. চরিত্র বিচার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে আর একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এই কাব্যের ভাষা, কাহিনি বয়ন এবং আখ্যান এক আধুনিক বার্তা বহন করে। সেই সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়োপখ্যানকে অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যে অঙ্কন করেছেন। আদি মধ্যযুগের একটি কাব্য কৃষ্ণকথার নব নির্মাণে পাঠককুলকে যেন চমকে দিল। এ কাব্যে অত্যাচারী রাজা কংসের নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করতে ও কংসের বিনাশের জন্য মর্ত্যে মানব রূপে কৃষ্ণের জন্ম, বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রণয়াসক্তি, কৃষ্ণের জোরপূর্বক রাধাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, রাধা কর্তৃক প্রথমে কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও পরবর্তীতে কৃষ্ণপ্রেমে রাধার আত্মসমর্পণ এবং শেষে কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধার আকুল বিরহ যন্ত্রণা কবির অসাধারণ কথাচিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও মূলত রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি-এই তিনটি চরিত্রের সংলাপ ও কথোপকথনের মাধ্যমে আখ্যানের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটেছে। স্বর্গীয় দেবদেবী রাধা-কৃষ্ণ চণ্ডীদাসের লেখনি স্পর্শে বাস্তব জীবনের গ্রাম্য যুবক যুবতীতে পরিণত হয়েছে। তিনটি চরিত্রই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

:রাধা:

এ কাব্যে সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় ও পরিবর্তিত চরিত্র রাধা। বাঙালি নারীর সার্থক রূপায়ণ রাধার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এগারো বছরের প্রেম। অনভিজ্ঞা রাধা নপুংসক আইহনের স্ত্রী। এক সাধারণ গ্রাম্য গৃহবধূর মতোই তাঁর অতি সাধারণ জীবন যাপন। তবে রাধা অপূর্ব সুন্দরী আর রাধার এই রূপ সাগরে ডুব দিয়েছে কৃষ্ণ। তাই বড়ায়ির মাধ্যমে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের আর্তি যথা প্রণয় প্রস্তাব রাধার কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সামান্য গৃহবধূ রাধা আত্মসম্মান রক্ষার্থে কৃষ্ণের এরূপ প্রস্তাবকে ক্রোধের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি রাধা কৃষ্ণকে বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে রাধা, সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী। সুতরাং তাঁদের মধ্যে প্রণয় সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষ্ণ এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়, সে তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে সে নানা প্রকারে রাধাকে বিপাকে ফেলে তাঁর দেহ দাবি করে বসে। যুবতী রাধা নিজেকে বাঁচানোর হাজার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমের জোয়ারে আত্মসমর্পণ করে। কৃষ্ণ নিজের দৈবী স্বরূপ সম্পর্কে অবগত থাকলেও রাধা তাঁদের পূর্বজন্ম সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বিস্মৃত। তাই কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই সমর্পণ কোনোরূপ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নয়, এক বঞ্চিত ব্যর্থ নারীর যৌবনের ও জীবনবোধের পূর্ণতা প্রাপ্তির অন্বেষণে। তবে কৃষ্ণ প্রেম রসে সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন হওয়ার পর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে রাধার হৃদয়-বেদনা-ব্যাকুলতা এক মানবিক রূপ লাভ করেছে। রাধার বিলাপের সঙ্গে চৈতন্যোত্তর যুগের মাথুর বা ভাবসম্মিলনের মিল পাওয়া যায়। কাব্যের 'বংশীখণ্ড' ও 'রাধাবিরহ' অংশে কৃষ্ণ প্রেমে নিমজ্জিত রাধার অস্থির চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে এই ছত্রে-

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।

আবার 'রাধাবিরহ' অংশে পাওয়া যায়-

'ঘঁবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।'

এই কাব্যে রাধার মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন, বিকাশের মধ্য দিয়ে কবির সুতীক্ষ্ম সমাজ বাস্তবচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে সমাজজীবনে নারীর যে জীবন সংগ্রাম, পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নারীর হৃদয়ের অসহনীয় ব্যথার চিত্র তা চণ্ডীদাসের অসাধারণ কথাচিত্রে রাধার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাধা কেবলমাত্র আর দেবী থাকেনি সে ওই সমাজের নারীর মূর্তরূপ হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস রাধা চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন এবং রাধা অজান্তেই পাঠক চিত্তকে জয় করে চিরন্তন হয়ে উঠেছে।

:কৃষ্ণ:

সমগ্র কাব্য জুড়ে বড়ু চণ্ডীদাসর কৃষ্ণ চরিত্রটিকে এক অনুদূর, সংকীর্ণচিত্তের, দেহজ কামসর্বস্ব এক গ্রাম্য যুবক রূপে চিত্রিত করেছেন যেখানে কৃষ্ণের সমস্ত দৈবী মহিমা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে। অত্যাচারী রাজা কংসের বিনাশের জন্য মানব রূপে কৃষ্ণের জন্ম হলেও তার মধ্যে কোনো বীরসুলভ মহৎ চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাধার প্রতি তাঁর কামাতুর লোলুপ দৃষ্টি, নিজের প্রেমজালে রাধাকে ফাঁসানোর জন্য যে প্রবঞ্চনা বা ছলনার আশ্রয় সে নিয়েছিল তাতে কৃষ্ণের অমার্জিত বিকৃত রুচির বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে। কৃষ্ণের মধ্যে উগ্র কামুকতা, ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ছাড়া বিশেষভাবে কোনো মানবিক সৎগুণের সন্ধান পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের মায়ের কাছে গিয়ে রাধা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ জানালে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ প্রতিশোধস্পৃহা বশত রাধাকে পুষ্প বাণে আহত করেছে। নিজের দেহসর্বস্ব কামাতুর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে রাধাকে নানাভাবে বিপদের ফেলতেও দ্বিধাবোধ করেনি সে। সমগ্র কাব্য জুড়েই রাধার প্রতি দেহ কামনার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কোনো রকম প্রীতি স্নেহ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। যদিও সে তাঁর পূর্বজন্ম সম্পর্কে অবগত থাকলেও তাঁর চরিত্রের মধ্য দিয়ে কখনোই ঈশ্বর সুলভ আচরণ বা আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি। রাধা তাঁর রূপ-যৌবন কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে না চাইলে কৃষ্ণকে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করতেও শোনা যায়-

'তোমার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধি রাখা নহুলী যৌবন।।'

এছাড়াও কৃষ্ণ রাধাকে কখনো 'নটকী', আবার 'ছিনালী', 'গোয়ালী' বা 'পামরী' ইত্যাদি নামে গালিগালাজও করেছে। রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম যদি সত্যিকারের এক প্রেমিক চিত্তের প্রণয় বাসনা জনিত হৃদয়াবেগ হতো তাহলে বাঁশির খোঁজ না পেয়ে কৃষ্ণ কিছুতেই রাধাকে প্রাণ নাশের ভয় দেখাতে পারত না।

'যবে না না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনি পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে।'

কৃষ্ণের এ উক্তি তাঁর লম্পট চরিত্রকে আরও সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছে। রাধাকে তাঁর নিজের প্রেমরসে রাঙিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একজন ন্যায়-নীতি বিবেকহীন যুবকের

পলায়নী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে সে। ঐশ্বরিক তাৎপর্য বাদে কৃষ্ণ চরিত্রটি অঙ্কনে বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রাম্য আদিরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হলেও কৃষ্ণের গুণকীর্তন নামমাত্র নেই। কৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁকে এইসব নিম্ন প্রবৃত্তির কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আসলে কৃষ্ণ চরিত্রটির মাধ্যমে বড়ু চণ্ডীদাসের সমকালীন সমাজ জীবনের পুরুষশাসিত সমাজ ও নীতিহীন মানুষের চিত্রই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। তাই আদিরসাত্মক এই কাব্যে কৃষ্ণ একটি স্থূল চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

:বড়ায়ি:

কাব্যে বড়ায়ি রাধা কৃষ্ণের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হিসেবে কাজ করেছে। সম্পর্কে সে রাধার মায়ের পিসি। অল্পবয়স্কা রাধার দেখাশোনার জন্য আইহন কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিল বড়ায়ি। সে রাধাকৃষ্ণের দৈবী স্বরূপ ও পূর্ব জন্মের সকল বৃত্তান্ত সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই অবগত ছিল। তাই দুজনের মিলনে সে মাধ্যম। কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা, রাধার কাছে কৃষ্ণের গুণগান, কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব রাধাকে প্রেরণ আবার কখনো রাধাকে নানা অজুহাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া, তাদের মিলনে সহায়তা এই সবকিছুতেই বড়ায়ি সাহায্য করেছে। আধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক দিক থেকে দেখলে বড়ায়ি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্মিলনের আয়োজক, ভগবানের দূতি কিন্তু বাস্তবে সামাজিক দিক থেকে দেখলে সে কুট্টিনি, পরকীয়ায় সাহায্যকারী নীতিহীন এক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তা, মানসিকতায় গ্রাম্য স্থূলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। 'তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নীতিহীন এক চরিত্রের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তা, মানসিকতায় গ্রাম্য স্থূলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। 'তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ি শেষ পর্যন্ত কুটনীই রহিয়া যায় নাই। গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড় মা, রাধার জন্য 'আমি যাই করি মোর আকুল পরাণ'-তাহার অন্তরের কথা।' তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বড়ায়ি তাই যুগের প্রতিনিধি স্বরূপ। ফলে- 'বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকথা লিখতে গিয়ে ভাগবতের পথ ধরলেন না। জয়দেবের আদর্শ অনুসরণ করলেন। সে আদর্শের সঙ্গেই ছিল বাংলার নিজস্ব রীতি ও বিশ্বাসের যোগ।'

৫.৮. বিদ্যাপতি: জীবন ও রচনাপঞ্জি

বাংলাদেশের অধিবাসী না হয়েও, বাংলা ভাষায় কাব্য না লিখেও যিনি বাঙালির হৃদয়ের কবিরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন 'কবি সার্বভৌম' 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি। কবি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। স্মার্ত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও কবিরূপে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। তবে, 'ব্রজবুলি' ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলির জন্যই বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্যাপতির সৃষ্টি-ফসল সমাদৃত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- তবিদ্যাপতির কবিখ্যাতিকে বাঙালীই পবিত্র হোমাগ্নির মতো রক্ষা করিয়াছে।দ

বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিস্ফী গ্রামে ঠাকুর পরিবারে কবির জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠকুর বা ঠাকুর। পিতামহ ছিলেন জয়দত্ত। কবির পিতা ও পিতামহ পুরুষানুক্রমে মিথিলার হিন্দুরাজসভার গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ছিলেন। এই বংশগত সূত্রেই কবি কিশোর বয়সেই

মিথিলার কামেশ্বর বংশের রাজসভার সান্নিধ্যে আসেন। তিনি মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের একাধিক রাজা ও তাঁদের পত্নীদের অনুগ্রহভাজন যে ছিলেন তার প্রমাণ 'কীর্তিলতা'র একাধিক ভণিতাংশ। রাজা কীর্তিসিংহের আমলে গ্রন্থখানি রচিত। ১৪০২-১৪০৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা নিয়ে ঐ সময়েই কাব্যখানি লিখিত হয় বলে গবেষকদের ধারণা। এই গ্রন্থে কবি নিজেকে 'খেলন কবি' বা 'খেলুড়ে কবি' বলেছেন। এতে মনে হয় কবি এই গ্রন্থখানিকে তাঁর কিশোর বয়সের সৃষ্টি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কারো কারো মতে গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হয়েছে।

কীর্তিসিংহের পর কবিকে পাওয়া যায় দেবসিংহের রাজসভায়। এই সময় তিনি 'ভূ-পরিক্রমা' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে আছে কবি শিবসিংহের রাজসভাকবিরূপেই তাঁর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত অমর বৈষ্ণব পদাবলি। বিদ্যাপতি সম্পর্কে সন-তারিখযুক্ত তথ্যাদি যা কিছু পাওয়া যায় তা সবই শিবসিংহের রাজত্বকালের। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে রাজা শিবসিংহের কবিকে প্রদান করা একটি দানপত্রের ব্যাপার নিয়ে নানা মতামত দেখা দিলেও বর্তমানে দানপত্রটি আগাগোড়া জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে 'বিদ্যাপতিকৃত লিখনাবলী' নামক সংস্কৃত পুঁথিতে ২৯৯ লক্ষ্মণ-সংবৎ অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ বারংবার আছে। এ ছাড়াও নানা তথ্য থেকে জানা যায়-কবি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন এবং শক্তসমর্থ ছিলেন। কবির আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও জর্জ গ্রিয়ার্সন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ সমর্থন করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কবির জন্ম এবং ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কবি জীবিত ছিলেন। কবি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সার্বিক বিচারে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধের কোনো এক সময়ে আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ-সপ্তম দশক পর্যন্ত কোন সময়ে দেহরক্ষা করেন।

বিদ্যাপতি শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য ও গণপতির উপাসনা করতেন বলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। তবে পঞ্চোপাসক কবি সাধারণভাবে পৌরাণিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। বৈষ্ণব পদাবলির 'প্রার্থনা' পর্যায়ে বিদ্যাপতির পদগুলি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে কবির বৈষ্ণবতা সম্পর্কে ভক্তগণ বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিদ্যাপতির গ্রন্থসমূহ: বিদ্যাপতির গ্রন্থাদিতে নানা দেব-দেবীর বিষয় আছে, পৃষ্ঠপোষক রাজার জীবনকথাও আছে। সংস্কৃত, অবহট্‌ঠ্‌, মৈথিল ভাষায় তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবিপ্রতিভা সম্পর্কে 'কীর্তিলতা'র ভূমিকা অংশে উল্লেখ করেছেন-

ততাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মতো স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখীদ ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মন্তব্য যে কত সত্য তা তাঁর গ্রন্থাবলি আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বিদ্যাপতির 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'-স্মৃতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তির পরিচয় আছে।

'বর্ষক্রিয়া', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী', 'শৈবসর্বস্বসার' ইত্যাদি পৌরাণিক হিন্দুর পূজা-পার্বণ ও সাধনপদ্ধতির সংকলন গ্রন্থ।

'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা'-তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থ। অপভ্রংশজাত মিশ্র অবহট্ট ভাষায় রচিত।

'ভু-পরিক্রমা'-ভৌগোলিকের তীর্থ পরিক্রমা। মিথিলা থেকে নৈমিষ্যারণ্য পর্যন্ত বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা এতে আছে।

'পুরুষ পরীক্ষা'-সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক, লোকায়ত গল্প আছে। উনিশ শতকে উইলিয়ম কেরির প্রেরণায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য হরপ্রসাদ রায় গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করেন। রাজা শিবসিংহের জীবিতকালেই গ্রন্থখানির রচনা শুরু, কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তির পূর্বেই রাজার দেহাবসান ঘটে।

'গঙ্গাবাক্যাবলী' ও 'শৈবসর্বস্বসার' গ্রন্থ দুখানি শিবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবীর আশ্রয়পুষ্ট হয়ে কবি লিখেছেন।

এর পর রাজা নরসিংহদেব ও রাণী ধীরমতি দেবীর পক্ষপুট ছায়ায় কবি রচনা করেন 'দানবাক্যাবলী' ও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'।

দেশী ভাষায় অর্থাৎ 'মৈথিল' ভাষায় বিদ্যাপতি হর-গৌরী সম্পর্কিত পদাবলি ও সামান্য রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করেন। মিথিলা থেকে গ্রিয়ার্সন সাহেব এরূপ কিছু পদ আবিষ্কার করেন।

কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণব পদাবলির যে সব পদ পাওয়া গেছে তার সব পদই বাংলা-মৈথিল-অবহট্‌ঠ মিশ্রিত এক নূতন ভাষা। এই ভাষা 'ব্রজবুলি' নামে চিহ্নিত।

৫.৯. বিদ্যপতির পদাবলি

বিদ্যাপতির প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী। মিথিলায় তাঁর প্রসিদ্ধি স্মার্ত ও রাজকীয় কীর্তি-কাহিনীর রূপকার হিসাবে। কিন্তু বাংলাদেশে তিনি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব পদাবলির অতুলনীয় রূপদক্ষ শিল্পী। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাঙালি পাঠক বিদ্যাপতির রসধারায় স্নাত হয়ে পদাবলির রসাস্বাদন করে তৃপ্ত। বিদ্যাপতি লৌকিক প্রেমজগৎ থেকে অলৌকিক প্রেমের জগতে পৌঁছেছেন। তাঁর সাধনা-মানব প্রেমকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে রূপান্তরের সাধনা। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের মধ্যেই বিদ্যাপতির কবি-কর্মের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা চরিত্রের তিনটি পর্ব (ক) বয়ঃসন্ধি পর্ব, (খ) অভিসার মিলন-সম্ভোগ-মান পর্ব, (গ) মাথুর বা বিরহ পর্ব। এই তিনটি স্তরেই রাধা চরিত্র কবি সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন।

রাধার বয়ঃসন্ধিকাল-যৌবন আরম্ভের মুখে-স্বপ্নে বিভোর, আনন্দে-উচ্ছ্বাসে ভরা। রাধার উপলব্ধি-তআওল যৌবন শৈশব গেলদ। নবগাত প্রেমলগ্নে রাধার হৃদয় গভীরে বেদনার চেয়ে বিলাস

বেশি প্রকাশ পেয়েছে। নব-অনুরাগের লীলাচাপল্যে মুখর শ্রীরাধিকা। - স্থৈর্য্য নেই।

তঘনে ঘনে নয়ন কোণ অনুসরঙ্গ।
ঘনে ঘনে বসন ধূলি তনুভরঙ্গ।।ত

রাধিকা নিজ শরীরে যৌবনের আবির্ভাব দেখে পুলক বন্যায় ভেসেছে-

তনিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হমই সে আপন পয়োধর হেরি।।ত

অঙ্গলাবণ্য ও বর্ণচ্ছটার সঙ্গে মাধুর্য ও সৌরভ মিশে বিদ্যাপতির রাধা বন-কুসুমের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে।

পূর্বরাগের পর্যায়েই রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-চির প্রেমের চির অতৃপ্তির বাণী-

তজন্ম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।ত
তলাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।ত

অভিসারের পদে নব-অনুরাগিণী-রাধিকা অভিসারে চলেছেন-পথের সব বাধা, সংসার-সমাজ সব কিছুকে তুচ্ছ করে।

তনব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা।।ত

এই পর্যায়ে বিদ্যাপতি প্রকৃতপক্ষে দেহ-সম্ভোগের কবি। তিনি শ্রীরাধাকে অলঙ্করণ মণ্ডলকলায় যেভাবে সাজিয়েছেন, তার ভাবরূপের যে চিত্র এঁকেছেন-তা তুলনারহিত। এর পরেই মধুর মিলনের তকিঙ্কিনী কিনি কিনি কঙ্কন কনকন কলরব নূপুর বাজে।ত জয়দেবের ঐতিহ্য অনুসরণে এখানেই কাব্যের সমাপ্তি রেখা টানার কথা। কিন্তু বিদ্যাপতি তা করেননি। 'মাথুর' কৃষ্ণ-হারা বৃন্দাবনে নেমে এসেছে ঘন অন্ধকার। রাধার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে হৃদয় দীর্ণ করুণ আর্তি।

তএ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।ত

মাথুরের পর ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ে রাধার ভাবাকৃতি এক আশ্চর্য রসাবেশে ভিন্ন রূপ পেয়েছে। কৃষ্ণকে অভ্যর্থনার জন্য আকৃতি মেশানো রাধার নূতন আয়োজনের ব্যস্ততা-

তপিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতই করব নিজ দেহে।ত

বিদ্যাপতির প্রেম ভাবনা এই পর্যায়ে দেহ থেকে দেহাতীত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রাধার ভাবমন্দিরে এক অতীন্দ্রিয় রসানুভূতি জেগেছে। চির নবীন প্রেমের জগতে দেখা দিয়েছে পুরাতন প্রেমের স্থায়ী দ্যুতি।

তকি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।।ত

ভাব-বৃন্দাবনের এই মিলন-চিত্র নির্মাণে বিদ্যাপতি জয়দেবকে অতিক্রম করে-'অভিনব জয়দেবে'র অভিনবত্বকে প্রকাশ করেছেন।

'প্রার্থনা অংশে পরিণত বৃদ্ধ কবির কণ্ঠ ত্রিতাপদগ্ধ সকল মানুষের ঐকান্তিক প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। আত্মসমীক্ষার পথ ধরে জ্ঞান ও কর্মের অহংকারকে দূরে রেখে নিঃশর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে জীবন-মন সমর্পণ করে ভক্তিনম্র চিত্তে কবির প্রার্থনা-

তভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়াপদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।।ত

শান্ত রসাশ্রিত প্রার্থনার পদগুলি নিঃসন্দেহে হৃদয়স্পর্শী।

ভাবের অতলান্ত গভীরতায়, শব্দ ঝংকারের লালিত্যে, ছন্দের অপরূপ সুষমায় ও অলংকরণ মণ্ডলকলায় বিদ্যাপতির মধুর রসাশ্রিত পদগুলি তুলনারহিত। পঞ্ঝটিকা, দোহা, অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, বিষম প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগে কবির শৈল্পিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ-বেদনা ও অতৃপ্তির পাশাপাশি তৃপ্তি ও উল্লাসের সীমাহীন রূপও বিদ্যাপতির পদগুলি জীবন আনন্দে ভরে তুলেছে। তাঁর মতো রসনিপুণ স্রষ্টা বিরল।

বিদ্যাপতির প্রভাব: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু বাঙালি কবি বিদ্যাপতির ছদ্মনামে বেশ কিছু পদ লিখেছেন। তবে প্রত্যক্ষভাবে গোবিন্দ দাসই বিদ্যাপতির যোগ্য ভাবশিষ্য। তিনি বিদ্যাপতির কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদও সম্পূর্ণ করেন এবং দুজনের ভণিতায় সেগুলি এখনও প্রচারিত। শ্রীরঘুনন্দনের এক ভক্তশিষ্য 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি কখনও কখনও 'বিদ্যাপতি' ভণিতাও ব্যবহার করেছেন।

তআমরা মৈথিল বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ী খুলিয়া ধুতি চাদর পরাইয়াছি।দ,আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের এই মন্তব্যটি যথার্থ ঐতিহাসিক ও বাস্তবসম্মত।

বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' কেন বলা হয়?

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে-মৈথিল ভাষা ও প্রজবুলি ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ পদাবলি রচনা করে বিদ্যাপতি মিথিলার কাব্যকুঞ্জকে সুরমূর্ছনায় বিমোহিত করেছিলেন। সেই সুর মিথিলার সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা, উড়িষ্যা, কামরূপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। কবির প্রতি গভীর অনুরাগবশেই তাঁর ভক্তগণ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ 'মৈথিল কোকিল' উপাধিতে কবিকে ভূষিত করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি কবিকূল গৌরব জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক 'গীতগোবিন্দম' কাব্য লিখে সমগ্র পর্ব ভারতের প্রাণের কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর কাব্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও তা ছিল সহজবোধ্য কোমল-মধুর। আদিরসের অভিসিঞ্চনে ছিল রসসিক্ত। বিদ্যাপতিও ছিলেন রাজসভাকবি। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদগুলিও শৃঙ্গাররসে আপ্লুত ও রসানুভূতিতে পূর্ণ। উভয়ের

পদেই 'বিলাস কলাকুতুহল'-এর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই জয়দেব পরবর্তী রসজ্ঞ পাঠক ও ভক্তবৃন্দের কাছে বিদ্যাপতি- 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছেন।

বাংলা ভাষায় না লিখেও কবি বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান কেন?

রামগতি ন্যায়রত্ন ক্ষ্মবাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবক্ষ্ম গ্রন্থে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ওপর বাঙালির দাবির যৌক্তিকতা তত্ত্ব ও তথ্যসহ তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্যের কিছুটা অংশ হল-ক্ষ্মবিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশের এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক ছাত্র মিথিলা যাইয়া পাঠ সমাপন করিয়া আসিতেন।... অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবত উভয় দেশের 'ভাষায়'ও অনেকাংশে একবিধ ছিল; .. অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যে কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুসরণে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সংগীত বঙ্গদেশের ধর্ম-প্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সংগীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারি না।ক্ষ্ম গ্রিয়ার্সন সাহেবও বাঙলাদেশে বিদ্যাপতির বিস্তৃত প্রভাবের কথা বলেছেন। অ-বাঙালি হলেও বিদ্যাপতি বাঙলাদেশের ভাব-ভাবনা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছেন যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যুগ যুগ ধরে কাব্যরসপিপাসু বাঙালির হৃদয় তাঁর কাব্যরসধারায় অবগাহন করে তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব পদ সংকলনেই বিদ্যাপতির স্থান আছে। অদ্বৈতাচার্য, নরহরিদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিই বিদ্যাপতির বন্দনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও বিদ্যাপতির পদের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর মহাজন-কাব্যাস্বাদন উল্লেখ করেছেন-

তবিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় ,

তজয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ।।ত

এরূপ যশগাথা বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনদের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

সবদিক বিয়ার করে বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে বিদ্যাপতির স্থায়ী আসন লাভের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

৫.১০. পদকর্তা চণ্ডীদাস

প্রাক্-চৈতন্য যুগে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ছাড়াও দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চন্ডীদাসের ভণিতায় বহু বৈষ্ণব পদ পাওয়া যায়। পূর্বে 'চণ্ডীদাস সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করা হলেও চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' ও পদাবলির চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি নন। পদাবলির চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্বে বা সমকালে বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চণ্ডীদাস ছিলেন তভাবের রত্নাকরদ। বিশিষ্ট সমালোচক তাঁর পদসমূহকে 'রুদ্রাক্ষের মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সহজিয়া তত্ত্বকে আশ্রয় করে কবি কিছু হেঁয়ালি কবিতা রচনা করলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে তিনি যে গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী ভাব-উদ্দীপক পদ রচনা করেছেন তার জন্যই কবি স্মরণীয় হয়ে আছেন। চন্ডীদাসের পদগুলি চার-পাঁচশো বছর ধরে বাঙালির হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে রয়েছে। কবির খ্যাতিকে অবলম্বন করেই কবির ব্যক্তিজীবন ও নানা অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। সীমাহীন জনপ্রিয়তার জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের তত্ত্ব ও তথ্যাদি অনুসারে চণ্ডীদাস প্রাক-চৈতন্য যুগের কবি।

জন্মস্থান ও ব্যক্তিপরিচয়- পদাবলির চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও ব্যক্তিপরিচয় সুস্পষ্টরূপে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির জন্মস্থান নিয়ে দুটি দাবি আছে। কেউ কেউ বলেছেন কবির জন্মস্থান বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে-অন্যদের দাবি কবির জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। নানা বাদ-বিতণ্ডা থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে স্বীকৃত কবির আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দীর উত্তরপর্বে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে। তবে এ ধারণা-অনুমানভিত্তিক।

কবি প্রতিভা-কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে চণ্ডীদাসের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে-

তবিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
চণ্ডীদাস কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে।ত

শ্রীক্ষেত্রে আত্মভাবোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেব চন্ডীদাসের পদ আস্বাদন করেছেন, শত-শত বছর ধরে বাঙালি সমাজ চণ্ডীদাসের পদামৃত মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে গ্রহণ করে চলেছে। কবি চন্ডীদাসের লেখনীতে পার্থিব প্রেম প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ও সুখ-দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর প্রেম যেন- 'নিকষিত হেম।' কবি-সাধক চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকে বাস্তব জীবনবোধ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমানা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে গেছেন। সহজিয়াধর্ম সাধনার পথ ধরে হাঁটলেও তার পদে রোমান্টিকতার ছোঁয়া আছে। 'যেমন আছ তেমনি আসো আর করো না সাজ'।-ছিল কবির একান্ত কাম্য। যার ফলে তার পদ নিরাবরণ-নিরাভরণ হলেও-ভাবগভীরতায় অতলস্পর্শী। অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দূরবগাহী অনন্ত প্রেমের প্রদীপ-শিখা কবি জ্বেলেছেন।

'বঁধু-কি আর বলিব আমি।
জীবনে-মরণে, জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।'

এখানে রাধা প্রাণমন ঢেলে নিঃশর্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা প্রথমাবধি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর-আত্মহারা। কৃষ্ণের নাম শুনেই দিশেহারা-আত্মভোলা।

'গনী পারা।'

চণ্ডীদাসের পদসমূহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ভাগকরা যায় না। তবু পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, নিবেদন পদগুলিতে চণ্ডীদাস সহজ, সরল অকৃত্রিম ভাষায় গভীর-ঐকান্তিক বিশুদ্ধ প্রেমের স্বর্ণ প্রতিমা গড়ে তুলেছেন।

'আক্ষেপানুরাগে'র একটি পদে রাধিকা কুল-শীল-জাতি-মান তুচ্ছ করে কৃষ্ণগত প্রাণা হয়েছেন। রাধিকার হৃদয়-বেদনা সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। এজন্যই সমালোচক চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলে অভিহিত করেছেন।

অভিসার পর্বের-

'এ ঘোর রজনী-মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।'

পদটিতেও রাধিকা অন্তর-বেদনার দীর্ণ। পূর্বরাগের বিশিষ্ট কবি 'প্রেম বৈচিত্ত্য' ও আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন।

গীতি-প্রাণতা চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রাম বাংলার কবি নিজেকে রাধার বিরহ-আর্তি ও অনুভূতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। ভাবপ্রবণ কবিসত্তা কোমল-করুণ-সুন্দর। তাঁর গভীর প্রেমানুভূতিই রাধার মধ্যে প্রকাশিত কামনা-বাসনা যখন জগতের ঊর্ধ্বে এক অনির্বচনীয় আত্মহারা ভাব আনতে সক্ষম হয়েছে।

'এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ।।'

আত্মমগ্ন অনুভূতির পথ ধরেই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের জগৎ ছেড়ে রাধিকা ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জগতে ডুবে গেছেন। সুক্ষ্ম মিষ্টিক অনুভূতির ছোঁয়ায় চণ্ডীদাসের প্রেমভাবনা রূপ থেকে অরূপের দিকে ধাবিত হয়েছে। চাওয়া-পাওয়ার জগতে যে সব চেয়ে আপনার-অন্তরের সেই সবচয়ে দূরের-তাই গভীর আলিঙ্গন মুহূর্তেও চণ্ডীদাসের লেখনীতে চিরন্তর আর্তি-

'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।'

চণ্ডীদাসের পদাবলি গভীর উপলব্ধির সামগ্রী-বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু নয়। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-তকঠোর ব্রত-সাধনা স্বরূপে প্রেমসাধনা করাই চণ্ডীদাসের ভাব; সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে।দ

চণ্ডীদাস সহজ-সরল ভাষায়, ত্রিপদী ছন্দে অতি সাধারণ অলঙ্কার ব্যবহার করেও রাধার অন্তর্বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাতেই তাঁর শিল্প-চেতনার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। সহজ-স্বাভাবিক গতি ধারায় শব্দের সঙ্গে শব্দের মালা গেঁথে তিনি যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কবির রূপসিদ্ধির স্বরূপটি। এককথায় ভাব ব্যাকুলতা ও গভীরতায় চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে- তচণ্ডীদাসের এক একটি শব্দযোজনা, বাঙ্কারা আমাদের মনের তারে ঘা দিয়ে যে সুর সৃষ্টি করে তা অর্কেস্ট্রা নয়, মেলডি নয়, সে যেন ভাষাহীন, প্রকাশহীন, করুণ বেদনার মর্মদাহ।দ

চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য জ্ঞানদাস পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসের ভাব-গভীরতা, রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার মূর্ছনাকে সঠিকভাবে বজায় রাখতে পেরেছেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনা

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, 'সুখের কবি'। তাঁর পদাবলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত নিটোল মুক্তোর মতো, তাঁর হাতে রাধিকা বাস্তব জীবনের পথ ধরে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্ভোগের কবি নিপুণ শিল্পীর মতো প্রেমের রত্নহার গড়েছেন। তাঁর কাব্য যেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। ভাষার লালিত্যে, অলঙ্করণে, সাজ-সজ্জায়, এক কথায় প্রকাশ কলা সৌষ্ঠবে বিদ্যাপতি এক অনন্য কবি। বিরহ অর্থাৎ মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির কবি-ভাবনা গভীর।

অন্যদিকে চণ্ডীদাস গ্রাম বাংলার কবি। সহজ-সরল বাংলা ভাষায় আশা-ভাষা ও ভালোবাসা দিয়ে তন্ময় চিত্তে, ধ্যানীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি রাধা-কৃষ্ণের লীলারস সৃষ্টিতে মগ্ন ছিলেন। প্রাণের আবেগে মন্ময় চিত্তে তিনি অতীন্দ্রিয় প্রেমের জগতে ডুবে গেছেন। তাঁর কবিতাকে সমালোচক 'রুদ্রাক্ষের মালা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিদ্যাপতির পদ 'ভাষার তাজমহল' আর চণ্ডীদাস যেন 'ভাবের রত্নাকর'। বিদ্যাপতির কবিতাকে ঊর্মিমুখর সমুদ্রের সঙ্গে আর চণ্ডীদাসের কবিতাকে ধ্যানগম্ভীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। চন্ডীদাস 'দুঃখের কবি'। বাসুলীর উপাসক কবি চন্ডীদাস আত্মভাবে বিভোর হয়ে পদ রচনা করেছেন। প্রকাশ কলার সৌন্দর্যে যেমন বিদ্যাপতি- তেমনি অনুভব-সুন্দর প্রেমের সার্থক স্রষ্টা চণ্ডীদাস।

৫.১১. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন:

- দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগ পর্যন্ত সময়পর্বের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে 'অন্ধকার যুগ' বা বন্ধ্যাযুগ বলবার কারণ আলোচনা করুন।

- মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের 'চণ্ডীদাস সমস্যা' সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- 'চণ্ডীদাস সমস্যা'র সূচনা কোন্ সময় বুঝিয়ে বলুন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আবিষ্কর্তা ও রচয়িতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' কেন বলা হয়, সংক্ষেপে বলুন।
- মৈথিলী বা ব্রজবুলিতে বৈষ্ণবপদ রচনা করা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর প্রসঙ্গে কেন আলোচনা করা হয়, বলুন।
- বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলার কারণ কী, বুঝিয়ে বলুন।
- চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- বাংলা সহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল নিয়ে যে মতান্তর সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।
- চণ্ডীদাস সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করুন।
- কুট্টিনী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- টীকা লিখুন: শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।
- প্রাক-চৈতন্যযুগের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচনাকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন্ রীতির রচনা?
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর কবির পরিচয় দিন।
- বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।
- কোন্ কোন্ পর্যায় রচনায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা আলোচনা করুন।
- চন্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় কী?
- 'বাঙালির প্রাণের কবি চন্ডীদাস'-মন্তব্যটির যথার্থ বিচার করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন্ কালপর্বটি 'অন্ধকার যুগ' নামে পরিচিত?
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটির আবিষ্কারক কে?
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে মোট কটি খণ্ড?

- 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর টীকার নাম কী?
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন্ সাহিত্য সংরূপের অন্তর্ভুক্ত?
- সামাজিক সম্পর্কে রাধা কৃষ্ণের কে হন?
- বড়ায়ি কে?
- 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে মোট পদসংখ্যা কত?
- 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কার লেখা?
- 'আহ্মারে' শব্দের অর্থ লিখুন।
- চন্ডীদাস নামধেয় 'কতজন কবিকে পাওয়া যায়?
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মোট কত খণ্ড আছে?
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নামান্তর কী হতে পারে?
- বড়ু চণ্ডীদাস কোন্ দেবীর সেবক?
- বিদ্যাপতির নিবাস কোথায়?
- বিদ্যাপতির পদবী কি?
- ব্রজবুলি কী?
- চন্ডীদাসের জন্মস্থান কোথায়?

একক ৬ ❐ বৈষ্ণব পদাবলী

৬.১. উদ্দেশ্য

৬.২. প্রস্তাবনা

৬.৩. বৈষ্ণব পদাবলী: কালে, কালোত্তরে

৬.৪. চৈতন্য-সমকালীন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ

৬.৫. চৈতন্যোত্তর পদকর্তাগণ

৬.৬. প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা

৬.৭. অনুশীলনী

৬.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা চৈতন্য সমকালের ও চৈতন্য-পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবেন। বিশেষ করে চৈতন্যোত্তর যুগের কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর ধারা, তাঁদের রচনার সৃষ্টি বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানা তথ্য শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করবে। এককটির মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব এবং প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের আলোচনার মাধ্যমে পদকর্তাদের তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ হবে।

৬.২. প্রস্তাবনা

ইতিপূর্বে প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-পদাবলি সাহিত্যের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পরই এই এককে চন্ডীদাস সমস্যা ও পদাবলি সাহিত্যে কবি চন্ডীদাস ও 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতির কবি-পরিচিতি ও কবিকৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ঐ একক পাঠ করে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি যে ধারণা জন্মে থাকবে তাকে পটভূমিকা হিসাবে রেখে, চৈতন্যযুগে যে সব পদকর্তা বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন-এই এককে তাঁদের পরিচিতি ও কবি-কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনায় প্রাক্-চৈতন্যযুগের সঙ্গে চৈতন্যযুগের কবিদের মৌলিক পার্থক্যের নানা দিক জানতে পারা যাবে।

রাধাকৃষ্ণের লীলাকে নিয়ে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' থেকে শুরু করে সংস্কৃত ও ব্রজবুলি ভাষায় যে পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে তার পথ ধরেই সহজিয়া সুরের মরমিয়া কবি চন্ডীদাস আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চৈতন্যোত্তরযুগের কবিগণ পদরচনা করলেও নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বাসকে সহজে মেলাতে পারেননি চৈতন্যপূর্ব কবিদ্বয়ের সঙ্গে। বিদ্যাপতি ও

চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার ভাবনার উৎস কোনো ধর্মীয় দর্শন নয়, সমাজজীবনের নর-নারীর প্রেমভিত্তিক রচনা প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য। তবে, বিদ্যাপতির পদগুলি সচেতন শিল্পীর অলঙ্কার-সজ্জিত, যৌবনাবেগে প্লাবিত, পদগুলি মানবিক প্রণয় কবিতার রূপেই বাঙালি লেখক ও পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দ দাসের হাতে তা আরও সমৃদ্ধ হয়। রোমান্টিক ভাবতন্ময় কবি চন্ডীদাসের প্রভাব পরবর্তীকালে বহু পদকর্তার মধ্যে দেখা যায়। চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস এ ব্যাপারে সার্থক কবি। এই এককে চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হ'লো। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদকর্তাদের পদসমূহের সঙ্গে এই এককের কবিদের সৃষ্টিসম্ভারের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হবে।

চৈতন্যসমকালে ও পরে বৈষ্ণবপদ রচনার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ লক্ষ্য করা যায়। তবে চৈতন্যোত্তর যুগেই এর স্বর্ণফসল ফলেছে। চৈতন্যদেবের সমকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বাদির প্রভাব তেমন দেখা যায়নি যা চৈতন্যোত্তরকালে গভীর ও ব্যাপকরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান এবং রাধিকা তাঁর হ্লাদিনী শক্তির সার-এই ধর্মীয় ভাবনা জাত চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলি। তবে এই ভাব-বিশ্বাসের মূল তত্ত্বটির শৈল্পিক চেতনার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলেই এ যুগের পদগুলি এতো সমৃদ্ধ। এ যুগের বেশীর ভাগ পদই কান্তাপ্রেম আশ্রয়ী মধুর রসে স্নাত। এই পর্যায়ের বৈষ্ণব কবিগণকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

৬.৩. বৈষ্ণব পদাবলী: কালে, কালোত্তরে

বৈষ্ণব গীতি কবিতাকে ‘পদ’ বলা হয়। কিন্তু পদ বা পদাবলী শব্দের উদ্ভবের একটি ইতিহাস আছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে দ্বাদশ শতাব্দীতে পদাবলীর প্রথম সৃষ্টি। জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দম্’ কাব্যে লিখেছেন-

'যদি হরি স্মরণে স্মর সংমন
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীম
সৃনু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।'

তারপর তা আস্তে আস্তে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণতা পেয়েছে এবং উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বৈষ্ণব বলতে একটি ধর্মীয় চেতনা চলে আসে। ধর্মীয় ঐতিহ্য বা ধর্মসম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আছে বৈষ্ণব শব্দটির মধ্যেও। বিষ্ণুর যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব। আর পদাবলী হল পদসমূহ। তবে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বিষ্ণুর উপাসক না হলেও পদ রুনা করেছেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে তাঁরা বৈষ্ণব কবি। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ধারার সৃস্টি তা দীর্ঘ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় সাত শত বছরের বিভিন্ন কবি একই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তন হয়ে গেছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যের ও ভাবের দিক থেকে বিচার করে বৈষ্ণব পদাবলীকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা

হয়। এর মূলে আছেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের প্রভাব ও গুরুত্ব এ বিষয়ে যথেষ্ট। তাই চৈতন্যকেন্দ্রিক তিনই পর্যায় হল-

i) প্রাক্ চৈতন্যকালের বৈষ্ণব পদাবলী।

ii) চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী।

iii) চৈতন্য পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলী।

প্রাক্ঁচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদকর্তা হলেন সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব, রজবুলির বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি বড়ু চণ্ডীদাস। এই তিন পদকর্তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। তাঁদের পদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এ পর্যায়ের পদে কবি প্রাণ মুখ্য ছিল এবং ভক্তপ্রাণ গৌণ ছিল। এই তিন কবি রাধা-কৃষ্ণকে ভক্তপ্রাণরূপে গড়ে তুলেন নি। তাছাড়া এই কবিরা ভক্ত কবি ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ভাবুক মনের ও কবি মনের মানুষ। তাই তাঁদের পদে ভক্তিভাব কম। রাধাকৃষ্ণ প্রেমিকা ও প্রেমিক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া এই পর্যায়ের পদে মধুর রসই মুখ্য এবং ধর্মীয় আবেদনই নয় মানবিক আবেদন এই পর্যায়ের পদগুলিতে বেশী। আবার এই পর্যায়ের তিনজন কবির ধর্ম এক নয়। জয়দেব হিন্দু, বিদ্যাপতি শৈব ও চণ্ডীদাস সহজিয়া। কিন্তু তাঁরা নিজেরা নিজেদেরকে ধর্মচেতন। ও কাব্য সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেন নি। জয়দেব হরি স্মরণ ও বিলাস কলার কথা বলেছেন। চণ্ডীদাস একটু অন্যরকম হয়ে উঠেছেন।

তিনজন কবি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা ছিল না। তাই তাঁদের কবিতা স্বতন্ত্র ও অনুপম। অনেকে এই পর্যায়ের পদে অলংকারের আধিক্য দেখিয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীদাস অনায়াস কবি। তিনি বুঝেছিলেন যে, কবিতায় শব্দই উপাদান, অলংকার উপাদান নয়। তাই তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য অসাধারণ ও দ্যুতি আছে। তাই তিনি প্রথম সার্থক বাঙালী কবি। তাছাড়া এ পর্যায়ের পদগুলির মধ্যে মধুর রসের প্রাধান্য ও দেহ নির্ভর পদ বলে মনে হয়।

চৈতন্য সামরিক বৈষ্ণব পদের উল্লেখযোগ্য পদটি হল গৌরচন্দ্রিকা পদের সৃষ্টি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে তাঁকে ঘিরে বাঙালীর সংস্কৃতি এগিয়ে যেতে চাইল। তাই তাঁকে অবলম্বন করে পদ রচনা শুরু করলেন। তাই এই সময়ের কবিরা অনেকটা বাস্তব ঘোঁষা হয়ে উঠলেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ বর্ণনা শুরু করলেন। চৈতন্যদেবকে ঘিরে যা কিছু দেখেছেন তা দিয়েই পদ রচিত হয়েছে। এ পর্যায়ের পদে চৈতন্য জীবনের স্পষ্ট পরিচয় ভাষা পেয়েছে। তাই এই পর্যায়ের পদে কাব্যরস বা গভীরতা স্বল্প। পদগুলিতে নরহরি প্রবর্তিত ও 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ স্বীকৃত গৌর নাগরিক ভাব ভাষা পেয়েছে ও চৈতন্ত সম্পর্কে রোমান্টিক চেতনার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। বাসু ঘোষ, রামানন্দ প্রভৃতি ছিলেন এই পর্যায়ের বিখ্যাত কবি।

চৈতন্য পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন বৈষ্ণব ভাবনার পরিবর্তন ঘটে গেছে তেমন ভিন্ন রসের পদ রচিত হয়েছে। এই পর্যায়ের কবিরা ভক্ত কবি ও পদগুলিতে ভক্তির ভাব মুখ্য। তাছাড়া সমস্ত পদকর্তার ধর্মচিন্তা ছিল একই ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম চিন্তা। স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ও রাধা তাঁর হ্লাদিনী শক্তি, -এই মূল ভাবটি পদকর্তাদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ছিল। ভাই তাঁরা একই ধরণের পদ রচনা করেছেন ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি চূড়ান্ত মাত্রা লাভ করেছে। পদগুলিতে অলংকারের আধিক্য ও শব্দ ঝংকার লক্ষ্য করা যায়। তাই এই পর্যায়ের পদ গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল বলে মনে হয়।

কিন্তু জয়দেব সৃষ্ট এই পদাবলী দিনে দিনে অবলুপ্ত হতে লাগল। ইতিহাসের গতিতে ক্ষীয়মান হতে হতে একদিন বৈষ্ণব পদরচনা বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো একঘেয়েমী বা একই রসের কাব্যচর্চা জনমানসে নূতন ছাপ না ফেলায় এই কাব্য চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কবির অভাব বা বৈষ্ণব পদকর্তারূপে আর তেমন কোন পদকর্তা মৌলিক কিছু সৃষ্টি করতে না পারায় বৈষ্ণব পদাবলী লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণীর কবির আগমন ঘটলে হয়তো এই একঘেয়েমি দূর করা সম্ভব হতো। তাছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটল। প্রগতির পরিবেশ ছিল না। গতানুগতিক সাহিত্য ধারায় পরিবর্তন আনতে বৈষ্ণবপদাবলীর পরিবর্তন ঘটল। রোমান্টিক ও মানবিক প্রেমগাথার উদ্ভব হলো। নূতন রস ও আঙ্গিকের কবিদের আবির্ভাব ঘটল। প্রেম গাথার কবিররূপে মুসলমান কবিগোষ্ঠী এবং ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল। ফলে বৈষ্ণব পদরচনা বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘকালের বৈষ্ণব পদরচনা বন্ধ হলেও এই ধারা বেঁচে রইল দুভাবে। একদিকে গানের আকারে ও শেষে এসে কবিগানের সঙ্গে যুক্ত হলো। তাই কবিগানেও বিরহ পদ রচিত হয়েছে। এর শেষ ঝলক রবীন্দ্রনাথেব ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে লক্ষ্য করি। অন্যদিকে কবি পণ্ডিত বা পদ সংকলনরা পুরানো পদগুলি সংগ্রহ করে-সংকলন করে অমর করে রাখতে চাইলেন বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে।

৬.৪. চৈতন্য-সমকালীন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ

চৈতন্যদেবের বহু ভক্ত বৈষ্ণবপদ রচনা করেছেন এ সময়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গবিষয় পদ রচিত হয় 'চৈতন্যসমকালে। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব দর্শন তেমন প্রাধান্য পায়নি। তবে প্রেমে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব গভীররূপেই পড়েছে।

(ক) মুরারি গুপ্ত: চৈতন্য জীবনীকার মুরারি গুপ্তের হাতে রাধাপ্রেমের কবিতাও প্রকাশ পেয়েছে চৈতন্যদেবের অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তই প্রথম পদাবলি রচনা করেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তিনি সাত-আটটার বেশি গান (পদাবলি) লিখেছেন বলে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন। তাঁর রচিত পদগুলির মধ্যে-

''স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসিয়েছি।
কি করিবে কুলের কুকুরে।।'-

পদাংশে প্রেমবিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের প্রকাশ ঘটেছে। আর একটি হৃদয়স্পর্শী গানে বিরহিণীর গভীর মর্ম যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণলীলা ও গৌরীলীলার পদগুলিতে কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

(খ) নরহরি সরকার: চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে কবির জন্ম। তিনি পঁচিশটির মতো পদ রচনা করেন। তবে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনাতেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। গৌরাঙ্গকে নাগর এবং নিজের নাগরীরূপে কল্পনা করেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি

পদ রচনা করেছেন। ভাষা সহজ সরল। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে ছিটেফোঁটা আদিরসও আছে। উচ্চাঙ্গের কবিগুণ তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

(গ) **বংশীবদন:** বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের নিকটবর্তী কুলিয়া পাহাড় গ্রামে। ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দের চৈত্র মাসে বাসন্তী পূর্ণিমার দিনে কবির জন্ম হয়। নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকারে উল্লেখ আছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কিছুদিন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষকরূপে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ক পদ ইনিই রচনা করেছেন। এর গৌরাঙ্গলীলার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে কবি তাঁর পদগুলিতে রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদগুলিতেও কখনও কখনও কবি মৌলিকত্ব দেখাতে পেরেছেন। এবং কথা অংশেও বৈচিত্র্য এনেছেন। সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই তিন প্রকারের পদই ইনি সমকৃতিত্বের সঙ্গে রচনা করেছেন। বংশীবদন কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, গোষ্ঠলীলা পূর্ব অনুরুপ পর্যায়ের পদ রচনা করেন। তাঁর নৌকাবিলাসের কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। এছাড়া শ্রীরাধার আপেক্ষানুরাগ শ্রীরাধার অভিসার, রাধার মান ও মানভঞ্জনের জন্য কৃষ্ণকর্তৃক নারীবেশধারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পদ বংশীবদনের নামে পাওয়া যায়।

চৈতন্য সমকালীন অন্যান্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন শিবানন্দ সেন, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। তবে, তিন জন ঘোষ ভ্রাতার মধ্যে বাসুদেব ঘোষই বৈষ্ণব সাহিত্যে অধিকতর খ্যাতি লাভ করেন। এই পর্বের অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষও নরহরি সরকারের মতো 'গৌর নাগরী' ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি সার্থক হয়েছে। নিমাইসন্ন্যাসের পদগুলি ভাষার সারল্যে ও করুণ রসের ছোঁয়ায় হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। গোবিন্দ ঘোষের সব পদ গৌরাঙ্গ বিষয়ক, চাক্ষুষ-কাহিনি হিসেবে এর মূল্য অনস্বীকার্য। মধ্যম ভ্রাতা মাধবের কীর্তন গানে সুখ্যাতি ছিল। তিনি বাংলা ভাষায় চৈতন্য বিষয়ক ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। সহজ ভাষায় রচিত এইসব পদে বাস্তবতা ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।

শিবানন্দ সেন মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং সামান্য কিছু পদ রচনা করেন। শিবাই, শিবানন্দ, শিবাই দাস, শিবরাম প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত অল্প কিছু পদ পাওয়া যায়। শিবানন্দ চৈতন্যদেবকে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং গদাধরকে রাধার অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কোনো কোনো পদে এই তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে। শিবানন্দের নেক পদেই প্রত্যক্ষদর্শীর নিষ্ঠা আছে। তাঁর কবিত্ব সহজ, সরল তাঁর উপমা প্রয়োগ। এই সব কবি ছাড়া যদুনন্দন, গোবিন্দ আচার্য, বাসুদেব দত্ত প্রমুখ চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা সামান্য কিছু পদ রচনা করলেও কবিত্বের দিক থেকে মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য কবিগণের আলোচনার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে।

৬.৫. চৈতন্যোত্তর পদকর্তাগণ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের আমরা দেখতে পাই। এই সময়সীমায় বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ পদকর্তারা বৈষ্ণব

পদাবলিকে এক সমৃদ্ধ স্তরে নিয়ে গেছেন। কলিযুগে কৃষ্ণাবতার চৈতন্যদেবকে জ্যোতির্ময় ভাগবত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের আলোয় আলোচ্য কবিগণ নতুন ভাবরসে মগ্ন হয়ে যে সব পদ উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে কাব্য সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বলতে গেলে এঁরাই বৈষ্ণবপদাবলির ঐশ্বর্যযুগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। নীচে আলোচ্য কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানদাস

বৈষ্ণব পদাবলীতে যে চারজন পদকর্তার নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তার মধ্যে অন্যতম জ্ঞানদাস। কবি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে-'চৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দের ভক্তদের তালিকায় তাঁর নাম আছে। তিনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী ও বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় জাহ্নবাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশের তাঁর জন্ম হয়। খেতুরীতে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্মেলনে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন...। অন্যান্য পদকর্তার মতোই জ্ঞানদাসকে নিয়েও কিছু সমস্যা আছে কিন্তু মোটের উপর তা বড়োই লঘু সমস্যা। ক্ষ্ম...'জ্ঞানদাস' (ও জ্ঞান) ভনিতা অনেক পদ মিলিয়াছে। জ্ঞানদাস নাম তখন এবং পরেও অনেকের নিশ্চয়ই ছিল। এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ নামে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে ধরা যাইতেছে না এবং পদগুলির মধ্যে দ্বিতীয় লেখনীর নিশ্চিত পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং আপাতত জ্ঞানদাস-নামিত সমস্ত পদই একজনের উপর চাপাইতে হয়।'

জ্ঞানদাসের কবিতায় চণ্ডীদাসের আদর্শে রাধার এক গ্রাম্য বধূর মূর্তি ধরা পড়েছে। কবি হিসেবে তিনি অনেক বেশি চণ্ডীদাসের অনুসারী। তাঁর রচিত পদে বিরহের উত্তাপ ঝরে পড়ে। প্রেমের অপূরণীয় বেদবানী রচনায় তিনি আক্ষেপে জর্জরিত। বাঙালি জীবনে নর-নারীর এই আক্ষেপ অনেক সময় আমরা চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পদের পার্থক্য খুঁজে পাই না। কিন্তু জ্ঞানদাস, কবি চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য। সমালোচকরা এমন কথাও বলেছেন বিভিন্ন স্থানে। চণ্ডীদাসের পদ জ্ঞানদাসের পদ বলে প্রচলিত হয়ে গেছে তাতে কিছু করা যায় না। জ্ঞানদাসের কাব্যের ভাব বিহ্বলতা, ছন্দ মাধুর্য পদাবলি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। 'পদাবলীর কবি বলিয়া জ্ঞানদাসের খ্যাতি চণ্ডীদাসের পরেই একইভাবের পদ দুই নামে পাওয়া গিয়েছে কৃতিত্ব কাহার তাহা লইয়া বিবাদ'। যদিও এই মতান্তর চণ্ডীদাস সমস্যার মতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়নি। জ্ঞানদাসকে বাঙালিমন সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁর পদের হৃদয় কাড়া টানে-

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।'

পূর্ববর্তী পদকর্তাগণ রাধার যে ছবি অঙ্কন করেছেন তার সঙ্গে এখানে কিছু পার্থক্য আছে। জ্ঞানদাসই প্রথম আমাদের শোনালেন প্রেমিকার জন্য, প্রেমিকের প্রতিটি অঙ্গ কেঁদে ওঠে। কামজর্জর নারী মনের এমন চিত্র আকুলতাকে বাক্যবন্ধে তুলে ধরতে পেরেছেন। তাঁর অন্য একটি পদে দেখতে পাই-

'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।'

মরীচিকাময় জীবন প্রপঞ্চ, এক মায়ার জগৎ। আমরা যা চাই তা পাই না। জ্ঞানদাস জীবনযুদ্ধে সর্বদা পরাজয় গুজরানে প্রস্তুত। তিনি সুখে থেকেও দুঃখী। অর্থাৎ সুখের সময় ভাবেন পরেই তো দুঃখের হাতছানি সর্বতোভাবে আয়ন করে নেবে। জ্ঞানদাসের এই দর্শন সমগ্র মানব জাতির কাছে এক বড়ো প্রশ্ন হল সে তার আকাঙ্ক্ষার কাছে সবই নেতিবাচক।

জ্ঞানদাস দুঃখবোধের কবি। তাঁর রাধা মিলনেও আনন্দ পান না। চিরকালীন অনিঃশেষিত বেদনাবোধ জ্ঞানদাসের হাতে চিত্রিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের দিক থেকে গ্রহণ করলেও পদগুলিতে তিনি মানবরস সিঞ্চন করেছেন। তাই জ্ঞানদাসের কবিতা সর্বকালের রসমর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বর্ণনাসূচক কয়েকটি পদও লিখেছেন জ্ঞানদাস। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে রাধাকৃষ্ণযুগলতনু বিশিষ্ট যে চৈতন্য, তাঁর দিব্যভাবমণ্ডিত কৃষ্ণবিরহজনিত রূপটিকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন-'

'সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া।।
অতি দূরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতল পড়ি সহচর মুখ চায়।
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বলে থির নাহি বান্ধে।

এভাবেই শুধু পদাবলী সাহিত্যেরই নন, সর্বকালের জ্ঞানদাস বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি হয়ে ওঠেন।

গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের পরিচয় যেটুকু পাওয়া যায়- 'পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের একজন প্রধান পণ্ডিত, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই ভাই শ্রীখণ্ডে মাতামহাবাসে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পৈতৃক নিবাস কুমারনগরে এবং আরো পরে তেলিয়া বুধুরি গ্রামে গিয়ে বসবাস করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদি পরবর্তীকালের জীবনীগ্রন্থ অনুসারে মাতামহ শক্তির উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন। বেশি বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যর নজরে আসিয়া ও তাঁহার প্রভাবে পড়িয়া দুই ভাইই সপরিবারে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের প্রত্নীর নাম মহামায়া, পুত্রের নাম দিব্যসিংহ।' গোবিন্দদাসের দাদা রামচন্দ্র 'কবিরাজ'ও পদকর্তা ছিলেন। তবে গোবিন্দদাসের মতো উৎকৃষ্ট মানের পদ তিনি রচনা করেননি। এবং খুব বেশি রচনাও তাঁর নেই। কিন্তু তিনিও গোস্বামীদের সংস্পর্শে ছিলেন। এ

ছাড়া গোবিন্দদাস বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের বিশেষ সুহৃদ হওয়ায় তাঁর পদগুলি সমকালেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। 'শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দের রচনা বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিতেন। (কবির সঙ্গে জীব গোস্বামীর পত্র ব্যবহার ছিল।) সে পদাবলী পড়িয়া ও শুনিয়া জীব প্রমুখ বৃন্দাবনের গোস্বামীরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সেই প্রীতির চিহ্ন হিসেবে জীব গোস্বামী কবীন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।... গোবিন্দদাস বৈদ্য বলিয়া কবিরাজ ছিলেন না। কবিশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়েছিলেন বলিয়াই তিনি 'কবিরাজ'।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। কিন্তু গোবিন্দদাস নিজকীয়তায় উজ্জ্বল। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অনেক পদই ভনিতার গণ্ডগোল পর্যবসিত। এ প্রসঙ্গে গবেষকদের মধ্যেও নানা বিতর্ক রয়েছে। গোবিন্দদাসের 'আটটি পদে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের যুগ্ম ভনিতা আছে এগুলি সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর তার পদামৃতসমুদ্র টীকায় বলিয়াছেন যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়া নিজের ভণিতায় যোগ করিয়াছিলেন।' একটি বিশেষ পদ সম্পর্কে- 'গোবিন্দদাস স্বীকার করেছেন যে বিদ্যাপতি রচনা পড়িয়া লেখা।' অগ্রজদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এমনটা আর কোনো বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। 'গোবিন্দদাস তিন পূর্ববর্তী কবির উদ্দেশ্যে চারটি বন্দনা পদ লিখিয়াছিলেন-জয়দেবের উদ্দেশ্যে একটি, চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্যে একটি, বিদ্যাপতির উদ্দেশে ২টি।' গোবিন্দদাসের পদ নিয়ে নানারকম বিতর্ক আছে গোবিন্দদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যর শিষ্য। 'শ্রীনিবাস আচার্য আর একজন শিষ্য ছিলেন গোবিন্দদাস আচার্য। তিনিও পদ রচনা করতেন এবং এই গোবিন্দদাস আচার্য পদ রচনায় গোবিন্দদাসের সামনে পারদর্শী ছিলেন 'অষ্টকালীয় লীলাবর্ণনা' বা 'একান্নপদ' নামক পুঁথি আসলে কোন গোবিন্দদাসের রচনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

গোবিন্দ দাস চৈতন্য-পরবর্তী কবি। ফলে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মঞ্জরীভাবের সাধক। রাধার সখী স্বরূপ। সে দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মেনে তিনিই একমাত্র কবি যিনি ভনিতা প্রয়োগের অধিকারী। যেহেতু তিনি বিদ্যাপতির সঙ্গে তুলনীয় তাই সে দিক থেকে বিচার করলে-ভক্তিভাবে বিদ্যাপতির চাইতে অধিক পরিমাণে সচেতন। বিদ্যাপতি যেহেতু চৈতন্য-পূর্ব কবি সে কারণে তাঁর পদে চৈতন্য ভক্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু কাব্য ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। পদাবলীর বিভিন্ন পদের মধ্যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে তিনি গৌরাঙ্গের দেহে রাধাভাব দ্যুতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন-'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে/ পুলক-মুকুল-অবলম্ব'। কিন্তু অভিসারের পদে তিনি 'রাজাধিরাজ'। একটি পদে রাধার অভিসার যাত্রার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। তা শুধু মাত্র কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত রাধার পরিচয় নয়। একই সঙ্গে সকল যুবতীর প্রেমিকের নিমিত্তে অভিসারের কথা-

'কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।।
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল
চল তহি অঙ্গুলি চাপি।।'

দয়িতার সঙ্গে দয়িতের মিলনের জন্য এই যে চুরিবিদ্যা, ফাঁকি দিয়ে প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছনোর শরীর মনের টান; গোবিন্দদাস তাঁর বহু পদে এই সুর ঝঙ্কার তুলেছেন। আবার অন্য একটি পদে লক্ষ করা যায় সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে রাধা চলেছে প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হতে। পার্থিব কোন প্রতিবন্ধকতা সেখানে দেওয়াল হয়ে উঠতে পারেনি-

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলয়িত শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারিই নীল নিচল।।'

পদকর্তা গোবিন্দদাস বৈষ্ণবীয় আখরে ভগবানের প্রতি ভক্তের টানের আড়ালে আসলে যে মানবীয় জীবনেরই আখ্যান রচনা করেছেন এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যা প্রাণ ধর্মের প্রকৃতি স্বরূপ।

গোবিন্দদাসকে একইসঙ্গে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক কবি বলা যায়। তাঁর কাব্যে যেমন ক্লাসিক শিল্পরীতির পরিচয় আছে, তেমনই আছে রোম্যান্টিকতার সংযত উল্লাস। ভাবকে প্রকাশ ও নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি শব্দ, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগ করে পদকে পারিপাট্য দান করেন ধ্রুপদী শিল্পীর মতোই। গোবিন্দদাসের কাব্যের গাম্ভীর্য ভাব ও রূপকে সমন্বয় করেই গঠিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কল্পনাশক্তি এবং তীব্র অনুভূতি।

গোবিন্দদাস জীবনে ও কাব্যে আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিসাধনার পরকীয়া তত্ত্বে মঞ্জরীভাবের সাধক। সর্ব প্রকার কামনাবাসনা থেকে যুক্ত হয়ে সেবিকা হতে পারলেই মঞ্জরী হওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় গোবিন্দদাস পরম সেবকের মতোই মুগ্ধ, তন্ময় ও একাগ্রচিত্ত।

বলরাম দাস: বৈষ্ণবপদাবলি সাহিত্যে একাধিক বলরামের উল্লেখ থাকলেও প্রাচীনতর বলরাম দাসই আমাদের অলোচ্য। কবি কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। কবির ভণিতায় 'পদকল্পতরু'তে ১৩৬টি এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলন গ্রন্থে ১৭৬টি পদ পাওয়া যায়ী কবির বাৎসল্যলীলার পদগুলি অতুলনীয়। রাধা-প্রেমের সকল বৈচিত্র্য নিয়েই তিনি পদ লিখেছেন। বলরাম দাসের কিছু কিছু পদ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছিল।

'হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞই বলরামের পওঁর চিত নহে থির।'

-এই দুটি চরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লক্ষণীয়। বাৎসল্য রসের পদগুলিতে মা যশোদার স্নেহবিহ্বল দৃষ্টির সঙ্গে শিশু গোপালের চুরি করে ননী খাওয়ার চিত্র কবি কোমল মধুর রূপে এঁকেছেন। কবির রচনারীতিতে চন্ডীদাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত শব্দের মালা গেঁথে কবি বহু পদকে সৌন্দর্যদান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাধার রূপানুরাগের পদাংশ তুলে ধরা হ'লো-

''কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালা রূপখানি।।''

বলরাম দাস বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাছাঁদেই পদ লিখেছেন। তাঁর বাংলা ভাষার পদের গুণমান

অনক উন্নত। গভীর ভাবকল্পনার সঙ্গে ভক্তির যথার্থ সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর পদগুলিতে। বলরাম দাস গৌরচন্দ্রিকা ও রাধাকৃষ্ণলীলার পদও রচনা করেন। চৈতন্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গুরু নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত প্রভুরও নাম নেন। নিত্যানন্দের প্রেমোন্মত্ত রূপটি বলরামদাস যেভাবে জানিয়েছেন‘ ’আজও অবধোত করুণার সিন্ধু

প্রেমে গর গর মন   করে হরি সংকীর্তন
পতিত পাবন দীনবন্ধু।।’

তিনি অলংকার শাস্ত্রের বিবিধ পর্যায় অনুসারে পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিসার, সম্ভোগ, রসোদগার, নৌকাবিলাস, খণ্ডিতা, বিরহ প্রভৃতি নানা পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। তাঁর পদে ভাবের ব্যঞ্জনার যতটা প্রসার ঘটেছে, সে তুলনায় তাঁর শিল্পায়নের আবেদন কম। তিনি সহজ সরল ভাষায় পাঠককে বা শ্রোতাকে আলোড়িত করেন। প্রসাধন কলার শিল্পী তিনি নন।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস ছাড়াও এই পর্বের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে রয়েছেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, রায়শেখর (কবিশেখর) লোচনদাস, ঘনশ্যামদাস কবিরাজ, হরিবল্লভ প্রমুখ কবি। এঁদের মধ্যে অন্যতম পদকর্তা রায়শেখর (কবিশেখর)। কবির আসল নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। তিনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। প্রকৃত চিত্র রচনার পাশাপাশি, শব্দ ঝঙ্কারের প্রতি কবির বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়।

লোচনদাস ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচয়িতা। তিনি কয়েকটি পদও রচনা করেছেন। তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদে ‘গৌরনাগরী’ ভাবের অনুসরণ আছে। ইনি ছন্দ ব্যবহারে শ্বাসাঘাতযুক্ত ছড়ার ধরনের ত্রিপদী ছন্দ যা ‘ধামালি’ নামে পরিচিত, ব্যবহারে আকর্ষণ বোধ করতেন। ফলে পদগুলিতে লঘু চটুলতা প্রকাশ পেত যেমন,

বিনোদ ফুলের   বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
কোন্ বিনোদিনী   গাঁথিলে মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে।

এ ছাড়া অন্যান্য কবি পদ রচনায় তেমন সাফল্য লাভ করেননি।

৬.৬. প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা

প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা করতে হলে শুরুতেই বাংলায় বৈষ্ণবপদের আবির্ভাব কীভাবে হচ্ছে বুঝে নেওয়াটা দরকার।

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বিষয়বস্তু রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সমাজবহির্ভূত প্রেম। বাংলার লোকজীবনে রাধা ও কৃষ্ণের গল্প বহু দিন থেকেই প্রচলিত। বহু পূর্ব থেকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় শ্লোকাকারে প্রণয়কবিতা লেখা হয়েছে যার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম আছে। দশম শতাব্দীতে বাংলা দেশেই পাওয়া গেছে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা ‘কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়’ এবং ‘সদুক্তি কর্ণামৃত’ নামক দুটি সংকলন গ্রন্থে। কিন্তু

এর সঙ্গে সাধারণ মানবিক প্রেমকবিতার কোনো পার্থক্য ছিল না। জয়দেব 'গীতগোবিন্দম'-কে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পূর্ণাঙ্গ কাব্য করে তুললেন। যেখানে 'বিলাসকলাকুতুহল' এর পাশাপাশি 'হরিস্মরণ'ও ছিল। প্রাক-চৈতন্যযুগে বাংলা বৈষ্ণব পদ মূলত জয়দেবকে অনুসরণ করেই লেখা। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দম্' রচনা করলেও প্রথাগত শ্লোক না লিখে বাংলা রীতির গীতিধর্মী পদ লিখলেন। প্রাক্ 'চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী মূলত বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের রচনা। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাহিনির পরম্পরা থাকলেও কোনো কোনো পদ স্বতন্ত্র বৈষ্ণব পদের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। মূলত প্রেমলীলাকে উপজীব্য করেই এঁদের পদরচনা। এঁদের রচিত পদাবলী মানবিক রসে সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিকতার আরোপ এখানে অকারণ। রাধা-কৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য কোনো রূপ দেবত্ব এদের নেই। এই কাব্যধারাটিই বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ও চন্ডীদাসের সহজ ও শক্তিমান কবিত্বশক্তির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই পদগুলিই চৈতন্যদেব আস্বাদ করে আনন্দ লাভ করতেন।

ভাগবতীয় কৃষ্ণভক্তির ধারায় পদ রচনা চৈতন্য পূর্বযুগেও আমরা পাই। চৈতন্যপ্রভাবে পদাবলীসাহিত্যে জোয়ার এল। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে বৈষ্ণব মহাজনরা, ভক্তরা মানবিক প্রেমকে দেখতে পেলেন না। বৈষ্ণব মতে রাধা জীবাত্মা, কৃষ্ণ পরমাত্মা। জীবাত্মা ও পরমাত্মার লীলা হল রাধাকৃষ্ণের প্রেম। রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমান, মিলন-বিরহ সবই বৈষ্ণব কবিদের কাছে হয়ে উঠেছে তত্ত্বকথা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্রবক্তা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে সব গান বৈকুন্ঠের জন্য। চৈতন্যপূর্ব এবং চৈতন্যপরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের আদর্শগত ভিন্নতা দেখেই পদকর্তা লেখেন

'গৌরাঙ্গ নহিত কি যদি মনে হইত কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে ।।
মধুর বৃন্দা বিপিন-মাধুরী প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতি-ভাবের ভকতি শকতি হইত কার।।'

চৈতন্যপরবর্তী যুগে বৈষ্ণব মহাজনরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ মেনেই পদ রচনা করতেন। সেখানে আধ্যাত্মিক রস ভিন্ন কোনো মানবিক, লৌকিক বা সাহিত্যিক রস উৎসারিত হবার কথা ভাবেননি পদকর্তারা।

চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে পদকর্তারা শুধুমাত্র রাধা ও কৃষ্ণ দুই মানব-মানবী অথবা দুই দেবচরিত্রকে নিয়ে পদরচনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণবপদাবলীতে নতুন সংযোজন হল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ। বৈষ্ণব ভক্তদের চোখে চৈতন্যদেব হলেন অন্তরে কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে রাধা। এই মহাপ্রভুর বাল্য, কৈশোর ও ভাবোন্মত্ত জীবনের নানা দিককে নিয়ে বৈষব মহাজনরা পদ রচনা করেছেন, যেগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ নামে খ্যাত। এ ছাড়াও গৌরচন্দ্রিকা নামে আর এক শ্রেণির পদের সৃষ্টি হল। যেগুলি রাধাকৃষ বিষয়ক পদের আগে পরিপূরক হিসাবে গাওয়া হত। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যেন কিছুতেই শ্রোতারা মানব-মানবীর প্রেম বলে না মনে করে, সে কারণেই কীর্তনীয়ারা সচেতনভাবেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গাইতেন, যাকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হত। চৈতন্য-পূর্বযুগের পদাবলী গৌরাঙ্গ প্রভাবে এভাবেই বদলে গেল।

চৈতন্য-পরবর্তী যুগের পদকর্তারা বৃন্দাবনের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করতেন। সেই অনুযায়ী তাঁদের

পদরচনা। চৈতন্য-সমসাময়িক পদকর্তাদের সঙ্গে পরবর্তী পদকর্তাদের অমিলও স্পষ্ট। চৈতন্য-সমসাময়িকরা অনেকেই মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছিলেন। চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করার ফলে এঁদের কবিতায় ভক্তিভাব বেশি। গৌরাঙ্গের মানবরূপও অনেকটাই প্রকাশিত। কিন্তু এঁরা কেউ-ই বৃন্দাবনের তত্ত্বদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হননি। এই সময়ের কবিতা অনেক নিরলংকার এবং ভাষাব্যবহারও সরল, যা পরবর্তীকালে ছিল না।

বৈষ্ণব রসবাদের প্রভাবে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মধ্যে কতগুলি স্তরবিভাগ আসে। যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর মধ্যে মধুর বা কান্তাপ্রেমই শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই এ হেন স্পষ্ট স্তরবিভাগ চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে দেখা যায়নি।

৬.৭. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন:

- চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের ভাবাদর্শগত পার্থক্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।
- ষোড়শ শতকের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিদের নাম লিখুন। তাঁদের মধ্যে দুজন পদকর্তার বিশদ কবিকৃতির পরিচয় দিন।
- শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণ ও তাঁদের রচিত বৈষ্ণব কবিতার পরিচয় দিন।
- শ্রীচৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কবিতায় কি কোনো পার্থক্য লক্ষ করা গিয়েছিল? এ বিষয়ে বিশদ পরিচয় দিন।
- জ্ঞানদাসের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিন। তাঁর সঙ্গে কোন পূর্বতন কবির তুলনা করা হয় এবং কেন?
- দ্বিতীয় বিদ্যাপতি কাকে বলা হয়? তাঁর কাবত্বশক্তির বিশেষত্ব কী?
- পদাবলি সাহিত্যে গোবিন্দ দাসের স্বাতন্ত্র্য বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলার কারণ লিখুন।
- ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদের সম্পর্ক ও পার্থক্য বিচার করুন।
- বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কাব্যসৃষ্টির তারতম্য বিচার করুন।
- পদ নির্মাণে জ্ঞানদাস অন্য পদকর্তাদের থেকে ভিন্ন কোথায় আলোচনা করুন।
- টীকা রচনা করুন: বলরাম দাস, শিবানন্দ সেন।
- চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলীর বৈশিষ্ট্য কী কী ছিল?

- নরহরি সরকারের বৈষ্ণবপদাবলীর বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
- চৈতন্য-পূর্ব ও চৈতন্য-উত্তর পদাবলির পার্থক্য বিচার করুন।
- পদাবলি বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে আলোকপাত করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- পদ বলতে কী বোঝায়?
- দশম শতাব্দীর কোন গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়?
- কবি রায়শেখরের আসল নাম কী?
- 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' কাকে বলা হয়?
- বলরাম দাস কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?
- ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের নাম উল্লেখ করুন।
- কবি জ্ঞানদাসের নিবাস কোথায় ছিল?
- 'চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য' কাকে বলা হয়?
- চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এমন দুজন কবির নাম লিখুন।
- গৌরচন্দ্রিকা কী?

একক ৭ ❒ অনুবাদ সাহিত্য: রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত

৭.১. উদ্দেশ্য

৭.২. প্রস্তাবনা

৭.৩. অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ

৭.৪. রামায়ণের অনুবাদের ধারা

৭.৫. রামায়ণের বাঙালিয়ানা

৭.৬. মহাভারতের অনুবাদের ধারা

৭.৭. ভাগবতের অনুবাদের ধারা

৭.৮. অনুশীলনী

৭.১. উদ্দেশ্য

অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কিত এই এককটি পড়লে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পর্কে জানা যাবে। গ্রন্থগুলি কোন্ ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাচিত-কোন কোন রচনাকারের দ্বারা কীভাবে এগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে তা জানতে পারবেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকদের নাম ও তাঁদের রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে। অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস ও মালাধর বসু-র কবিজীবন সম্পর্কে জানা যাবে। বাংলা অনুবাদ শাখায় ওইসব লেখকদের অবদান, লেখকদের ভাবনা, তাঁদের রচনাশৈলীর মৌলিক পার্থক্য এবং কাব্যগুলির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

৭.২. প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ সাহিত্য এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে বলা যেতে পারে। দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। যদিও তা ছিল মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন ভজনের পদ। সন্ধ্যাভাষায় রচিত এই চর্যাপদের গুরুত্ব অনেক। এতদসত্ত্বেও বাঙালির আত্মিক স্বর মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছিল। তার মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি অন্যতম প্রধান দিক। প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে বা পঞ্চদশ শতকে অনুবাদ সাহিত্যের শুভ সূচনা হলেও চৈতনা পরবর্তীকালে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কবি এই অনুবাদ কাজে মনোনিবেশ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার কঠিন ঘেরাটোপ পেরিয়ে বাঙালি মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করতে শুরু করল। প্রথম দিকে বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, ভাষাশৈলী কোন কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় সংস্কৃতের অনুসরণে ও সংস্কৃত থেকে ধার করা শব্দের সাহায্য নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে হয়েছিল। ক্রমে মাতৃভাষা

সমৃদ্ধ হয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠে। বহু কবি একই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনি নির্বাচন করে নিজস্ব রচনাশৈলীতে অনুবাদ করে গেছেন। 'এ যেন পুরাতন কাব্যের কাঠামোয় নবযুগ-ভাবনার প্রাণ সঞ্চার।

মধ্যযুগে বাংলাদেশ সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলাভাষায় অনূদিত হবার ফলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই অনুবাদ-সাহিত্য বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গ্রন্থকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এগুলিকে সাধারণ বাঙালি পাঠকের কাছে আস্বাদনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়।

এই এককে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন তুর্কী আক্রমণের ফলে বিদেশি পাঠান সুলতানদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভিত গড়ে ওঠে। তাছাড়া হতমান জাতীয় জীবনে আলোচ্য ত্রয়ী অনুবাদ কাব্য বাঙালি মানস বিবর্তনে কীভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

কাব্যের অনুবাদকেরা হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। তাঁরা মূল গ্রন্থাদির বিষয়াদি সংক্ষেপে করে, কোথাও বা নতুন ঘটনা-কাহিনি সংযোজন করে তা বাঙালির হৃদয়ের সামগ্রী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এগুলো পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচার্জি ও মালাধর বসুর ভাগবত রচিত হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতের রচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক। আলোচ্য অংশে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস এবং মালাধর বসুর অবদান এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তাঁদের সৃষ্টির কথা শিক্ষার্থীর জানার জগতকে সমৃদ্ধ করবে।

৭.৩. অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ

তুর্কি আক্রমণোত্তর ধ্বস্ত বাঙালির জীবনধর্মে অনুপ্রাণিত করতে, তাদের মনোবল বাড়াতে, অদম্য সাহসিকতায় বলীয়ান করে তুলতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-এর মতো বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনির অনুবাদ একান্তই প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন সংস্কৃত, পুরাণ, ধর্মগ্রন্থ থেকে অতীত গৌরবের ঐতিহ্যময় আদর্শবোধকে বাঙালির সামনে তুলে ধরে তাকে নতুনভাবে জেগে ওঠার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে এই অনুবাদ সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে। এছাড়াও-সংস্কৃতের প্রভাব, ওজস্বিতা কেবলমাত্র উচ্চকোটি ও উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তা আপামর জনসাধারণের বোধগম্যের বাইরে ছিল। বাংলায় সহজ, সরল পাঁচালি আকারে এইসব বীরত্বব্যঞ্জক ধর্মীয় কাহিনির অনুবাদ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে আস্বাদ্য হয়ে উঠল। অনুবাদ সাহিত্য রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বেশিরভাগ অনুবাদক তাঁর কাব্য রচনার কারণ স্বরূপ বা অনুপ্রেরণা হিসেবে রাজাদেশ বা রাজানুগত্যের কথা জানিয়েছেন। কেউ কেউ রাজার নাম উল্লেখ করে প্রশংসায় পঞ্চমুখও হয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সমকালীন শাসকগণ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দু পুরাণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সম্ভবত পুরাণের রাজরাজড়াদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি, রণাঙ্গনে বীর সেনাদের যুদ্ধকৌশল তাঁদেরকে আকৃষ্ট করেছিল। পাশাপাশি এ সকল শাসকগণের উদারতা, ধর্মীয় সহনশীলতাকে সম্মান জানাতে হয়। অনুবাদকেরা

সাহিত্য রচনার থেকে ধর্মীয় কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাই ধর্মীয় গ্রন্থের নানা কাহিনির অনুবাদের প্রতি তাঁরা যত্নবান হয়েছেন। সাহিত্য সৃষ্টির তুলনায় ধর্মীয় রস সঞ্চারে তাঁরা ব্রতী ছিলেন। তাদের অনুবাদ বেশিরভাগই আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, মৌলিকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রথম পাঁচালি আকারে কাব্য লেখার সূচনা হয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এই তিনটি গ্রন্থ গুরুত্ব পেল কেন? একদিকে যেমন বীররসের যুদ্ধকথা রাজা ও অমাত্যদের উৎসাহিত করেছে। পাশাপাশি সাধারণ বাঙালি সমাজের চাহিদা বুঝে-স্মার্ত হিন্দু সম্প্রদায়, অন্ত্যজ হিন্দুদের মধ্যে ভক্তিভাব ও অবতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারের তাগিদে অনুবাদ কর্মে উৎসাহিত হয়েছিল।

৭.৪. রামায়ণের অনুবাদের ধারা

খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্যাপদের আলোয় বাংলা সাহিত্য আলোকিত। কিন্তু তার পরেই বাংলা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জগতের ওপর নেমে আসে চরম অন্ধকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দু'শো বছরের অধিককাল সাহিত্য অঙ্গনে কোনো প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত না হবার কারণ তুর্কী আক্রমণ, মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ এবং সম্ভবত ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুচর বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ আক্রমণ। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ না করেই বঙ্গদেশকে তুর্কী শাসনের কবলে তুলে দেন। শুরু হয় নিষ্ঠুর অত্যাচার, বয়ে যায় রক্তের প্লাবনধারা। যার ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তুর্কী শাসকদের দীর্ঘদিন এই দেশ শাসনের মধ্য দিয়ে ইতিবাচক একটি দিকও উদঘাটিত হয়। বিদেশে টিকে থাকতে হলে এদেশের মাটিকে ও মানুষকে ভালবাসতে হবে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতে হবে, এই বোধ ও চেতনার দূরদৃষ্টি থেকেই বিদেশী শাসকগোষ্ঠী সাধারণ মানুষের মন জয় করার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে প্রেরণা দান করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং তাঁর পুত্র নসরৎ খাঁ (১৫১৯-১৫৩২)। বাংলার এই সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আদি কবি বাল্মীকির কাহিনী অবলম্বনে যিনি সর্বপ্রথম 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সার্থক বঙ্গানুবাদ করেন তিনি হলেন 'এ বঙ্গের অলঙ্কার' কৃত্তিবাস ওঝা।

কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়- তাঁর পিতৃপুরুষেরা পূর্ববঙ্গে বাস করতেন। পরে কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা ওরাজকতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার 'ফুলিয়া' (ফুলমালঞ্চ) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কবির ভাষায়-

'গ্রামরত্ব ফুলিয়া বাখালি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বাহে গঙ্গা তরঙ্গিণী।।'

কবির পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মালিনী (মেনকা)। কবিরা ছিলেন ছয় ভাই, এক বোন। কবি তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে লিখেছেন,

'আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূণ্য (পূর্ণ) মাঘমাস।
এথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।'

;এই শ্লোকে সঠিক সাল তারিখের উল্লেখ নেই। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি শ্লোকটির অর্থ জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ব্যাখ্যা করে দেখালেন তেরশকুড়ি শকে অর্থাৎ ১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মাঘ শ্রীপঞ্চমীর দিন, রবিবার কবি ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও সময় নির্ধারণ ইতিহাস সম্মত না হওয়ায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার 'পুণ্য' শব্দটিকে 'পূর্ণ' ধরে হিসাব করে দেখালেন ১৪৩২-১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম। তবে এই তারিখও কতদূর ইতিহাস-সম্মত তা বিচার্য। কৃত্তিবাসের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় বারো বছর বয়সেই তিনি বড়গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি গৌড়েশ্বরের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে পাঁচটি শ্লোক লিখে পাঠান। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি রাজমহিমা ব্যাখ্যা করেন। এতে গৌড়েশ্বর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চন্দনজলে অভিষিক্ত করেন, মাল্যভূমিত করেন, পট্টবস্ত্র দান করেন এবং রামায়ণ রচনার ভার দেন। কিন্তু অবাক কান্ড, লেখক তাঁর গ্রন্থে গৌড়েশ্বরের নামটি কোথাও উল্লেখ করেননি। কোনো কোনো গবেষক বলেন ইনি হচ্ছেন রাজা গণেশ, কিন্তু তার শাসনকাল ১৪১৪ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ, কবির জন্ম যদি ১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে হয়, তবে রাজা গণেশের বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। এইজন্য গণেশের নামটি বাতিল হয়ে গেছে, কেউ কেউ আবার কৃত্তিবাসকে যোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এনে ফেলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের কুলপঞ্জী ও চৈতন্যমঙ্গল-বিধৃত কৃত্তিবাস সম্পর্কিত অংশ বিশেষ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং রুকনুদ্দিন বারবক শাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এবং ইনি রামায়ণ রচনার যথার্থ পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং, কৃত্তিবাসের জন্মবৃত্তান্ত এবং রামায়ণ অনুবাদের পৃষ্ঠপোষক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহু মত রয়েছে। এ ব্যাপারে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আত্মপরিচয়' শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ক্ষ্মকৃত্তিবাস মুসলমান সুলতানের সভায় হাজির হননি।ক্ষ্ম সুতরাং তিনি নূতন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত রাজা গণেশের সভাতে কৃত্তিবাসের উপস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

কাব্য পরিচিতি: পিতামাতার আশীর্বাদ আর গুরুর কল্যাণকে কার্য-সাধনার পাথেয় করে বাল্মীকি প্রসাদে কৃত্তিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন।

''সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।।''

কৃত্তিবাস সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীটিকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। সুতরাং তাঁর রামায়ণকে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না বলে বরং ভাবানুবাদ বলা চলে। তিনি অন্যান্য রামায়ণ ও সংস্কৃত কাব্য থেকে অনেক কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাঠামোটিকে বজায় রেখে কবি নিজের মত করে রামায়ণ কথা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের সাতটি কাণ্ড হলো-'আদি',

'অযোধ্যা', 'অরণ্য, 'কিষ্কিন্ধ্যা', 'সুন্দর', 'লঙ্কা' ও 'উত্তর'। বিশ্বামিত্রের কথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রভৃতি মূল রামায়ণের অনেক প্রসঙ্গ তিনি বাদ দিয়েছেন। গল্পরসের প্রতি প্রবণতা থাকায় এতে অনেক নূতন সরস উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, তরণীসেন কাহিনী, রামচন্দ্রের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ ইত্যাদি। কৃত্তিবাস যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর গ্রন্থখানি বাঙালি জনসাধারণের উপযোগী করে পাঁচালীর ঢঙে রচিত। বাল্মীকি প্রদত্ত প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডের নাম পরিবর্তন করে তিনি দিয়েছেন 'আদি' ও 'লঙ্কাকাণ্ড'। গল্পরসের প্রয়োজনে তিনি নানা কাহিনীতে যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির হাতে যে চরিত্রগুলি মহাকাব্যিক বলিষ্ঠতা লাভ করেছিল, কৃত্তিবাসের হাতে সেইসব চরিত্র যেন কোমল ফেলব বাঙালির চরিত্রের মত হয়েছে। শ্রীরামের প্রেম-করুণাঘন মূর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেজস্বিনী সীতা কবির হাতে লাজনম্রা বঙ্গবধূ, আর দশরথ যেন বাঙালি ঘরের স্ত্রৈণ বৃদ্ধ স্বামী। কৈকেয়ীর মধ্য দিয়ে অভিমানক্ষুধা মাতৃহৃদয়ের অবারিত প্রকাশ ঘটেছে। এমনকী রাবণ, বিভীষণ, সরমা প্রভৃতি চরিত্রও বাঙালির ভাবরসে পরিপুষ্ট। ভক্তিরসে ভরপুর তরণীসেন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এককথায় আদি কবির 'শুরধর্মী' কাব্য হয়ে উঠেছে 'গৃহধর্মী' কৃত্তিবাসের হাতে। বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে কাব্যখানি কোমল উজ্জ্বল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য। কারণ বাঙালির সমগ্র জীবনকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। এইজন্যই সমালোচক বলেছেন, ''কৃত্তিবাস বাঙালির জাতীয় কবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।''

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে নানা কারণ। তাঁর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান-বিভিন্ন চরিত্রে বাঙালিয়ানা স্বভাব যেমন আছে তেমনি বাঙালির ভোজনরসিকতা, আলস্যপরায়ণতা, ভোগবিলাসিতা, কলহপ্রবণতা ইত্যাদিও আছে। তবে, এসবের সঙ্গে ভক্তিপ্রেমের উদ্বেলতাও লক্ষণীয়। বাঙালির আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সব কিছুই সুন্দরভাবে রূপ পেয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর আশ্রমে রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে খেতে দিয়েছিলেন-মতিচুর, মণ্ডা, সরুচাকলী, গুড়পিঠে, তালবড়া, ছানাবড়া, খাজা, জিলিপি, পাঁপর ইত্যাদি। এইসব খাবারের সঙ্গে বাঙালির রসনা একাকার। সীতাদেবী লক্ষ্মণকে আমাদের ঘরের বধূর মতই রান্নাবান্না করে খাইয়েছেন।

উদাহরণ:

'প্রথমেতে শাক দিয়ে ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সুপআদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোলাদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।'

বাংলাদেশের সামাজিক আচার-বিচারের রূপরেখাও রয়েছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাঁচুটি', ছয়দিনে 'ষষ্ঠীপূজা', আটদিনে 'অষ্টনোই', তেরোদিনে 'জননী সৌচান্ত', ছয়মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

বাঙালি স্পর্শকাতর। করুণরস তাদের কাছে সমাদৃত। এই কাব্যে দশরথের অন্ধমুনির পুত্রবধ, সীতাহরণ ও রামচন্দ্রের বিলাপ, লক্ষ্মণের 'শক্তিশেল' ইত্যাদি বাঙালিকে গভীর বেদনার রসে আপ্লুত করেছে; সীতা নির্বাসন, তাঁর পাতালপ্রবেশ, রামচন্দ্রের সরযূর জলে দেহত্যাগ ইত্যাদি বাঙালিকে কাঁদিয়েছে। ভক্তিরসে ও উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি ভরা। তবে গার্হস্থ্য জীবনরসই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পারিবারিক জীবনের আদর্শ ও জীবনরসে ভরা গ্রন্থখানি তাই যুগাতীত হয়েছে। এইজন্যই কবি মধুসুদন দত্ত এ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন যে, কৃত্তিবাসের কাব্য বাংলার জনজীবন অমৃতরসের মত চিরকাল আস্বাদন করছেন।

কৃত্তিবাসের নামে এখন যত্রতত্র থেকে বহু রামায়ণ কাব্য প্রকাশ পাচ্ছে। কালক্রমে মূল ভাষারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণকে খুঁজে পাওয়া ভার। শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারী উইলিয়ম কেরির উদ্যোগে ১৮০২-১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ কয়েকটি খণ্ডে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যত সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে তার সবই শ্রীরামপুরী সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই সম্পাদিত। ১৮৩০-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পুরাতন ভাষাকে মেজে-ঘসে রামায়ণের এক নূতন সংস্করণ বের করেন। সকল দিক বিচার করে বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের সার্থক প্রতিভূ হিসাবে কৃত্তিবাসের নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

কৃত্তিবাস ছাড়া যাঁরা রামায়ণের অনুবাদ করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গ্রন্থাদির মূল্যায়ন করা হ'লো।

(ক) চন্দ্রাবতী: বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা কবি হিসাবে চন্দ্রাবতীর নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি ষোড়শ শতকের শেষভাগে কাব্যখানি রচনা করেন। চন্দ্রাবতী রচিত 'রামায়ণ' গানের সমষ্টি এবং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণ। আধুনিক বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতা দ্বিজবংশী দাস ছিলেন মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ গান আঞ্চলিক সীমাতেই আবদ্ধ ছিল। কাব্যটি মহিলা সমাজে খুবই জনপ্রিয়। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে এটি গাওয়া হয়।

(খ) কবিচন্দ্র চক্রবর্তী: ষোড়শ শতাব্দীর কবিচন্দ্র চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরের রাজসভার কবি ছিলেন। অনেক গবেষক 'কবিচন্দ্র'কে কবির উপাধি বলে মনে করেন। কবির রামায়ণ খুবই জনপ্রিয়। অনেকের ধারণা-কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি প্রক্ষিপ্ত কাহিনী রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়সর' ও 'তরণীসেন বধ' রচনায় কবিচন্দ্রের হাত আছে মনে করা হয়। শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত কবির আসল নাম। তাঁর রামায়ণ 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে খ্যাত।

(গ) অদ্ভুত আচার্য: অদ্ভুত আচার্য সপ্তদশ শতকের কবি। কবির আসল নাম নিত্যানন্দ আচার্য। ইনি ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রঘুবংশ থেকে অনেক কাহিনী কবি গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে কবি নিত্যানন্দ 'অদ্ভুত আচার্য' নামে পরিচিত। আধুনিক বাংলাদেশের পাবনা বিকল্পে রাজসাহী জেলায় কবির নিবাস ছিল। সমগ্র উত্তরবঙ্গে কবির রামায়ণ গানের আদর-কদর ছিল। কবির প্রকাশভঙ্গিতে সহজ কবিত্ব ও আত্মরিকতার পরিচয় আছে।

(ঘ) রামানন্দ ঘোষ

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম রামানন্দ ঘোষ বিরচিত রামায়ণের পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁকে এই পুঁথি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন কালনা-নিবাসী পশুপতি হাজরা। তাঁর আবিষ্কৃত এই পুঁথিটিও খণ্ডিত। এই পুঁথিতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনি রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ রচিত। তাঁর রামায়ণের নাম কোথাও 'নূতন রামায়ণ', আবার কোথাও 'রামলীলা'। কারো কারো মতে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পরিচয় বিশেষভাবে জানা যায় নি। কবি নিজেকে কখনো শূদ্র, কখনো দ্বিজ বলে উল্লেখ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁকে কায়স্থ এবং দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে সদ্গোপ বলেছেন। কবির মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায়, তিনি কিছুদিন পুরীধামে জগন্নাথের ভক্তরূপে বাস করেছিলেন। আবার তিনি নিজেকে বহুস্থলে বুদ্ধ অবতার বলেছেন: 'কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার'। তাঁর রামায়ণ থেকে বোঝা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম, শাক্তভক্তি ও রামোপাসনা এই তিন ধরনের ধর্মীয় মনোভাবই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর রামায়ণের স্বতন্ত্রতা হলো যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের বেশ প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ নীতি-আদর্শের পটভূমিকায় রামচন্দ্রের ভজনা করতে বলেছেন, এখানেই তাঁর রামায়ণের অভিনবত্ব।

(ঙ) জগদ্রাম

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ অনুবাদক হিসেবে জগৎগ্রাম (জগদ্রাম) বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যক্তিজীবন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার রাণীগঞ্জ-এর কাছে ভুলুই গ্রামে তার জন্ম। কবির পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহভূপের আদেশে রামায়ণের অনুবাদ করেন।তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেন নি। তিনি মূলত অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ' অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রামায়ণে অনেক বিচিত্র কাহিনির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

কবি জগদ্রাম এবং তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ দুজনে মিলে রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন। কবি তাঁর বড় ভাই জিতরামের আদেশেই এই অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হন, সেকথা তাঁর কাব্যেই পাওয়া যায়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে রামায়ণ রচনা সমাপ্ত হয়েছিল বলে রামপ্রসাদের একটি শ্লোকে পাওয়া যায়। পুত্র পিতার রামায়ণ রচনার অনেক পরে রামায়ণের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করেছিলেন। জগদ্রাম আট কাণ্ডে অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে তাঁর রামায়ণ কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রামায়ণের কাণ্ডগুলির নাম হল: আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, পুষ্কর এবং উত্তর কাণ্ড।

(চ) রঘুনন্দন গোস্বামী

রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে অন্যতম হলেন রঘুনন্দন। তিনি নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত অষ্টম পুরুষ। রঘুনন্দন কিশোরীমোহনের চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর কাব্যের নাম 'রামরসায়ন'। কবি অনেকাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছেন, আবার তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ থেকেও কোন

কোন অংশ গ্রহণ করেছে। এই রামায়ণে ভাগবতের প্রতিচ্ছায়া রয়েছে, যা তাকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে।

রামরসায়নের অধ্যায়গুলি হলো- আদ্যকাণ্ড-১২, অযোধ্যা-৮, আরণ্য-৮, কিষ্কিন্ধ্যা-১০, সুন্দরা-১২, লঙ্কাকাণ্ড-৩৬ ও উত্তরাকাণ্ড-১৮ অধ্যায়।

কবি সংস্কৃতজ্ঞ হওয়ায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বেশি ব্যবহার লক্ষ করা যায়। করুণরসের কাহিনি তাঁর কাব্যে উঠে আসে নি। সীতাবর্জন, লক্ষ্মণবর্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নি, এখানেই তাঁর রামায়ণ ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে।

৭.৫. রামায়ণের বাঙালিয়ানা

বীররসের রামায়ণ থেকে এই রামায়ণ হয়ে উঠল বাঙালি ঘরের কাব্য। কৃত্তিবাস মূলত বাল্মীকি রামায়ণের ভাবানুবাদ করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি যেমন বর্জন করেছেন তেমনি আবার নিজস্ব মৌলিকতায় অনেক নতুন কাহিনির সংযোজনও ঘটিয়েছেন। তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়-দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, গণেশের জন্ম, কৈকেয়ীর বর লাভ, গুহকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বীরবাহুর যুদ্ধ, দেবীর অকালবোধন ইত্যাদি অংশে। আবার বাল্মীকি রামায়ণের কার্তিকের জন্ম, বিশ্বামিত্রের কথা প্রভৃতি কাহিনি তিনি পরিত্যাগ করেছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও অন্যান্য পুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে নিজস্ব শৈলীতে তা নতুনভাবে বর্ণনা করেছেন। অনেকেই মনে করেন কৃত্তিবাস অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ গ্রন্থকে অনুসরণ করে তাঁর অনুবাদ কাব্য 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। তবে এ অনুমানের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কৃত্তিবাসের এই কাব্যে ধর্মীয়চেতনা ও ভক্তিরস এতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে যে সেখানে রামায়ণের বীরত্বের কাহিনি, শক্তির ক্ষমতা, রাজকীয় আতিশয্য, আড়ম্বর ম্লান হয়ে পড়েছে। কৃত্তিবাস সমকালীন বাঙালি জীবন, সমাজচেতনা বাস্তবতাকে এ কাব্যে রূপদান করছেন। তাই রামায়ণের বীরযোদ্ধারা এ কাব্যে বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের সন্তান হয়ে উঠেছে। এই কাব্যের মধ্যে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের অসাধারণ বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। চরিত্র অঙ্কনে তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামের বীরত্বমহিমা, ঐশ্বর্য, রণকৌশল-নীতি, অসম্ভব শক্তিতে ভরপুর এক যোদ্ধার স্বরূপের পরিবর্তে তাঁর উদার, সহনশীল মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ফলে রাম যেন গ্রাম বাংলার মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা মানবে রূপান্তরিত হয়েছেন। মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ভাষা, যুদ্ধের দামামা, প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজ-রাজড়াদের রণাঙ্গনে যুদ্ধ মত্ততা রামায়ণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও কৃত্তিবাসের হাতে অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়েছে। কিন্তু তাঁর লেখনী স্পর্শে এ কাব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং খুব সহজে পাঠক চিত্তকে জয় করেছে। 'মহাভারত হয়েছে বাঙালির সম্ভ্রমের বস্তু আর রামায়ণ তার মনের সামগ্রী'।

৭.৬. মহাভারতের অনুবাদের ধারা

আঠারো পর্বে রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ হলো মূল সংস্কৃত মহাভারত। বেদব্যাসের এই গ্রন্থ প্রাক্‌চৈতন্য

যুগে বা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর কয়েকজন কবি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য স্মরণ করে এবং এদেশের শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তবে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কাছে অন্যান্য অনুবাদকদের সৃষ্টি অনেকটাই ম্লান। কাশীরাম দাসের পূর্বে কোনো কবিই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম হননি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁরা মহাভারতের অনুবাদ করেন তাঁরা হলেন-(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও (খ) শ্রীকর নন্দী। এই দুই কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হলো-

(ক) কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা বলে গণ্য করা হয়।বাংলার সুলতান হুসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম জয় করে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দু গ্রন্থাদির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে তিনি সভাকবিরূপে নিযুক্ত করে মহাভারতের অনুবাদ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। পরমেশ্বর অনুবাদ সংক্ষিপ্ত। কাব্যগুণে সমৃদ্ধ না হলেও পরমেশ্বর কাব্য সহজ-সরল ভাষায় লিখিত। তাঁর রচিত মহাভারতের নাম 'পাণ্ডব বিজয়' বা 'মহাভারত পাঞ্চালিকা'। 'কবীন্দ্র' কবির উপাধি। মূল তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে তিনি মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শুধু কাহিনীকে অনুসরণ করেছেন। গবেষকদের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বরই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক বলে চিহ্নিত।

(খ) শ্রীকর নন্দী; কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সমসাময়িক বা অল্প কিছুকাল পরে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 'অশ্বমেধ' পর্বটি রচনা করেন। পাণ্ডবদের যাগ-যজ্ঞাদি, যুদ্ধ মহিমা ইত্যাদি ছুটি খাঁ পছন্দ করতেন।

শ্রীকর নন্দী 'জৈমিনি মহাভারত'-এর 'অশ্বমেধ পর্ব' অবলম্বনে সংক্ষেপে মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' অনুবাদ করেন। এখানে কবি লিখেছেন-

শুনিব ভারত পোথা অতি পুণ্য কথা।
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়।।

লঘুকৌতুক হাস্য-পরিহাসের উচ্ছল-উজ্জ্বলতায় কাব্যখানি ভরা। কবির রচনাশৈলীও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের চেয়ে অনেকটা ভাল।

(গ) সঞ্জয়-সাম্প্রতিককালে কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কারের ফলে সঞ্জয় নামে একজন মহাভারত অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে 'সঞ্জয়' নামে পৃথক কোনো কবির অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে পরমেশ্বরের কাব্যই সঞ্জয়ের মহাভারত। উভয় গ্রন্থের নিকট সাদৃশ্যের জন্যই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কবি ভনিতায় নিজের নাম উল্লেখ না করে মহাভারতের সঞ্জয়ের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। পরমেশ্বরের গ্রন্থের অনেকটা অংশই সঞ্জয়ের রচনায় পাওয়া যায়। মাঝে-মধ্যে তাঁর নিজের লেখার চিহ্ন ছিটেফোঁটা আছে। রচনাশৈলীও উন্নতমানের নয়।

সঞ্জয় লিখিত মহাভারতের পুঁথি পাঠ করে গবেষকগণ মনে করেন-কবি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। সঞ্জয় সম্পর্কে এতদিনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক মুনীন্দ্র কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সঞ্জয়ের মহাভারত প্রকাশিত হবার পর। বর্তমানে সঞ্জয় পৃথক রূপেই স্বীকৃত।

কাশীরাম দাস: কৃত্তিবাসের মত বাঙালির জীবন-জিজ্ঞাসায় যিনি নিত্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি হলেন, মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক- কাশীরাম দাস।

পরিচিতি: বর্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী পরগনার ব্রাহ্মণী নদী তীরে সিঙ্গি (সিদ্ধি) গ্রামে কায়স্থ বংশে কবির জন্ম। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও এই শতকের শেষের দিকে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। বংশটি বৈষ্ণব ভাবাপ্লুত। কাব্যখানি সমাপ্ত হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে।-

'চন্দ্রবাণ পক্ষঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়।।'

-এই দুটি চরণ থেকেই যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিমশায় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিরাট পর্বটি শেষ হয়েছে ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। তবে, কিংবদন্তী আছে যে, আদি, সভা, বন ও বিরাটের কিছুটা অংশ রচনার পর কাশীরাম দাসের স্বর্গলাভ ঘটে। বাকি অংশটা কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দরাম সম্পন্ন করেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, শান্তি পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব যথাক্রমে কৃষ্ণানন্দ বসু ও জয়ন্ত দাসের রচিত। তবে একথা ঠিক যে পূর্বের পর্বগুলির সঙ্গে শেষের পর্বগুলির তুলনাত্মক বিচার করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে-ভিন্ন হাতের ছোঁয়া আছে। কবির ভাষায় সাবলীলতা শেষাংশে নেই। কিংবা কাশীরামের বৈষ্ণবসুলভ বিনয়ী ভঙ্গিমাও অনুপস্থিত।

মধুসূদন দত্ত কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সনেটে লিখেছেন-
অমহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।দ

—কবির কাশীরামের প্রতি এই অর্ঘ্য যথার্থ। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত কাশীরাম দাসের ভারত পাঁচালিও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে যুগে যুগে নন্দিত-বন্দিত।

কাব্য পরিচিতি: কাশীরাম বংশানুক্রমিকভাবে বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্য ঐতিহ্যই ছিল তাঁদের বৈষ্ণব চেতনার উৎসমূলে। চৈতন্য ঐতিহ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাশীরাম তাঁর কাব্য উপহার দেন-যার ফলে মহাভারতের উদাত্ত বীর্যগাথা কোমল-স্নিগ্ধ প্রেমকথায় রূপান্তরিত হয়েছিল। মহাভারতের কৃষ্ণধনঞ্জয় বীরত্বের আসন ছেড়ে বাংলার পেলব-কোমল মূর্তি ধারণ করেছে কাশীরামের হাতে। বাঙালি জীবনের ঐতিহ্য তুলে ধরাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কবি ব্যাসদেবকে হুবহু অনুসরণ করেননি। পর্বগুলির নামকরণের ক্ষেত্রেও অনেক হেরফের ঘটিয়েছেন। মূলের অনুশাসন পর্ব ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব কাশীরামে নেই। আবার দু-একটি পর্বের নামেরও পরিবর্তন করেছেন। মহাকবির কল্পনা, ঐশ্বর্য ও রস-গভীরতা কবির তেমন না থাকলেও পাণ্ডিত্য এবং লোকোত্তর কবিত্বগুণে ভারতকথাকে তিনি সর্বজনের আস্বাদন যোগ্য করে

তুলেছেন। মূলের কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন যেমন করেছেন তেমনি নূতন কাহিনী ও কল্পনার সংযোজন করেছেন। শ্রীবৎস্যচিন্তা, সুভদ্রাহরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে কাব্যখানি সুখপাঠ্য হয়েছে। তৎসম শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও পয়ার এবং একাধিক ধরনের ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি সংগ্রথিত হওয়ায় কাব্যপাঠের ক্ষেত্রেও নূতন সুর, তাল, লয় এসেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও কবির পাণ্ডিত্য ছিল। এজন্য সমালোচক বলেছেন, তকবির অলঙ্কার নির্বাচন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত এবং রূপানুভূতির উল্লাস স্পন্দনে মূর্ত।ত করুণ রস সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রিয়পুত্র অভিমন্যু বধের পর অর্জুনের মর্মভেদী আর্তি কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছুটা অংশ উদ্ধৃত হল:

'কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়।'

কয়েকটি রেখায় এমন অব্যর্থ করুণ রসের সৃষ্টি সত্যিই দুর্লভ। বীর ও হাস্যরসের মিশ্রণে কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তদণ্ড হাতে যম আর বজ্র হাতে ইন্দ্রদ সমভয়ংকর ভীম-অর্জুন যে দিকে চাইছেন ঠিক সে মুহূর্তেই বিপক্ষ দলের তহেলায় সকল সৈন্য তুলা যেন ধায়দ-দৃশ্যটি করুণ ও হাস্যবহ। তবে কৃত্তিবাস যুদ্ধ বর্ণনায় গাছপালা ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি করে যে কৃত্রিম আবহ-পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন সেখানে কাশীরাম দাস অনেকটাই রণোন্মাদনার সাহসিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অনুবাদে কবির হাতে প্রায় সর্বত্রই ব্যাসদেবের শুরধর্মী চরিত্রগুলি শূরত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর পেছনের ধ্যানধারণা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। জাতীয় জীবনের মর্মকথা এই কাব্যে ধ্বনিত। তাই এই কাব্য কবি যেমন একা রচনা করেননি, তেমনি সমাজমানসও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্যই বাংলার ঘরে ঘরে কাব্যখানি এত সমাদৃত।

কাশীরাম দাসের কাব্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা হয়ত পরবর্তী কবিগণকে এ ধারায় কাব্যরচনায় বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই পরবর্তী সময়ে মহাভারতের অনুবাদক কবির সংখ্যা কম ছিল না। অনেকেই সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন, কেউ কেউ খণ্ড খণ্ড পর্বের অনুবাদ করেন। সতের-আঠার শতকের কবি হিসেবে দ্বৈপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সরলাদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কাশীরাম দাসের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা আছে তাঁদের মধ্যে দ্বৈপায়ন দাস অন্যতম। তাঁর ভণিতায় মহাভারতের বনপর্ব, গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে। কবি নিত্যানন্দ দাস সতের শতকের শেষভাবে 'মহাভারত' রচনা করেন। তাঁর কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। কবি শঙ্কর চক্রবর্তী ভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন। রাঢ়দেশের অধিবাসী সরলাদাস মহাভারতের 'আদি' ও 'বিরাট পর্ব' রচনা করেছিলেন।

মহাভারত রচনায় এই ধারার শেষ পর্যায়ে কাব্যের বর্ণনা নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক হয়ে পড়ে, ফলে কাব্যের আকর্ষণীয়তা কমে যায়। কোথাও কোথাও পুরাণকথা থেকে ধার করা গল্পের জৌলুস এনে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু কাশীরাম দাস তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার সাহায্যে মহাভারতের যে অমর রূপ দান করেছিলেন তার সর্বগ্রাসী আলোকে অপরাপর প্রচেষ্টার ফল ম্লান হয়ে গেছে।

আসলে এই পর্বের রচনাগুলি অধিকাংশই গতানুগতিক রচনা। তখন বাঙালি সমাজে সজীবতা ছিল না, চৈতন্য ভাবাদর্শও সমাজে ক্ষীয়মান । তাছাড়া কবিরাও প্রতিভাশালী ছিলেন না তেমন। তাই মহাভারতের অনুবাদ এই যুগে গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অনুবাদগুলির সবগুলিই প্রায় অসম্পূর্ণ ও গুণমানেও অপকৃষ্ট। তাই এইপর্বের কবিদের আমরা কেবল নামোল্লেখ করছি-

(ক) গঙ্গাধর/গঙ্গাদাস সেন: মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা।

(খ) দ্বিজ গোবর্ধন: গদা পর্বের রচয়িতা।

(গ) দ্বৈপায়ন দাস: অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা।

(ঘ) নন্দরাম: দ্রোণ পর্বাদি রচনা করেন।

(ঙ) কৃষ্ণানন্দ বসু: শান্তি পর্বের রচয়িতা।

(চ) দ্বিজ কৃষ্ণরাম: অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা।

(ছ) অনন্ত মিশ্র: ইনিও অশ্বমেধ পর্ব রচয়িতা।

(জ) রামলোচন: নারী পর্ব রচনা করেন।

(ঝ) রাজেন্দ্র দাস: আদি পর্ব রচয়িতা।

(ঞ) রাজারাম দত্ত: দণ্ডী পর্ব রচয়িতা।

(ট) শঙ্কর কবিচন্দ্র: সমগ্র মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করেন।

এই শেষোক্ত কবিই একমাত্র স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন। মল্লরাজ গোপাল সিংহের আদেশে পানুয়া গ্রামনিবাসী এই কবি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেন আনুমানিক ১৭৩৮-৪০ খ্রীস্টাব্দে। মহারাজ গোপালচন্দ্রের আদেশে বৈয়াসকী মহাভারতের সারানুবাদরূপে তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য অন্যান্য কবিদের মতো মাঝে মাঝে তিনি নতুন আখ্যান গ্রহণ ও নীতি-উপদেশাদি নীরস ঘটনা-বর্জনের চিরাচরিত আদর্শটিকে উপেক্ষা করেননি। কবিচন্দ্র লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কল্পিত বা লোক-প্রচলিত আখ্যানকে তাঁর কাব্যে যুক্ত করেছেন। এইগুলি ‘পালা’ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই জনপ্রিয় পালাগুলি কাশীরামের কাব্যের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে গেছে। কবিচন্দ্র মুখ্যত: পাণ্ডব-কৌরব কাহিনীটিকে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। সেইজন্য মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বহু উপাখ্যান তাঁকে বর্জন করতে হয়েছে। তাঁর মহাভারতের অধ্যায় সংখ্যা কুড়ি। এগুলি হল যথাক্রমে- (১) আদি পর্ব, (২) সভা পর্ব, (৩) বন পর্ব, (৪) বিরাট পর্ব, (৫) উদযোগ পর্ব, (৬) ভীষ্ম পর্ব, (৭) দ্রোণ পর্ব, (৮) শল্য পর্ব, (৯) সৌপ্তিক পর্ব, (১০) দ্রোণী পর্ব, (১১) ঐষিক পর্ব, (১২) শান্তি পর্ব, (১৩) ভীষ্মযোগ, (১৪) অনুশাসন পর্ব, (১৫) অশ্বমেধ পর্ব, (১৬) আশ্রমবাসিক পর্ব, (১৭) মৌষল পর্ব, (১৮) মহাপ্রস্তন পর্ব, (১৯), স্বর্গারোহণ পর্ব, (২০) ভারত সাবিত্রী ইত্যাদি।

৭.৭. ভাগবতের অনুবাদের ধারা

রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ-ধারা বাঙালি জীবনে যে প্লাবন এনেছিল, সে তুলনায় ভাগবতের অনুবাদ ধারাটি অনেকাংশেই ম্লান। ভাগবতের অনুবাদকর্মের প্রথম পর্যায়টি বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেও, চৈতন্য প্রভাবে পরবর্তী যুগের অনুবাদে নূতন নূতন কাহিনীর সংযোজন অনুবাদের ধারা ক্ষুণ্ণ হয়ে কাব্যটি 'কাহিনীকাব্য' ধর্মী হয়ে ওঠে।

রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের কাহিনী বাংলাদেশে অতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এর মূল কারণ- রামায়ণ-মহাভারতের সর্বজনীন আবেদন ভাগবতের সেটি ছিল না। ভাগবতে নীরস যুদ্ধ-ঘটনার বাড়াবাড়ি। তাছাড়া চৈতন্য ভক্তদের কাছে ভাগবতধর্ম অনুসরণযোগ্য না হওয়ায় ভাগবতের অনুবাদধারা মরুপথে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ভাগবতের অনুবাদকর্মের শ্রেষ্ঠ রূপকার মালাধর বসু। তাঁর জীবন পরিচিতি ও কাব্যধারার বিস্তৃত বিবরণ নীচে আপনারা পাবেন।

মালাধর বসু: আদি কাব্যগুলির বাংলা কাব্যে অনুবাদের যে প্লাবন আসে সেই পথ ধরেই মালাধর বসুর আবির্ভাব। তাঁর অনুদিত গ্রন্থখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জীবনকথা, যা ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-এ সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন, তা 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী মালাধর বসু জনজীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ কর্মের মূলগত উদ্দেশ্য ও প্রেরণা সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন,'

'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে গাই পাঁচালি রচিয়া।।

অথবা,

তভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।।'

লোকজীবনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে লোকবোধনের এই আকাঙ্ক্ষা কৃত্তিবাসের মত মালাধর বসুও স্পষ্ট ভাষায় যেমন ব্যক্ত করেছেন তেমনি প্রয়োগেও তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই কাব্য অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলার লোকচেতনা হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ভাবনার সঙ্গে সংযোগ সাধনের ব্যাপক সুযোগ পেয়েছিল। এছাড়া বৃহত্তর ভারতের বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনার মূলেও এই অনুবাদগ্রন্থের প্রভাব অপরিসীম। এইজন্যই চৈতন্যদেব স্বয়ং মালাধর বসুর কাব্যখানিকে সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

কবির ব্যক্তি পরিচিতি: বর্ধমান জেলার বিখ্যাত কুলীন গ্রামের বসু পরিবারে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে (সম্ভবত ১৪২০-২৫ খ্রিঃ) কবি আবির্ভূত হন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবির পুত্র ও পৌত্র নবদ্বীপ লীলার অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি: মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে রচনার কালজ্ঞাপক একটি পয়ার পাওয়া যায়,

'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরাম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।'

-এই পয়ারটি প্রমাণ হলে এই গ্রন্থকেই বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করা যায়। ড. সুকুমার সেন গ্রন্থ রচনার কালকে প্রামাণিক বলে উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ সাত বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে এই বর্ষীয়ান কবি অনুবাদ-কর্মটি সমাপ্ত করেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হতে তখনও ছয় বছর বাকি। এই গ্রন্থ আরম্ভের সময় গৌড়েশ্বর ছিলেন রুনুদ্দিন বারবক্ শাহ। গ্রন্থখানি সমাপ্ত হয় তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহের সময়। বিদ্যোৎসাহী রুকনুদ্দিনই মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দেন। বেশ বিনয়ের সঙ্গে সেকথা কবি কাব্যে উল্লেখ করেছেন,

'গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।'

কাব্যের নামকরণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিজয়' শব্দটির দুটি আভিধানিক অর্থ আছে। (১) জয়লাভ, (২) মহাপ্রয়ান। সমগ্র কাব্য জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক লীলাকথা এবং কাব্যশেষে তাঁর মানবলীলা সংবরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের শীর্ষনামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর গভীর সাদৃশ্য থাকায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামটি সুসংগত হয়েছে।

ব্যাসদেব ১২টি স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য তুলে ধরেছিলেন, নানা তত্ত্বকে জুড়ে দিয়ে। কিন্তু মালাধর বসু সমগ্র সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ না করে দশম ও একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের অংশবিশেষ সংক্ষেপে সরল ভাষায় অনুবাদ করেন। আদ্য, মধ্য, অন্ত-এই তিনটি খণ্ডে যথাক্রমে বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালির ঢঙে লিখিত এই কাব্যগ্রন্থ, তাই গ্রন্থখানিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, আদিকবি ব্যাসদেবের মত কোনও তত্ত্বকথার উল্লেখ এ গ্রন্থে নেই। আবার দানলীলা, নৌকাবিলাস, রাসরঙ্গ প্রভৃতি ভাগবত বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি কাব্যখানিকে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করেছেন। তাই সামগ্রিক বিচারে আমরা কাব্যখানিকে শ্রীমদ্ভাগবত-এর আক্ষরিক অনুবাদ বলতে পারি না, বরং বলতে পারি ভাবানুবাদের পথ ধরে কবি যেন এক নবসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবি এই অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ভাগবত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন মাত্র। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই প্রাধান্য পেয়েছে। তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত জাতীয় জীবন হয়েছিল পলায়নমুখী। সেই হতোদ্যম জাতীয় জীবনকে সংগ্রামী আলোয় আলোকিত করতেই, মরা গাঙে জোয়ার আনতেই, কবির এই প্রচেষ্টা। আগাগোড়া গ্রন্থের গল্পাংশ ও উপস্থাপনা লক্ষ্য করে মনে হয়-ভয়ার্ত মুমূর্ষু জাতির সব জড়তা লক্ষ্য করেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় শক্তিকে তুলে ধরে কবি জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন। প্রয়োজনবোধে তিনি 'উপমা', 'উৎপ্রেক্ষা', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

'রঙ্গন পূর্ণিমা শশী জিনিয়া বদন'।

রুক্মিণীর রূপ বর্ণনায় এই ব্যতিরেক অলঙ্কারটি নিঃসন্দেহে যথার্থ সমাজ পরিবেশ থেকে কবি সংগ্রহ করতে কার্পণ্য করেননি।

'কদলির গাছ যেন পড়ে অল্প ঝড়ে।দ কিংবা,

ত্লাঙ্গলের ইস যেন দন্ত সারি সারি।'

;শেষের উপমাটিতে পুতনা রাক্ষসীর দন্ত পঙ্ক্তির তীক্ষ্ণতার সঙ্গে কৃষিপ্রধান দেশের অতি পরিচিত লাঙলের তীক্ষ্ণ ফলার তুলনা করেছেন। বাৎসল্য রসের প্রকাশে কবি সিদ্ধহস্ত।

'তবে আমি যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি।

কাঁদিতে কাঁদিতে বলে শুনহ শ্রীহরি।।'

;এখানে স্নেহার্তিমাখা মাতৃমূর্তিটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। এর পাশাপাশি মাতা-পুত্রের স্নেহ-ভালবাসার অতলান্ত রূপটিও স্নিগ্ধোজ্জ্বল ভাষায় কবি তুলে ধরেছেন। করুণরসের সৃষ্টিতেও কবির মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

'আর না যাইব সখি কল্পতরুমূলে।

আর কানু সঙ্গে সখি না গাঁথিব ফুলে।।'

কৃষ্ণ ফেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।

কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ।।

অথবা, কানু হেন ধন সখী ছেড়ে দিব কারে।। ;প্রভৃতি পঙক্তি

;প্রত্যাসন্ন কৃষ্ণবিরহের ব্যথায় শ্রীরাধিকা ও সখীদের মর্মভেদী বেদনার এ যেন সার্থক বাণীচিত্র। কৃত্তিবাসের কাব্যের মত এ কাব্যেও বাঙালি পরিবেশ ও পটভূমিকা রয়েছে। বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত। এই কাব্যে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে মনের আনন্দে ভাতই খেয়েছে। মা গোপালকে ডেকে বলেন, ত্ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাস্থল আসিও।দ

—চিত্রটি বাংলার মাতা-পুত্রের সজীব সম্পর্কযুক্ত। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি পরিবেশ আম-কাঁঠাল, সুপারির ছায়ায় স্নিগ্ধ। এই কাব্যে ত্নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথদ এই বাক্যটি আছে। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলে সম্বোধন মালাধার বসুই প্রথম করেছেন। এর মধ্যেই শ্রীচৈতন্যদেব আপন অন্তরের বাণীকে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির বীজ যেন এই গ্রন্থেই লুকিয়ে ছিল। তাই তিনি এই কাব্যকে প্রিয়জ্ঞান করেছেন এবং কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বলেছেন,

'তোমার কা কথা-তোমার গ্রামের কুকুর।

সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর।।'

স্বয়ং মহাপ্রভুর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মালাধর বসুকে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় করে রাখবে। মালাধরের কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যযুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। এইজন্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মালাধর বসু যুগস্রষ্টা না হলেও যুগসন্ধির সংযোগকারী মহাকবি।

চৈতন্য পরবর্তী ভাগবতের অনুবাদকদের জন্য রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস আধা-পরিচিত। এই পর্বে ভাগবতের অনুবাদের চেয়ে কৃষ্ণ প্রণয়লীলাই প্রাধান্য পায়। কিন্তু আলোচ্য কবিদ্বয় ভাগবতের যে অনুবাদ করেছেন, সেখানে, লৌকিক প্রণয়লীলাগুলিকে বর্জন করেই অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এজন্য ভাগবতের অনুবাদক হিসাবে রঘুনাথ ও কৃষ্ণদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে করা হ'লো।

রঘুনাথ: যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনাথ তাঁর ভাগবত অনুবাদ সমাপ্ত করেন। লেখকের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'। তিনি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য লাভ করেন। উভয়ের মধ্যে নিবিড় যোগ ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কবিকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেন। মূল ভাগবতের সব স্কন্ধই রঘুনাথ অনুবাদ করেন। তবে দশম-একাদশ স্কন্ধে কবি মূলকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। ভাগবতের অনুবাদধারার মূল স্থাপয়িতা মালাধর বসুকে রঘুনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থে গোপলীলা অংশগুলি পল্লবিত নয়;অনেকটা সংযত, সংহত।

রঘুনাথের সংস্কৃতে অগাধ জ্ঞান ছিল। তথ্যনিষ্ঠা ও ভাবসংযমের জন্য তাঁর সৃষ্টি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। ভাগবতের জটিল তত্ত্বকে কবি কাহিনীর পাশাপাশি সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো কোনো স্থানে তাঁর রচনায় বৈষ্ণব পদাবলির লালিত্য ও মাধুর্যও প্রকাশ পেয়েছে। রঘুনাথের লেখায় ভাগবতের পৌরাণিক ঐতিহ্যটি বিশুদ্ধ অনুবাদ-পর্বের পরিচয় বহন করে। চৈতন্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও অনুবাদে চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তিবাদের প্রভাব পড়েনি।

মাধবাচার্য: চৈতন্যভক্ত মাধবাচার্যই 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামক ভাগবতের অনুবাদক। মাধবাচার্য ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অন্য স্কন্ধ ও অন্যান্য জায়গা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য রচনা করেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণচরিত বিষয়ক এই কাব্য যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং 'প্রেমবিলাসে' মাধবাচার্যের উল্লেখ আছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। তবে অন্যান্য স্বন্ধ থেকেও তিনি পালা সংগ্রহ করেছিলেন। মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' একাধিকবার 'শ্রীমদ্ভাগবতসার' নামে মুদ্রিত হয়েছে। কাহিনি বয়নে কবি ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। ঘটনা ও কাহিনির বিবরণ বেশ সহজ, সরল। কোন কোন ক্ষেত্রে বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রভাবও স্পষ্ট। বিশেষ করে কৃষ্ণের লৌকিক লীলার বর্ণনায়। রাসলীলার বর্ণনাতেও রাধাকৃষ্ণলীলার স্কুল বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

কৃষ্ণদাস: কবি কৃষ্ণদাস ছিলেন মহাভারতের অগ্রণী অনুবাদক কাশীদাসের বড় ভাই। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'। গবেষকদের মতে গ্রন্থখানি যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। এই অনুবাদ গ্রন্থে দানলীলা, নৌকালীলা বাদ পড়েছে। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ভাগবতের বাইরের নানা প্রসঙ্গ কৃষ্ণদাসের অনুবাদ গ্রন্থে স্থান পেলেও ভাগবতের অনুবাদধারায় কৃষ্ণদাসের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

বলরামদাস: বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত' অনেকাংশেই মূলানুযায়ী হয়েছে। তবে তাঁর লেখায় ভাগবতের সঙ্গে 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে'র কিছুটা অনুসরণ ঘটেছে। এ ছাড়া নন্দরাম ঘোষ, লক্ষ্মীনাথ, ভক্তরাম দাসও খণ্ড খণ্ড পালা রচনা করেছেন। ভাগবত আশ্রয়ী এই লেখাগুলি 'ব্রজলীলা কাহিনী'র পথ ধরেই লিখিত।

এছাড়াও, দুঃখী শ্যামদাস মূলত ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে 'গোবিন্দমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশানচন্দ্র বসু 'গোবিন্দমঙ্গল' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু শ্যামদাসকে কাশীরামের সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড

পরগণার হরিপুর গ্রামে। তাঁর অনুবাদ মূলত দশম স্কন্ধ কেন্দ্রিক হলেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ থেকেও তিনি কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এই কাব্যের একমাত্র গুণ পরিচ্ছন্ন ঘটনা। এই কাব্যেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে দানখণ্ডের কাহিনিতে ও বর্ণনায় শ্যামদাস বড়ুর কাছে ঋণী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো এই কাব্যে রাধাকেই চন্দ্রাবলী বলা হয়েছে। এই কাব্যের ভাষাভঙ্গিমা সহজ ও সংযত, বর্ণনাও পরিচ্ছন্ন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের অনুসরণে ও অনুবাদের রীতিতে রচিত কাব্যগুলি উৎকৃষ্ট না হলেও সংখ্যায় নগণ্য নয়। এইসব অনুবাদকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই একটি স্কন্ধের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন, নিজের মতো আখ্যানকে সাজিয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তত্ত্বকথাকে বাদ দিয়ে নিজেদের মতো কাহিনিকে সাজিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণ, উপপুরাণ থেকেও কাহিনি সংগ্রহ করেছেন। আবার লৌকিক কাহিনিকেও অনেকক্ষেত্রে সংযুক্ত করেছেন। এঁরা হলেন-সনাতন বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত (দাস), দুর্লভনন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীর মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বেশ কিছু ভাগবত অনুবাদকের বা ভাগবত অনুসারী অনুবাদকের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ রচনা একাধিক পাওয়া গেছে। এই অনুবাদগুলি গতানুগতিক, তবে কিছু অনুবাদকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে-শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'গোবিন্দমঙ্গল' বা 'ভাগবতামৃত', দ্বিজ মাধবেন্দ্রর 'ভাগবতসার', দ্বিজ রমানাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা মূল ভাগবতের কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে রচনা করেছেন। কিছু কিছু ভাগবত বহির্ভূত কাহিনিও সংযোজিত করেছেন। এমনকি নিজের মতো করে কিছু কাহিনিও উপস্থাপন করেছেন।

৭.৮. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন:

- মধ্যযুগের গতানুগতিক সাহিত্যধারায় অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ ও গুরুত্ব বিচার করুন।
- রামায়ণ অনুবাদে কৃত্তিবাস ওঝার কৃতিত্ব বিচার করুন।
- কৃত্তিবাস ওঝা অনূদিত রামায়ণের বাঙালিয়ানার পরিচয় দিন।
- মহাভারতের অনুবাদে কাশীরাম দাসের শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা করুন।
- ভাগবতের অনুবাদে মালাধর বসুর কৃতিত্ব বিচার করুন।
- অনুবাদ শাখার তিনটি ধারার মধ্যে রামায়ণ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
- কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদে সমকালীন বাঙালি জনমানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।
- প্রথম পর্বের মহাভারত অনুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- কৃত্তিবাস ওঝার জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করুন।

- কৃত্তিবাসী রামায়ণে গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন সম্পর্কে লিখুন।
- পরাগলী মহাভারত সম্পর্কে টীকা লিখুন।
- মহাভারত অনুবাদে পরাগল খাঁ ও ছুটি খানের ভূমিকা নির্ণয় করুন।
- মালাধর বসুর কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- মালাধর বসুর কাব্যে বাঙালিয়ানা কতটা প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করুন।
- টীকা রচনা করুন: কাশীদাসী মহাভারত
- শ্রীকর নন্দীর মহাভারত সম্পর্কে টীকা রচনা করুন।
- পরাগলী মহাভারত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- ছুটি খানের প্রকৃত নাম কী?
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর কোন্ রাজার সভাকবি ছিলেন?
- কাশীরাম দাস মহাভারতের কটি পর্বের অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন?
- 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের গ্রন্থরচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি লিখুন।
- মালাধর বসুর উপাধি কী ছিল?
- শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্ কোন্ স্কন্ধের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য?
- কৃত্তিবাসের জন্মস্থান কোথায়?
- শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্যান্য নামগুলি কী কী?
- কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার রাজসভায় আবির্ভূত হন?
- শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কোন পর্বটিকে আশ্রয় করেছিলেন?

একক ৮ ❐ চৈতন্যচরিত সাহিত্য: চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল

৮.১. উদ্দেশ্য

৮.২. প্রস্তাবনা

৮.৩. চৈতন্যদেবের জীবনকথা

৮.৪. বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব

৮.৫. চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ: গুরুত্ব বিচার

৮.৬. সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনী

৮.৭. বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

৮.৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

৮.৯. চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত-এর তুলনামূলক আলোচনা

৮.১০. লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

৮.১১. অনুশীলনী

৮.১২. গ্রন্থপঞ্জি

৮.১. উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চরিতকাব্যগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একদিকে জীবনীমূল্য, অন্যদিকে কাব্যমূল্য। এগুলি নিছক হ্নদ্রস্তুখদ্যাত নয়, ছস্থুব্রস্তুখদ্যাত্ত অর্থাৎ সন্ত জীবনী শ্রেণীর। এগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ, সমাজ-ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদানে এগুলি পরিপূর্ণ। তাই এককটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই এককটি পাঠ করলে-

ক. চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালের সমাজের অবস্থা, যুগাবতার হিসাবে চৈতন্যদেবকে গ্রহণ করার অনিবার্যতা সম্পর্কেও জানা যাবে।

খ. শ্রীচৈতন্যের অসমান্য জীবনকথা, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে সমাজে তাঁর প্রভাবের পরিচয়ও পাওয়া যাবে।

গ. বাংলা সাহিত্যের এক নতুন শাখা জীবনচরিত-সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

সর্বোপরি, চরিত-সাহিত্যের কবিদের সম্পর্কে জানানো এই এককের মুল উদ্দেশ্য।

৮.২. প্রস্তাবনা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি অসামান্য ঘটনা। মধ্যযুগের কবি বলেছেন,

'যদি গৌর নহিত কিমেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।'

আধুনিক যুগের কবি বলেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।'

অর্থহীন, সংস্কারে আবদ্ধ বাঙালি-জীবন চৈতন্য-আবির্ভাবের ফলে বাঁচবার নতুন প্রেরণা পেল এবং এই প্লাবন শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ রইল না, উড়িষ্যা, উত্তর ভারত, আসামকেও আন্দোলিত করল। এ ব্যাপারটিকে অনেকেই চৈতন্য-রেনেশাঁস বলে অভিহিত করতে চান। যে অলৌকিক জীবন মানবদেহে অতিমানবতার প্রকাশ ঘটিয়েছে তার জীবন ও চারিত্র্য সম্পর্কে একটি ন্যূনতম ধারণা না থাকলে শুধু সংক্ষিপ্ত জীবনীসাহিত্য পাঠে তা আংশিক হতে বাধ্য। বিশ্বম্ভর বা নিমাই বা গৌরাঙ্গ কেমন করে বাল্য-কৈশোরের চাঞ্চল্য কাটিয়ে নবদ্বীপের ধর্ম ও সমাজজীবনের কেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং কৃষ্ণের অবতার হিসাবে চিহ্নিত হলেন তার ইতিহাস তাঁর জীবনের মধ্যেই আছে। শ্রীচৈতন্য যুগাবতার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন তাঁর নবদ্বীপ বাসকালেই। অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুর অবতারগ্রহণের কারণ। চৈতন্য-আবির্ভাবের সমকালীন বাংলা বিশেষত নবদ্বীপের সমাজ ছিল অত্যন্ত কলুষিত-

'বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার।' (চৈতন্য ভাগবত)

ধর্মকর্মের অধিকার ধনীরা কুক্ষিগত করেছিল। তারা ধর্মের নামে প্রভূত খরচ করত এবং উৎকট আনন্দে মেতে উঠত। সাধারণ মানুষ ছিল নিরন্ন এবং অত্যাচারিত। এই সমাজ-পরিবেশে লোক উদ্ধারের জন্য জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য। তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলে উদ্ধব শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ প্রমুখ কৃষ্ণভক্তেরা মান্যতা দিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে স্পষ্ট হল যে, ধর্মসংস্থাপন তাঁর কাজ ছিল কিন্তু তা গৌণ কাজ। নিজের লীলা আস্বাদনের জন্যই তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনলীলা ও নবদ্বীপলীলা ভিন্ন নয়। তারা পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে, তাঁর আকর্ষণে বহু মানুষের সমবেত হওয়া, তাঁকে ঘিরে যে উচ্ছ্বাস, যে ভক্তি ব্যাকুলতা তার উৎস লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনে। তাই তাঁর জীবনী অবশ্য পাঠ্য।

৮.৩. চৈতন্যদেবের জীবনকথা

চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪০৭ (১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ) শকাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায়। সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। এবং তাঁর তিরোভাব ১৪৫৫ শকাব্দ (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) আষাঢ় মাসে। চৈতন্যের পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র (ইনি পুরন্দর মিশ্র নামেও খ্যাত) এবং মাতা শচীদেবী। আদিতে এঁরা শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন পরে নবদ্বীপে আসেন। এরও আগে তাঁদের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন বলে কথিত আছে। চৈতন্যের নামকরণ করা হয় বিশ্বম্ভর কিন্তু বিশ্বম্ভরের জন্মের পূর্বে শচীদেবীর পরপর কয়েকটি সন্তান মারা গিয়েছিল বলে অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী এই সন্তানের নাম রাখেন

নিমাই। অত্যন্ত গৌর গাত্রবর্ণের কারণে ইনি বাল্যকাল থেকেই গৌরাঙ্গ বা গোরা নামে পরিচিত ছিলেন। বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দূরন্ত ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে এবং সেই সঙ্গে কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনাও আছে। বিশ্বম্ভারের বড়ভাই বিশ্বরূপ নিমাই-এর বাল্যকাল সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। এজন্য বাল্যকালে নিমাইকে পড়াশুনা করতে পাঠানো হয়নি কিন্তু নিমাই-এর জেদে তাঁর পিতা তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করতে বাধ্য হন। অতি এ সময়ে নিমাই ব্যাকরণ, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদিতে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তর্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। এবার তিনি নিজে টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন (১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ)।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র মারা যান এবং তিনি নিজেদেরই মত দরিদ্রের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন-মাত্র পাঁচটি হরীতকী দিয়ে এই বিবাহ হয় (১৫০১-১৫০২ খ্রিস্টাব্দ)। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে গমন করেন। উদ্দেশ্য, অর্থসংগ্রহ ও সেখানকার যজমানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এখানে তপন মিশ্র নামে কৃষ্ণভক্তকে তিনি প্রথম ধর্মোপদেশ দেন এবং ইনিই চৈতন্যের প্রথম শিষ্য। এখানেও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভূত খ্যাতি হয়। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীনই তিনি প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর দর্পদংশনে মৃত্যুর সংবাদ পান। দেশে ফিরে প্রথমে শোকে অভিভূত হলেও কিছুদিন্যের মধ্যেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। পরের বছরই মাতার নির্বন্ধে তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারে তাঁর মন ফিরল না।

১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতার পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়া গমন করেন এবং ১৫০৮-এর ডিসেম্বর মাস নাগাদ প্রত্যাবর্তন করেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তিনি ভাববিহ্বল হয়ে পড়েন। যে গৌরাঙ্গ গয়ায় গিয়েছিলেন এবং যিনি গয়া থেকে ফিরে এলেন তার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কিছুদিন চেষ্টা করার পর তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পুরোপুরি ত্যাগ করলেন। স্ত্রীবাসের গৃহে নিতাই নৃত্য-কীর্তনে যোগ দিতে লাগলেন। ক্রমে অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুকুন্দ ও পরে সনাতন হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে নবদ্বীপের পথে পথে কীর্তন করে ফিরাতে লাগলেন। এই সময়েই বিশেষ ঘটনা কাজী দলন ও জগাই-মাধাই উদ্ধার। এই সময় তাঁর দেহে নানারকম ভাববিকার দেখা যেতে লাগল। লোকের ধারণা হল তাঁর বায়ুরোগ হয়েছে। শ্রীবাস শচীদেবীকে বোঝালেন যে, এ কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।

এরপর চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠল। গৃহজীবন যাপন করবেন এবং ধর্মপ্রচার করবেন এমন ব্যাপার লোকে মান্য করে না। বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন না থাকলেও নানা দিক বিবেচনা করে তিনি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি (১৪৩১ শকাব্দ) গৃহত্যাগ করলেন এবং কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী চৈতন্য শচীমাতাকে বিষয়টি আগেই জানিয়েছিলেন। এবং মায়ের সব দায়িত্ব সারা জীবন নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের বারো দিন পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে মাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। দ্বাদশ দিন উপবাসী মাতার কাছে তিনি অন্নভিক্ষা গ্রহণ করেন। কয়েকদিন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অবস্থান করে তিনি পুরী বা নীলাচলে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য যাত্রা করলেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ ছিল যে, পুরীতে রথযাত্রার সময় প্রত্যেক বছর নবদ্বীপের ভক্তেরা আসতেন, তাদের মাধ্যমে নবদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

পুরীতে পৌঁছানোর পর তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন এবং এই বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীকে কয়েকদিনের মধ্যেই (১২ দিন) স্বমতে অর্থাৎ ভক্তিধর্মে আনয়ন করেন। পরে, রাজা প্রতাপ রুদ্রের গুরু কাশী মিশ্রকেও তিনি রাগভক্তিতে বিশ্বাসী করে তোলেন। ফলে রাজা প্রতাপ কর ও রাজপরিবার তাঁর অনুগত হয়ে ওঠে।

১৫১০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১৪৩২ শকাব্দ) বৈশাখের প্রথমে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বার হন। সন্ন্যাসীদের এক স্থানে থাকতে নেই এটি একটি কারণ, দুই, দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি পরিক্রমা এবং কেউ কেউ বলেন তাঁর নিরুদ্দিষ্ট বড়ভাই বিশ্বরূপ দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছেন, এমন সংবাদ তাঁর কাছে ছিল। ভ্রাতার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু আতা তখন জীবিত ছিলেন না। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে সবচেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা রায় রামানন্দের গোদবরীতীরস্থ বাড়িতে তাঁর সঙ্গে মিলন ও পরস্পরের ভাব বিনিময়। সার্বভৌম ভট্টাচার্যই তাঁকে দাক্ষিণাত্যে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হতে বলেছিলেন। রায় রামানন্দই প্রথম তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ হিসাবে চিহ্নিত করেন। চৈতন্য পরে তাঁকে নীলাচলে আসতে বলেন এবং রায় রামানন্দ তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ ছেড়ে নীলাচলে চলে আসেন। শ্রীরঙ্গমে তাঁর সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ হয়। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি একবার নীলাচলে ফেরেন, আবার রথের পর দাক্ষিণাত্য গিয়ে গোদাবরী তীর থেকে শীতকালে রায় রামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলে ফিরে আসেন।

১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্য নীলাচল থেকে বাংলা ঘুরে বৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন কিন্তু খুব বেশি লোকসংঘট্ট হওয়ায় গৌড় থেকে ফিরে আসেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে হুসেন শাহের রাজকর্মচারী রূপ (দবির খাস) ও সনাতন (সাকর মল্লিক)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি পরে তাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি রামকেলি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন এবং সম্ভবত শান্তিপুরে শচীমাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে শরৎকালে মাত্র দুজন অনুচর সঙ্গ নিয়ে চৈতন্যদেব ঝারিখণ্ডের পথে বনের মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি কাশীতে যান সেখানে তপন মিশ্র (তাঁর প্রথম শিষ্য), বৈদ্য চন্দ্রশেখর ও কীর্তনীয়া পরমানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সময় কাশীতে প্রকাশানন্দের মনে তিনি ভক্তিভাব সঞ্চার করেন। এরপর তিনি প্রয়াগে যান ও সেখান থেকে মথুরা ও বৃন্দাবনে যান। এইসব অঞ্চলের লুপ্ত তীর্থগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করেন এবং রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে আবার প্রয়াগে ফিরে আসেন। এখানে রূপ এবং তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ বা অনুপম তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এঁদের বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কাশী যান এবং এখানে সনাতন তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এঁকেও বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নবদ্বীপে যান এবং শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে ভোজন করেন (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই তাঁর শেষ স্বদেশে আগমন এরপর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি নীলাচলেই অবস্থান করেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর থেকে তিনি ব্রহ্মচর্যের নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতেন। সর্বপ্রকার বিলাস বর্জন করেছিলেন, স্ত্রীমুখ পর্যন্ত দর্শন করতেন না। স্ত্রীমুখ দর্শনের জন্য তিনি ছোট হরিদাসকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, জগদানন্দ বিলাসদ্রব্য আনয়নের জন্য তাঁর কাছে কঠোর ভর্ৎসনা লাভ করেছিলেন। রাগভক্তির সুদুর্গম পথে চলা তিনি নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানের শেষ বারো বছর তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে দিব্যোন্মাদ অবস্থা। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, হরিদাস, পরমানন্দপুরী ইত্যাদি ভক্তরা সব সময়ে তাঁর কাছাকাছি থাকতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

'নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ।।'

কখনো চটক পর্বতকে গোবর্ধনগিরি ভ্রম করতেন, কখনো কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যেতেন, কখনো রথের সামনে মূর্ছা যেতেন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তেরা এই অবস্থার সঙ্গে রাধিকার বিরহার্তির সাযুজ্য দেখেছেন। রাগভক্তির প্রকাশ সন্ন্যাসের পূর্বে দেখা গেলেও এবং সন্ন্যাসের পূর্বে কৃষ্ণভাবে ভাবিত হলেও সন্ন্যাসের পর তিনি শুধুই রাধা। এই দিব্য ভাবাবস্থা কল্পনারও অতীত। অধিকাংশ সময় তাঁর চেতনা থাকত না। তাঁর শেষ আশ্রয় 'গম্ভীরা' নামক ঘরটির ভিত্তিতে মুখ ঘসে ঘসে দেহ ও মুখ রক্তাক্ত করে ফেলতেন-

'রোমকূপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলেদ। (চৈ.চ)

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটে। মৃত্যুর কাল বা ঘটনা নিয়ে চৈতন্য চরিতামৃতে কিছু বলা হয় নি। লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জয়ানন্দ বলছেন, রথের সামনে বিজয়া নাচতে নাচতে মহাপ্রভুর পায়ে ইটের আঘাত লাগে যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। বিষয়টি বিতর্কিত। ভক্তেরা এত বাস্তব মৃত্যু মানতে রাজি হননি। তাঁরা মনে করেন হয় তিনি জগন্নাথে বিলীন হয়েছেন, নয়, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, নয় পুরীর পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করে মৃতদেহ গোপন করে ফেলেছে। এসব অনুমানের কোনো প্রমাণ নেই।

শ্রীচৈতন্য নিজে দার্শনিক ছিলেন না। তাঁকে ঘিরে দর্শন রচিত হয়েছে। তাঁর রচনার একমাত্র পরিচয় 'শ্লোক শিক্ষাষ্টক'। বৈষ্ণবের আচরণীয় বিধি সম্পর্কে এবং ভক্তি সম্পর্কে সেখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৮.৪. বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব

শ্রীচৈতন্য বাংলার সমাজজীবনে ধর্মীয় ও সংস্কৃতির জীবনে যে অসামান্য প্রভাব ফেলেছিলেন, তাতে এই পুনরুজ্জীবনকে অনেকেই বাংলাদেশে ঘটা প্রকৃত রেনেশাঁস বলতে চান। সামাজিক জীবনে ধনী, প্রথাগতভাবে বিদ্বান, প্রভাবশালী ও উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমেই তিনি প্রথম সমাজ বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর 'চণ্ডালো'পি দ্বিজশ্রেষ্ঠ: হরিভক্তিপরায়ণ।' এই বাক্য বাংলার প্রান্তীয় মানুষের কাছে ছিল মুক্তির দিশা। খোলাবেচা শ্রীধর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, যবন হরিদাস চরম নিঃস্ব হয়েও তাঁর কাছে মান্যতা লাভ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্মীয় জীবন যে আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল বৃন্দাবন দাস তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধন এবং বিদ্যার দম্ভ। 'শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধির কসরৎ' এর সাহায্যে এঁরা সাধারণ মানুষদের অবজ্ঞা করতেন ও দূরে থাকতেন।

গৌরাঙ্গও তাঁর প্রথম জীবনে এদেরই অনুসরণ করতেন। 'দিগ্বিজয়ী পরাভব' যদি সত্য নাও হয়, তর্কযুদ্ধে সমব্যবসায়ীদের পরাস্ত করে গৌরাঙ্গ যে আনন্দ পেতেন, তা সম্ভব। এই বিদ্যার আড়ম্বর কৃষ্ণভক্তির কাছে যখন তুচ্ছ হয়ে গেল তখন তিনি মানবধর্মে সব মানুষকে সমান বলে মর্যাদা দিতে পারলেন। এই কারণে শাস্ত্রসম্বল ব্রাহ্মণেরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ও নানাভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অবতার হিসাবে চিহ্নিত হওয়া এদের সব গর্ব চূর্ণ করেছিল। চৈতন্যের অগ্রজতুল্য নিত্যানন্দ ভক্তির অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন শূদ্রদেরই। অদ্বৈত আচার্যও বলেছিলেন,

'অদ্বৈত বলেন যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবাদ।।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যপ্রভাব আরও গভীর ও সুদুপ্রসারী। সাহিত্যের মধ্যে এই পরিবর্তনের পূর্ণ প্রকাশ। এর আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হলেও সংস্কৃত রচনারই আধিপত্য ছিল। চৈতন্যপ্রভাবে বাংলা গীতিকাব্য অর্থাৎ পদাবলীর ধারা উচ্ছ্বসিত উঠল। সংস্কৃতেও কাব্যনাটক রচিত হতে লাগল। চৈতন্য নিজে যাত্রাপালায় অভিনয় করে তাকে উজ্জীবিত করলেন। চৈতন্য জীবনীসাহিত্য রচিত হতে লাগল অজস্র। ভাব ও ভাষারীতির মধ্যে এল নতুন মাধুর্য ও রুচিশীলতা। চৈতন্য প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের ক্রোধপরায়ণ দেবদেবীও তাদের হিংস্র মনোভাবকে নরম করলেন। কীর্তন গানের প্রসারও হল কূলপ্লাবী। শতাধিক পদকর্তা তাঁদের ভাবমূলক সংগীতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। এমনকি মুসলমান কবিরাও পদরচনা করতে লাগলেন। শুধু চৈতন্য নয় তার গণদেরও চরিতসাহিত্য রচিত হতে লাগল। মানুষ শ্রীচৈতন্যকে দেখে ধর্মে, কাব্যে জীবনে এল মানবীয়তা। কীর্তনগানের সুর, ভাব, ভাষা পরবর্তী কাব্যধারায় গভীর প্রভাব ফেলল। দৃষ্টান্ত-মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ কবিরা। বাউল গান ও কীর্তন আজও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যার মর্মমূলে আছেন চৈতন্যদেব।

৮.৫. চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ: গুরুত্ব বিচার

বাঙালীর ইতিহাসে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাবান পুরুষ। তিনিই একমাত্র জীবৎকালে ঈশ্বর অবতাররূপে স্বীকৃত হন। তাঁকে ঘিরে সংস্কৃত ও বাংলায় কাব্যশ্লোক, নাটক ও গান রচিত হতে লাগল। মধ্যযুগের জনমানসে মহাপ্রভুর আবির্ভাব মানুষের লুপ্ত চৈত্যকে ফিরিয়ে দিল। সব কিছুকে নতুনভাবে দেখার চেতনা জাগ্রত হলো। তাই বলা যাঁর যে, চৈতন্যদেব মানবতাবাদের প্রথম জাগরণ ঘটালেন। শুধু ধর্মীয় চেতনার আলোকেই নয়, মানবিক চেতনার দিক থেকেও বিশেষ আবেদন লক্ষিত হয়। একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসাবে মহাপ্রভু ছিলেন মেধাবী পণ্ডিত এবং জ্ঞানী। রূপবান যুবক বাঙালীর চিতের মুক্তি ঘটালেন এবং মানুষের প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাই তিনি মানুষের মনের আসনে দেবতারূপে চিহ্নিত হলেন। তাঁকে অদ্বৈত আচার্য দেবতারূপে প্রথম চিহ্নিত করলেন।

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের মূল বিষয় ছিল দেবতা। কখনো তা পৌরাণিক কখনো তা লৌকিক। হয়তো বা রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষকে ও শাপভ্রষ্ট দেবতারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর মানুষের জীবনকে বিষয় করে যে সাহিত্য রচিত হতে পারে তা চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচনা থেকেই বুঝা গেল।

চৈতন্য জীবনকে বিষয় করে প্রথম সংস্কৃত ভাষায় কড়চা রচনা করেন মুরারী গুপ্ত। তাঁর ঐ কড়চার নাম হলো 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্'। আবার ১৫৪২ খৃঃ পরমানন্দ সেন (দাস) চৈতন্যচরিতামৃত নামে একখানি সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য রচনা করেন। তাছাড়া তিনি 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নামে একটি নাটক রচনা করেন। এছাড়া বেশ কিছু পদ, কবিতা, গান তথা চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব দর্শনও রচিত হয়। সর্বোপরি মহাপ্রভুর শেষ জীবনকে অবলম্বন করে স্বরূপ দামোদর একটি কড়চা রচনা করেন।

বাংলা ভাষায় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। তাঁর গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য ভাগবত'। এছাড়া লোচন দাস রচনা করেন 'চৈতন্যমঙ্গল'। নরহরি দাস 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', জয়ানন্দ রচনা করেন 'চৈতন্যমঙ্গল'। বিশেষ-ভাবে উল্লখযোগ্য হলো কবিরাজ কৃষ্ণদাসের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। তবে একথা ঠিক যে বাংলার চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে কেউই সংস্কৃত ঐতিহ্যকে অবলম্বন বা অনুসরণ করতে ভুল করেন নি। তাই কৃষ্ণদাস লিখেছেন-

'আদিলীলা মধ্যে যত প্রভুর চরিত
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিল গ্রন্থিত।
মধ্য-শেষ প্রভুলীলা স্বরূপ দামোদর
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।'

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিরে আমাদের প্রথমেই চৈতক্ত দেবের সমগ্র ৪৮ বছরের জীবনকালকে দুইভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তিনি ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাই প্রথম ২৪ বছর তাঁর সংসার জীবন ও বাকী ২৪ বছর তাঁর সন্ন্যাস জীবন

বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম ২৪ বছরের সংসার জীবনকে অবলম্বন করে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। ১৫৪০-৪৪ এর মধ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থের নাম পরে 'চৈতন্যভাগবত' করা হয়। তাই-

'চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহন্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।'

অথবা লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু একথা ঠিক যে ভাগবতে যেমন ভগবানের কথা আছে, সেখানে কৃষ্ণই মুখ্য, তেমনি 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যই মুখ্য। আবার বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ মূল্যে স্বীকৃত 'চৈতন্যভাগবত' এবং 'বৃন্দাবন দাস' ভাগবতকার ব্যাসদেবের তুলনীয়। শুধু জীবনী গ্রন্থ হিসাবেই নয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দসিলস্বরূপ 'চৈতন্যভাগবত'। এই গ্রন্থট তিনট খণ্ডে বিভক্ত-আদি, মধ্য এবং অন্ত্য। এই গ্রন্থে মহাপ্রভু একজন ব্যক্তি মানুষ এবং তাঁর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভাষা পেয়েছে। তবে চৈতন্যের গৌড়লীলা বর্ণনাকালে বৃন্দাবন দাস সমসাময়িক নবদ্বীপ এবং সেই সঙ্গে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উৎকৃষ্ট পরিচয় দান করেছেন। কাব্যটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে-এই কাব্যের কোথাও কবি কাব্য ধর্ম আরোপের সচেতন প্রয়াস করেন নি। সমগ্র গ্রন্থটি বর্ণনাধর্মী পয়ারে রচিত। তাই বলা যায় যে-চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবন দাসের সহজ স্বাভাবিক ভক্তকবি মনের এক কাব্যিক ফসল।

চৈতন্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বকে অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবনকে বিস্তৃতভাবে তুলে হয়েছেন কৃষ্ণদাস গোস্বামী। তাঁর ক্ষ্মচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে চৈতন্যের আদি জীবনের কথা কম আছে। এখানে ঈশ্বর ও ঈশ্বরতত্বের আলোচনা অধিক থাকায় বিশেষ তত্ত্ব দর্শনে পরিণত হয়েছে গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের গঠন বৃন্দাবন দাসের অনুসারী। কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনকে তিনটি লীলায় বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি খণ্ডলীলা আবার পরিচ্ছেরে বিভক্ত। কৃষ্ণদাস প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ শুরু করেছেন বন্দনা গান করে। তিনি লিখেছেন-

'জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ

জয়োথৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।ক্ষ্ম'রছেন। তিনি ভনিতা চেনেছেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পংক্তির মধ্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন-

'চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস'

বাংলা সাহিত্যের মহাগ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' এটি শুধু জীবনী গ্রন্থই নয় বাংলার প্রংম পাঠনীয় গ্রন্থ এটি। অর্থাৎ এই গ্রন্থটি গানের মতো সুর করে গাওয়া হত না। এই গ্রন্থে তত্ত্ব-ইতিহাস-কবিত্ব ও অধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত মিশ্রণ ঘটেছে। ভাই কৃষ্ণদাসকে একজন বিখ্যাত ভাষাশিল্পী ও তফজ্ঞ পণ্ডিতরূপে চিহ্নিত করা যায়। তাই বৈষ্ণব ভক্ত ছাড়াও একজন রসজ্ঞ পাঠকের কাছে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই গ্রন্থটি সর্বকালের এক অদ্বিতীয় সম্পদ।

তবে চৈতজজীবনীকাররা চৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে তেমন কোন স্থিয় মতবাদ দিতে পারেন নি। বরং বলা যায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে অমর করে রাখার একান্ত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র। তিনি বৃন্দাবন দাসকে একদিকে অনুসরণ করেছেন অন্য দিকে সমাজ অর্থনীতি ও ইতিহাসের সাম্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। মহা-প্রভুর দেহাবসান সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য অভিমত দিয়ে তিনি চৈতন্য জীবনীর পূর্ণতা টেনেছেন বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন

আষাঢ়ে পঞ্চমী রথ বিজয় নাচিতে

ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে।

তা থেকেই মহাপ্রভুর দেহাবসান ঘটে। মহাপ্রভুর সমুদ্রে বিলীন হওয়া অথবা পাণ্ডাদের দ্বারা আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা তেমনভাবে বিশ্বাস জাগায় না। তাছাড়া প্রতাপরুদ্রের চক্রান্তে হত্যার কাল্পনিক কাহিনীটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে লোচন দাসের উল্লিখিত জগন্নাথ দেহে মহাপ্রভুর লীন হওয়ার ঘটনাটিকে অনেকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেও জয়ানন্দের বিবরণ বাস্তব ও সঙ্গত বলেই মনে হয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য অবতার। আবার তিনি স্বয়ং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি অবশ্যই সামাজিক মানুষ। এমন কি সর্বভারতীয় মানুষ। কড়চা থেকে শুরু করে তাঁকে ঘিরে যা কিছু রচিত হয়েছে, সব মিলেই চৈতন্য জীবনীর পূর্ণতা সম্ভব। জীবিত মানুষকে অবলম্বন করে এই যে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি তা সমগ্র সংস্কৃতির একটি মহামূল্যবান সম্পদ বলে মনে হয়।

৮.৬. সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনী

চরিতকাব্য ভারতীয় সাহিত্যে নতুন নয়। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বাম্পতিরাজের 'গৌড়বহো', কহ্লণের

'রাজতরঙ্গিনী' বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কচরিত' অজ্ঞাতনামা কবির 'পৃথ্বীরাজবিজয়' ইত্যাদি তার নিদর্শন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'ও রচিত হয়েছিল প্রকাশ্যে রাম, অভ্যন্তরে গৌড়েশ্বর রামপাল ও মদনপালের দ্ব্যর্থবোধক কীর্তিকথা নিয়ে।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যখন কৃষ্ণবিরহে শ্রীচৈতন্যের নানা বিকার লক্ষিত হতে থাকে, তখন থেকেই তাঁকে কৃষ্ণের অবতার বলে ভক্তেরা বন্দনা করতে লাগলেন এবং তখন থেকেই তাঁর 'লীলা' নিয়ে পদরচনা শুরু হয়ে গেল। পর বৎসর শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে গেলে মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে রচনা করলেন 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্'-যা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে বেশি প্রসিদ্ধ। আশ্চর্য চৈতন্যলীলা নিয়ে তাঁর জীবৎকালেই পদ রচনা করলেন, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার প্রমুখ কবিরা।

চৈতন্যকে নিয়ে সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থগুলি হল ;

(১) 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' রচনাকাল ১৫১৬ থেকে ১৫৪২ বলে মনে করেছেন গবেষকেরা। লোচনদাস ও মুরারি গুপ্তের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন।

(২) কবিকর্ণপুর বা শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য বিষয়ে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'। প্রথমটি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয়টি ১৫৪০-এর আগে এবং তৃতীয়টি ১৫৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।

(৩) কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতী ১৪৩টি শ্লোকে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' নামে একটি স্তোত্র রচনা করেন।

(৪) 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা'র উল্লেখ নানা স্থানেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। মহাপ্রভুর শেষ জীবনের প্রামাণ্য দলিল এই 'কড়চা'।

এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম কেননা এগুলি চৈতন্যচরিতের প্রাথমিক ও প্রামাণ্য রচনা।

৮.৭. বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

ইতিপূর্বে আপনারা সংস্কৃত জীবনীগুলির কথা জেনেছেন- সেগুলি কোনোটি মহাকাব্য, কোনোটি স্তোত্রকাব্য, কোনোটি-বা নাটক। কিন্তু সংস্কৃতে রচিত হওয়ার জন্য সাধারণ বাঙালি পাঠকগণ তা থেকে বিশেষ লাভবান হ'ত না। তুলনায় বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে চৈতন্যদেবের বাংলা জীবনী-কাব্যগুলিই অধিক প্রচার লাভ করেছিল। সামান্য-শিক্ষিত ব্যক্তিও এই বাংলা জীবনীগুলি থেকে চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন-কথা এবং বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও রহস্য বুঝতে পারতেন। এমনকি বৈষ্ণব-সমাজের বাইরেও সাধারণ পাঠকমহলেও এই জীবনীগুলির কিছু কিছু চাহিদা ছিল। বাঙালির জীবন, সমাজ ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক মৌলিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য এই জীবনী-গ্রন্থগুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলায় লেখা চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসাবে বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শ্রীগৌরলীলামৃত' গ্রন্থটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রন্থটি খণ্ডিত আকারে আবিষ্কার করেছেন ড.

কাননবিহারী গোস্বামী। অধ্যাপক গোস্বামীর মতে, গ্রন্থটি ১৫১০-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। এই অনুমান সত্য হলে এই গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষায় লেখা প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে কাব্যটি খণ্ডিত।

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন বৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থকে বহুমান দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, 'চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস'। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। প্রায় সমকালীন রচনা লোচন দাসের গ্রন্থের নামও 'চৈতন্যমঙ্গল' হওয়ায় কারও মতে বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণীর ইচ্ছায় কারও মতে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা এই গ্রন্থকে ভাগবতের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন বলে এর নাম হয় 'চৈতন্য ভাগবত'।

বৃন্দাবন দাসের মাতার নাম নারায়ণী। পিতার নাম জানা যায় না। ইনি ছিলেন শ্রীবাসের ভ্রাতুস্পুত্রী। বৃন্দাবন দাস দুই ভাইয়ের নাম করেছেন-শ্রীবাস ও শ্রীরাম। কবি কর্ণপুর আরও একজনের নাম বলেছেন-শ্রীপতি। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে এঁদের আর এক ভাই নলিনী পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস কয়েকবার নারায়ণীর নাম বলেছেন। বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাবকাল নিয়েও মতপার্থক্য আছে। বৃন্দাবন দাস বলছেন, চৈতন্যের যখন ২৩ বছর বয়স অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ১৪৩০ শকে শ্রীরাসের গৃহে নারায়ণী বিশ্বম্ভরের প্রসাদ খেয়ে 'হা কৃষ্ণ' বলে কেঁদেছিলেন-

'চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত'।।

এই হিসাব ধরে বহু বিতর্কের পরে বৃন্দাবন দাস ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

চৈতন্য ভাগবতের রচনাকাল নিয়েও বহু বিতর্ক আছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে এটি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের পরের রচনা। কারণ কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই কিন্তু ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'রা এক উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর এটি সমাপ্ত হয়। নিত্যানন্দের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি বিদ্বেষ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু নিত্যানন্দর মৃত্যুর ১০/১২ বছর পর পরিস্থিতি এমন ছিল না। এটি সম্ভবত কবির যৌবনকালের রচনা নইলে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি এত উষ্মার প্রকাশ থাকত না। সবদিক বিচার করে ড. বিমানবিহারী মজুমদার এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪৮ বলে মনে করেন।

'চৈতন্য ভাগবত' শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাস এই গ্রন্থকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। (১) আদিখণ্ড-১৫টি অধ্যায়, (২) মধ্যখণ্ড-১৬টি অধ্যায় এবং (৩) অন্ত্যখণ্ড-১০টি অধ্যায়। এর ছত্রসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। অন্ত্যখণ্ডটি অতিসংক্ষিপ্ত এবং অনেকে মনে করেন এটি অসম্পূর্ণ।

আদিখণ্ডে চৈতন্যজন্ম থেকে গয়াগমন ও নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অংশটি গ্রন্থের সবচেয়ে বাস্তব, প্রামাণ্য এবং উৎকৃষ্ট অংশ। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শিষ্য, তাঁর কাছে নবদ্বীপে ঘটিত সব ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি পেয়েছেন। মাতা নারায়ণী এবং অদ্বৈত আচার্যও তাঁকে তথ্য দিয়েছেন। কাজেই অলৌকিকতাকে বাদ দিলে এই অংশের প্রামাণিকতা সবচেয়ে বেশি। গৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের জন্ম ও বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা, অধ্যাপনা, তার্কিকতা, পিতার

মৃত্যু, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে বিবাহ, পূর্ববঙ্গে মন, পত্নীর মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তি, প্রত্যাবর্তন দ্বিতীয় বিবাহ, গয়াগমন, ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, প্রথম কৃষ্ণভক্তির অনুভব, ঈশ্বরপুরীর কাছে মন্ত্রগ্রহণ ও ভাববিহ্বল অবস্থায় নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন। এই পর্যন্ত আদিখণ্ড।

মধ্যখণ্ডে গয়া প্রত্যাগত চৈতন্যের ভাববিহ্বল অবস্থা, শ্রীবাসের গৃহে নৃত্য-কীর্তন, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন, নিত্যানন্দ-হরিদস কর্তৃক নবদ্বীপে নাম কীর্তন, কাজী দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, ভক্তি ব্যাকুলতা গোপীভাব ও অবশেষে সন্ন্যাসগ্রহণ।

অন্ত্যখণ্ড অতিসংক্ষিপ্ত। চৈতন্যের কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ, রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে যাত্রা, নীলাচলে জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করে মূর্ছা, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গমন ও তাঁকে স্বমতে আনয়ন, স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে চৈতন্যের মিলন, গৌড়ে গমন, অদ্বৈতের গৃহে শান্তিপুরে মিলন, গৌড়ে গমন, অদ্বৈতের গৃহে শান্তিপুরে মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, শ্রীবাস ইত্যাদি কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে মিলন। নীলাচলে প্রত্যাবর্তন ও পরে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা। চৈতন্যের আদেশে নিত্যানন্দের গৌড়ে ফিরে কৃষ্ণভক্তি প্রচার। অদ্বৈতকর্তৃক চৈতন্যকে অবতাররূপে ঘোষণা ও চৈতন্যকীর্তন। রূপ ও সনাতনের নীলাচলে আগমন। ভাবাবেশে চৈতন্যের কূপমধ্যে পতন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস কোনো কথা বলেননি।

গবেষকদের অনুমান, বৃন্দাবন দাস চৈতন্য লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। কিন্তু শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, মাতা নারায়ণী ও বিশেষতঃ গুরু নিত্যানন্দের কাছে তিনি চৈতন্যের নবদ্বীপে বাসকালে বিশেষত সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ববর্তী অবস্থার বহু বিবরণ পেয়েছেন যা প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। প্রত্যেক বছর রথের সময়ে যেসব ভক্তরা নীলাচলে আসতেন তাদের কাছেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যা তাঁর জানা ছিল না সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নি বা অতি সংক্ষেপে বলেছেন। নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে চৈতন্য ছিলেন কৃষ্ণের অবতার বা স্বয়ং কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে গোপীভাব প্রকাশ করলেও নবদীপের ভক্তদের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। তাই বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণেরই অবতার।

'চৈতন্য ভাগত' অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। চৈতন্য-আবির্ভাবের সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমি যেভাবে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে তা কবির দায়িত্ব সচেতনতার পরিচায়ক। সেকালের নবদ্বীপ বা নিকটস্থ অঞ্চলগুলির সমাজ যেভাবে ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের প্রদর্শনের স্থান হয়ে উঠেছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ আমরা বৃন্দাবন দাসের রচনা থেকেই পাই। এই ধনীরা ঘোড়া বা দোলায় চড়ে ঘুরতেন এবং সঙ্গে জীবিকা বা আনুকূল্যের জন্য বহু ব্যক্তি পিছনে পিছনে যেতেন। এঁরা রাজার মত জীবনযাপন করতেন। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চণ্ডী বা মনসার পূজা উপলক্ষ্যে বহুব্যয় করতেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন-

'দম্ভ করি বিষহরি পুছে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে'।।-ইত্যাদি

এঁরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণা করতেন। শহরে এই পরিবেশ এবং গ্রামে শিক্ষাহীন ভূমিহীন, ধর্মাচরণে অধিকারহীন মানুষের জীবনযাপন ভক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠানমূলক ধর্মে এই সময়ে মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস দুজনেই বলেছেন জগন্নাথ মিশ্র দরিদ্রই ছিলেন-'ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ'। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পর বিশ্বম্ভরের পড়াশুনা বন্ধ হলে শচীদেবীকে জগন্নাথ মিশ্র বলেছিলেন-'পড়িয়াও আমার ঘরেত নাহি ভাত।' নিমাই-এর পত্নী লক্ষ্মীদেবী দরিদ্রেরই কন্যা ছিলেন। বাল্যলীলায় গঙ্গার ঘাটে নিমাই-এর দুষ্টুমি, সহাধ্যায়ীদের ব্যাকরণের কূটতর্কে বিধ্বস্ত করা, পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে শ্রীহট্টীয়াদের অনুকরণে হাসি-তামাশা চৈতন্যের কৌতুকপ্রবণ মানসিকতার পরিচয়। আবার অদ্বৈতকে স্বহস্তে কিলানো তাঁর যৌবনের অসহিষ্ণুতার প্রকাশ।

কাব্যগুণে এবং স্বচ্ছতায় বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' উজ্জ্বল। তাঁর চৈতন্য বর্ণনা;

বিমল হেম জিনি তনু অনুপম রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।

আবার,

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ স্বরূপ নির্মল।। -ইত্যাদি

তাঁর কাব্যের সৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। সমাজচিত্র, বাস্তবতা, ভক্তিভাব, সারল্য সব মিলিয়ে 'চৈতন্য ভাগবত' অসামান্য সৃষ্টি এবং বাংলার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল।

৮.৮. কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' বাংলায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য জীবনীকাব্য। শুধু জীবনচরিত হিসাবেই নয়, এই মহাগ্রন্থকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় নি। চরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন, প্রাচীন নৈহাটি গ্রামের কাছে (কাটোয়ার নিকটস্থ) ঝামটুপুরে তাঁর নিবাস ছিল। গৃহে গৃহদেবতার পূজা, অহোরাত্র নাম-সঙ্কীর্তন ইত্যাদি হত। স্বপ্নে নিত্যানন্দের আদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন, স্বরূপ দামোদর ইত্যাদির আশ্রয় তিনি পান। চরিতামৃতের ভূমিকায় তিনি রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথের ভৃত্য বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্ণদাস কোনো গুরুর নাম করেন নি কিন্তু তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, নিত্যানন্দই তাঁর গুরু ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'কৃষ্ণদাস নিশ্চয়ই নিত্যানন্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, নতুবা বৃন্দাবন দাসের মতো অতটা নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ হইত না।' বৃন্দাবনের ছয় প্রধান গোস্বামী (ষড় গোস্বামী) রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব ও গোপাল ভট্টকে তিনি শিক্ষাগুরু বলেছেন। কৃষ্ণদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য ছিলেন, তা জানা যায় না। ড. সুকুমার সেনের মতে এই কৃষ্ণদাসই সেবক হিসাবে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য গমনের সময় ও বৃন্দাবন যাত্রার সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মতটি বিতর্কিত।

'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনার পূর্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুটি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন, 'সারঙ্গরঙ্গদা' (কৃষ্ণকর্ণামৃতের টাকা) ও 'গোবিন্দলীলামৃত'। কৃষ্ণদাসের চৈতন্য চরিতামৃতে'র রচনাকাল সম্পর্কে বহু বিতর্ক আছে। এই পুষ্পিকা শ্লোকটি-

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেহন্যাসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ।

ধরলে ১৫৩৭শকাব্দ এর রচনাকাল হয় এবং তাহলে কবিকে শতায়ুর চেয়ে বেশি হতে হয়। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে 'সিন্ধু' অর্থ ৭ না ধরে ৪ ধরলে রচনাকাল ১৫৩৪ শকাব্দ বা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ বলা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এটির রচনাকাল ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ কবির বয়স তখন ৮৫ বৎসর যাই হোক, এই গ্রন্থ ১৫৯২ এর আগে রচিত হয়নি। অতিবৃদ্ধ কবি উপসংহারে অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলেছেন,

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান।।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য ছিল অনন্য সাধারণ। তাঁর অধীত ভাণ্ডার থেকে তিনি শ্লোক সংগ্রহ করেছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন সবসমেত ১০১১টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এতে স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, ভাগবত, গীতা, 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, মুরারি গুপ্তর কড়চা, কবি কর্ণপুরের নাটক ইত্যাদির উদ্ধৃতি রয়েছে। এর মধ্যে ১০১টি শ্লোক তাঁর নিজের রচনা। ভাবধর্মের দিক থেকে মুরারি গুপ্ত এবং কবি কর্ণপুরের কাছে তিনি বহুভাবে ঋণী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ পরিকল্পনা বৃন্দাবন দাসের চেয়ে ভিন্ন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে যে সব বর্ণনা বিস্তারিতভাবে আছে তা তিনি হয় ছেড়ে গেছেন, নয় অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত ঐতিহাসিক জীবনী রচনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না (কোনো মধ্যযুগীয় কাব্যেরই ছিল না)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সার ভাবধর্মের বিস্তার প্রামাণ্যভাবে দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর গ্রন্থ খণ্ড নয়, লীলা হিসাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১৭টি পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা ২৫টি এবং অন্ত্যলীলা ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত।

আদিলীলার প্রথম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা, চৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং পরিকরগণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য কারণ এতে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবদর্শন সূত্রাকারে বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে। জন্ম থেকে তেইশ বছর অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প পর্যন্ত এই অংশের বিস্তার। কাজী দলন ও জগাই মাধাই উদ্ধার এই অংশের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

মধ্যলীলার ২৫টি পরিচ্ছেদে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ রাঢ়দেশে ভ্রমণ, নীলাচলে যাত্রা সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে স্বমতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ, সেখানে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, দাক্ষিণাত্যের বহু তীথ পরিক্রমা, নীলাচলে গমন, রথের পর আবার দাক্ষিণাত্যে যাত্রা, রায় রামানন্দকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন, বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে পুনরায় রাঢ়দেশে গমন, গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাত্রা, সেখানে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন। মোটামুটি এই ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে। মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তৎকালীন বিখ্যাত বৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিচার ও স্বমতে আনয়ন বিশেষ উল্লেখ্য। এই পরিবর্তন ঘটাতে ১২ দিন সময় লেগেছিল। বাসুদেব সার্বভৌমের বেদান্ত ব্যাখ্যার শেষে চৈতন্যদেব বলেছিলেন,

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।।

মধ্যলীলায় রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন অংশে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রস, গোপীপ্রেম, রাধাপ্রেম, রাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তথা প্রেমবিলাসবিবর্ত এগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। রায় রামানন্দ স্পষ্টতই বলেছেন, চৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ রাধা-রাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে তিনি অবতীর্ণ (মূল স্বরূপ দামোদরের শ্লোক: রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতহ্লাদিনী শক্তির স্মাৎ... ইত্যাদি)। এই প্রশ্নোত্তর শুধু নিজেকে বুঝে নেওয়া। রায় রামানন্দ তাকে বুঝিয়েছেন-

তোমার সম্মুখ দেখোঁ কাঞ্চন পাঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।

মধ্যলীলার আর একটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ, সেটি হল রাজা প্রতাপ রুদ্রের মহাপ্রভুর কৃপালাভ। বিষয়ী ও ধনীর মুখ দর্শনের মত মহাপাপ মহাপ্রভু করতে চাননি কিন্তু রথের সামনে রাজার চণ্ডালের মত ঝাঁট দেওয়ার দৃশ্য তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাঁর প্রতি চৈতন্যের কৃপা হয়। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণের তিনটি শক্তির কথা এবং শেষ পর্যন্ত বহুস্তর পরম্পরা পেরিয়ে 'মহাভাবে' পৌঁছানো-দার্শনিকতায় এই অংশ অনন্য।

অন্ত্যলীলার ২০টি পরিচ্ছেদ শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা করাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উদ্দিষ্ট। বৃদ্ধ বয়সে কবি অতন্ত্র নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও সংহত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ইতিহাস ও রসতত্ত্বকে একত্র গ্রথিত করেছেন। শেষের সাতটি পরিচ্ছেদে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থারই চিত্র;

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভাজন কৃত্য।।
রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দেরে লইয়া।
আপন মনের কথা কহে উখাড়িয়া।।

অন্ত্যলীলার শেষ বারো বছরের আর্তি এই মর্মজ্ঞ দার্শনিক কবির হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যা পরবর্তীকালে পদাবলীর রাধার ভাবব্যাকুলতার জীবন্ত উৎস।

অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে এই গ্রন্থ লিখতে শুরু করায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের শঙ্কা ছিল পাছে তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত করতে না পারেন। তাই আদিলীলা থেকেই সূত্রকারে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ রাগানুগা ভক্তিধর্ম

এবং তার ধারক যুগাবতার শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন-পরে আবার তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। মনে হতে পারে, এগুলি পুনরুক্তি কিন্তু কৃষ্ণদাসের রচনার গুণে তা আমাদের ভারাক্রান্ত করে না। গভীর মনন, বৈদগ্ধ্য, ভক্তিবিনত নিবেদন এবং কবিত্বশক্তির সাহায্যে দুরূহ বিষয়কে তিনি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে গেঁথেছেন। এই দার্শনিক আলোচনার জন্য গদ্যই উপযুক্ত বাহন হত কিন্তু এই গ্রন্থ যুক্তিসহ বিষয় উপস্থাপনায় গদ্যগ্রন্থের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আবার উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকারের সহজ ব্যবহার এর দুরূহ দার্শনিক বিষয়কে সহজ করেছে-রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'চিত্র ও সংগীত'। বহু অসাধারণ পংক্তি পাঠকদের মনে গেঁথে আছে। যেমন-

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
হেম প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি তার হয় যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।।

বা,

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

বা,

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে।। ;ইত্যাদি।

বৈষ্ণব ভক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করে একে সব ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করেছেন এবং এই মহাগ্রন্থ পূর্বের বহু বৈষ্ণব দার্শনিক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

৮.৯. চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত-এর তুলনামূলক আলোচনা

'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' এই উভয় গ্রন্থই ষোড়শ শতকের রচনা। বৃন্দাবন দাসের বইটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, কোনো ঐতিহাসিক পুরুষকে নিয়ে বাংলায় লেখা প্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব বৃন্দাবন দাসের। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর পূর্বগামী চৈতন্যচরিতকার বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে উচ্ছ্বাস থাকলেও কৃষ্ণদাসের মনোভাবটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।।'

এখন উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনায় উভয়ের বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়বে। নীচে অল্প কথায় উক্ত গ্রন্থ দুটির তুলনা তথা পার্থক্য নির্দেশ করা হচ্ছে।

১. বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা থেকে শুরু করে মধ্যলীলা পর্যন্ত সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। একথা স্মরণে রেখেই কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর পূর্ব-জীবনকথা সংক্ষেপে সেরেছেন এবং সেটা

সচেতনভাবেই। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে নিমাইয়ের বাল্যলীলা, বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ, নবদ্বীপের সমাজচিত্র, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, বৈষ্ণব মহাজনদের অসহায় অবস্থা ও নিমাইয়ের অলৌকিক বিভূতি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার কোনো পরিচয় কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

২. বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থটি সরল ভাষায় লিখিত ও মোটামুটি সুখপাঠ্য। তাঁর রচনায় এক ধরনের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা জীবনীরচনার কাজে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণদাসের নিছক ঘটনার বর্ণনায় রুচি ছিল না। তাই দেবোপম ব্যক্তির জীবনীকারের কাছে আমরা যতটা দার্শনিকতা প্রত্যাশা করি, তার সাক্ষাৎ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে পাই না। অথচ কৃষ্ণদাসের গ্রন্থের পাতায় পাতায় দার্শনিক ভাবনার বিচিত্র অভিব্যাক্তি পরিলক্ষিত হয়।

৩. উভয় কবিই অবতারবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের ধারণা ছিল, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে অবতীর্ণ ভগবান বিষ্ণুই গৌরাঙ্গরূপে কলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস মনে করতেন মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের যুগ্মাবতার ছিলেন, 'অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ' এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন কৃষ্ণদাস।

৪. বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুকে প্রধানত সংকীর্তন প্রচার আর দুষ্টের সংহারের নিমিত্ত অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। অথচ কৃষ্ণদাস গৌরাবতারের গভীরতর কারণগুলিকে নির্দেশ ও ব্যাখ্যা করেছেন। 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা' শ্লোকটির মূল তাৎপর্য অনুসারে 'তিন সুখ আস্বাদিতে' কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই তত্ত্বটি কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে বিবৃত আছে।

৫. কৃষ্ণদাস আপাদমস্তক দার্শনিক মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গোপীপ্রেম, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের স্বচ্ছন্দ অভিপ্রকাশ ঘটেছে। অথচ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে দার্শনিকতার স্বাক্ষর বিশেষ নেই। বৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী হলেও পরিবাররস, সমাজবন্ধনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬. বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ অকস্মাৎ সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে মহাপ্রভুর নীলাচললীলার অন্তরঙ্গ সংবাদ পাওয়া যাবে না। তিনি গুণ্ডিচা মহোৎসব পর্যন্ত লিখেছেন। তুলনায় এই পর্বের চৈতন্যদেবেরো অন্তরঙ্গ পরিচয়টি কৃষ্ণদাস সযত্নে বাণীবদ্ধ করেছেন।

৭. বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে চৈতন্য-সহচর নিত্যানন্দের প্রসঙ্গ যেমন বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সাক্ষাৎ কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে পাই না। হরিদাস প্রসঙ্গ, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থটির একটি মূল্যবান সম্পদ। এই হরিদাসের অলৌকিকক মাহাত্মের কথা কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে বর্ণিত না হলেও তাঁর প্রতি মহাপ্রভুর গভীর শ্রদ্ধা কৃষ্ণদাস দেখিয়েছেন।

৮. মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও তাঁর সর্বভারতীয় ভাবমূর্তির যে পরিচয় কৃষ্ণদাসের গ্রন্থে চিত্রিত আছে, তার অবকাশ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে ছিল না। তা ছাড়া জীবনীরচনার উপাদানসংগ্রহে উভয় গ্রন্থকারের উৎসেও কিছু ভিন্নতা ছিল। বৃন্দাবন দাসের উপাদানসংগ্রহের প্রধান উৎস ছিলেন তাঁর জননী এবং তাঁর শুরু নিত্যানন্দ। তুলনায় কৃষ্ণদাসের উপাদান সংগ্রহের উৎস ব্যাপকতর ছিল।

৯. ভাষাশৈলীর দিক থেকে বৃন্দাবন দাস মধ্যযুগের চিরাচরিত পাঁচালিকাব্যের ভাষাকেই অবলম্বন করেছেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাসের কাব্যের ভাষা দর্শনের উপযোগী গদ্যাত্মক ভাষা এবং বাহ্য

পয়ারবন্ধন মানলেও এই ভাষা গদ্যধর্মী ও আবেগমুক্ত দার্শনিক বিশ্লেষণের ভাষা। বৃন্দাবন দাসের ভাষা সমকালীন বাঙালির মৌখিক ভাষা। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাসের ভাষা তাঁর সমকালীন সাধারণ বাঙালির মৌখিক ভাষা নয়।

৮.১০. লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল': লোচন দাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী। তিনি শ্রীখণ্ডের অন্যতম বৈষ্ণবগুরু 'গৌরনাগর' মতের প্রবক্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। কাব্য মধ্যে বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ থাকাতে স্পষ্ট বোঝা যায় লোচন দাসের কাব্য বৃন্দাবন দাসের পরে লিখিত।

কাব্য পরিচিতি: লোচন দাসের কাব্যখানি মঙ্গলজাতীয় রচনা এবং পাঁচালীর ঢঙে সুরতাল সহযোগে গানকরার উদ্দেশ্যে রচিত। কাব্য মধ্যে প্রচুর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। বৈষ্ণব সমাজে ও পদাবলী সাহিত্যে কবি সুপরিচিত। 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'র আদর্শে লোচন দাস কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর কাব্যেই একমাত্র শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ-তাঁর গৃহত্যাগে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ অংশটি করুণ রসে ভরা। এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হোল:

নিমাই-এর সন্ন্যাস-সংবাদে শোকবিহ্বল বিষ্ণুপ্রিয়া-
চরণ কমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারিয়ে কাতর নয়ানে।
হিয়ার উপরে খুইয়া বাঁধে ভুজলতা দিয়া
প্রিয় প্রাণ নাথের চরণে।।

এবং শচীমাতা কান্নায় ভেঙে পরে বলেন,

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও।।

-শোক বিধুরা শচীদেবী এখানে যেন চিরন্তন মায়ের প্রতীক। তিনিই একমাত্র শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব প্রসঙ্গে জগন্নাথ-দেহে লীন হবার কথা উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

লোচনের গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান জনশ্রুতিনির্ভর। বৃন্দাবন দাসের মতো তিনি তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন না-তবে 'চৈতন্যমঙ্গলে' লোচন দাসের কবি প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল': জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যখানি বৃন্দাবন দাসের পরে লেখা। গবেষকদের ধারণা এটি ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ের রচনা। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সমাজে এর প্রভাব বা প্রচলন ব্যাপক ছিল না।

কবি পরিচিতি: বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে রোদমা দেবীর গর্ভে কবির জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি

মিশ্র পরম চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। জানা যায়, পুরী থেকে ফেরার পথে চৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের বাড়িতে কয়েকদিন কাটান-যদিও কবি তখন শিশুমাত্র। বাল্যকালে কবির নাম ছিল 'ওইয়া', চৈতন্যদেবই নাম পাল্টিয়ে রাখেন-'জয়ানন্দ'।

কাব্য-পরিচিতি: জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যখানিও লোচন দাসের কাব্যের মতই পাঁচালীরূপে গীত হতো। কবির রচনায় কবিত্বের অভাব থাকলেও, পালাগানের ধরনেই গ্রন্থখানির বিশিষ্টতা। অন্যান্য চৈতন্য-জীবনচরিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের তিরোধানের ব্যাপারটি অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছন্ন থাকলেও জয়ানন্দের গ্রন্থ থেকে জানা যায়-জগন্নাথের রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে পায়ে ইটের টুকরো ঢুকে যায়-তা থেকে ক্ষত সৃষ্টি-পরিণামে 'দেহান্ত'। অবশ্য বৈষ্ণব-সমাজ, কবির এই বৃত্তান্ত প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি।

৯টি খণ্ডে কাব্যখানি সমাপ্ত। মূলত গানের রীতিতে- জনসাধারণের জন্যই লিখিত। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতের তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতিমূলক নানা তথ্যের মিশ্রণে কাব্য রচিত। গ্রন্থখানিতে চটকদার কিছু কিছু বর্ণনা থাকলেও তাতে ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে জনশ্রুতির আধা-সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

৮.১১. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন:

- চৈতন্যদেবের আগমন কোন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশে সম্ভবপর হয়েছিল?
- বাংলার মধ্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিকে জীবনকথা ও তত্ত্ববাদের সার্থক সমন্বয়রূপে কতদূর গ্রহণ করা যায়?
- চৈতন্যজীবনীকার হিসাবে বৃন্দাবন দাসের বৈশিষ্ট্য কী ছিল?
- বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে বৃন্দাবন দাসের স্থান নির্ণয় করুন।
- সুগভীর দার্শনিক বক্তব্য নিপুণ কবিত্বের রসায়নে কতখানি মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে 'চৈতন্যকরিতামৃত' তার উদাহরণ আলোচনা করুন।
- চৈতন্যবিষয়ক জীবনীকাব্যগুলি অবলম্বনে সমকালীন সমাজের যে রূপ পাওয়া যায়, তার বিবরণ দিন।
- 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' চৈতন্যজীবন বর্ণনা ও উপস্থাপনের দিক থেকে এই দুই মহাগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির ভূমিকা কী ছিল?
- জয়ানন্দ এবং লোচনদাসের চৈতন্যজীবনীর বিশিষ্টতা কী?
- টীকা রচনা করুন: চৈতন্যদেবের সংস্কৃত জীবনী।

- 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- বাংলায় লেখা শ্রেষ্ঠ জীবনীকাব্য হিসেবে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকে অভিহিত করার কারণ কী?

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

- চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম কী?
- চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষরা কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?
- চৈতন্যদেবের নাম 'নিমাই কে রাখেন?
- চৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু সাল উল্লেখ করুন।
- দবির খাস ও সাকর মল্লিক কোন নামে অধিক পরিচিত?
- চৈতন্যদেব নীলাচলে কত বছর অবস্থান করেন?
- চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু কে?
- চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থ কোনটি?
- চৈতন্যদেবের প্রথম বাংলা জীবনীগ্রন্থ কোনটি?
- 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' কাকে বলা হয়?
- 'চৈতন্যভাগবত'-এর প্রথম নাম কী ছিল?
- কোন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে 'গৌরনাগরী' ভাবের প্রকাশ লক্ষ করা যায়?
- 'চৈতন্যচরিতামৃত' কোথায় বসে লেখা হয়?
- কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত দুটি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম লিখুন।

৮.১২. গ্রন্থপঞ্জি

- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), সুকুমার সেন।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধায়।
- বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- বৈষ্ণব রস প্রকাশ, ক্ষুদিরাম দাস।
- শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, বিমানবিহারী মজুমদার।
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যায়।
- বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ভূদেব চৌধুরী।

- বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, সত্যবতী গিরি।
- বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য।
- মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু।
- চণ্ডীদাস কবিব্যক্তিত্ব ও কাব্যশিল্প, অমরেন্দ্র গণাই।

মডিউল-৩

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (মধ্যযুগ: দ্বিতীয় পর্ব)

একক ৯ ❐ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, বিকাশ এবং সাধারণ পরিচয়: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল

৯.১. উদ্দেশ্য
৯.২. প্রস্তাবনা
৯.৩. মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব
৯.৪. মঙ্গলকাব্যের নামকরণ
৯.৫. মঙ্গলকাব্যের বিকাশ
৯.৬. বিশ্লেষণ
৯.৭. মনসামঙ্গল: মনসার উদ্ভব ও কাব্যকথা
৯.৮. মনসামঙ্গলের কবি
৯.৯. মনসামঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ
৯.১০. চণ্ডীমঙ্গল: কাব্য-পরিচয়
৯.১১. চণ্ডীমঙ্গলের কবি
৯.১২. চণ্ডীমঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ
৯.১৩. ধর্মমঙ্গল: কাব্য-পরিচয়
৯.১৪. ধর্মমঙ্গলের কবি
৯.১৫. ধর্মমঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ
৯.১৬. ভারতচন্দ্র রায়: কবিজীবন
৯.১৭. অন্নদামঙ্গল: কাব্য-কাহিনি
৯.১৮. ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি
৯.১৯. অন্নদামঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ
৯.২০. অনুশীলনী

৯.১. উদ্দেশ্য

মঙ্গলকার রচনার দীর্ঘ ইতিহাস ও কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্যের ক্রম পরিবর্তনের ধারা এখানে চিহ্নিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার নানা কারণ ও ব্যাখ্যা জানতে পারবেন। তিনটি মঙ্গলকাব্যের

সমাজচিত্র সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে। সেই সঙ্গে এই কাব্যসমূহ রচনার বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক কারণ, ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। পুরাণের সঙ্গে লোকসাহিত্যের যে মেলবন্ধন মঙ্গলকাব্যে ঘটেছিল তার নানা তথ্য শিক্ষার্থীদের জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

পাশাপাশি মঙ্গলকাব্য ধারার চার বিশিষ্ট কাব্য মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার বৈশিষ্ট ও সামাজিক কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা এই একক থেকে পাওয়া যাবে। চারটি মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং কাব্যের কবি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কাব্য চারটির সমাজচিত্র, কাব্য রচনার ধর্মীয় ও সাহিত্যিক কারণ, রাজনৈতিক পটভূমি, পুরাণের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষার্থীকে জানানো এই এককের উদ্দেশ্য।

৯.২. প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ধারার ইতিহাস পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চার'শ বছর। প্রধান চারটি মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল- এই চারটি ধারায় মঙ্গলকাব্যের জগৎ সমৃদ্ধ। এই সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। পুরাণের আদর্শে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐতিহাসিক নানা বিষয়ের সঙ্গে লৌকিক বিভিন্ন কাহিনির মেলবন্ধনও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানকার দেব-দেবীরা দেবত্বের আবরণে গড়া হলেও তাদের মধ্যে রক্তমাংসের মানবিক রূপ কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের বাস্তব জীবন চিত্রে মঙ্গলকাব্যগুলি সমৃদ্ধ।

চৈতন্য পূর্বযুগে মনসামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। এই কাব্যের রচয়িতার সংখ্যা বেশি। তুর্কী বিজয়ের পরে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয়-তা থেকে মুক্তি পেতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির মেলবন্ধন তৈরির চেষ্টা হয়। এর ফলে অনার্য এবং লোকায়ত দেব-দেবীরা সমাজে সমাদর পেতে শুরু করে। মনসা, ধর্মঠাকুর এভাবে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। পুরাণের আদর্শ রচিত এইসব মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐতিহাসিক নানা বিষয়, লৌকিক ব্রতকথা, বাঙালির বহির্বাণিজ্য এবং যুদ্ধাদির বর্ণনাও আছে। বাংলাদেশের বাস্তব জীবনচিত্রে এইসব মঙ্গলকাব্যগুলি সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের অন্যতম কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। তুর্কী বিজয়ের বিপর্যয়ের ফল স্বরূপ এর সৃষ্টি। চন্ডী ও পার্বতীর মিলন ঘটেছে এখানে। তবে অনার্য চণ্ডী ব্যাধজীবনের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে অনার্য দেব-দেবীরা সমাজে সমাদর পেতে শুরু করে। কালকেতু ও ফুল্লরা এখানে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। চণ্ডীদেবী অনার্য হলেও উচ্চসমাজে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের স্মরণীয় কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্তের নির্দেশ করেন। অবক্ষয়ী যুগে তাঁর সৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দিতে পেরেছে। বাংলাদেশের বাস্তব জীবনচিত্র এইসব মঙ্গলকাব্যগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

৯.৩. মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব

বাংলা কাব্যের পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ এই চার শতাব্দীর ইতিহাসের সমাজ, মানুষ, ধর্ম, সাহিত্যচর্চা, রুচিবোধ ইত্যাদি বিধৃত হয়ে আছে এই সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম রামগতি ন্যায়রত্ন মঙ্গলকাব্যের নাম না করলেও এর কবিদের নাম করেছেন। এরপর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মঙ্গল কাব্যশাখার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

মনে করা হয়, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্য পূর্ণরূপ পেলেও ব্রতকথা, পাঁচালি লোকগান ইত্যাদি আকারে মঙ্গলকাব্যের বীজ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই ছিল। তুর্কী আক্রমণ এবং বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবলুপ্তি, মানুষের মনে ভয় অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং দেবতার অনুগ্রহ দ্বারা দুরবস্থা থেকে মুক্তির চেষ্টা থেকেই সদ্য ফলদাত্রী দেব-দেবীদের প্রতি বিশেষভাবে বিশ্বাসের জন্ম হয়। প্রথমে নিম্নবর্ণের দ্বারা পূজিত হলেও ধর্ম, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতারা উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন। অবশ্য ধর্মঠাকুর বহুকালই ব্রাত্য থেকে যান। উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকের আচার-অনুষ্ঠানের কাছাকাছি আসায় তাদের মধ্যে মিলন-মিশ্রণ ঘটল। লোকবিশ্বাসের আধারের উপর পূর্বের পৌরাণিক দেবদেবীর স্মৃতি, বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক কল্পনা এবং সমকালীন সমাজের চিত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠল মঙ্গলকাব্য। 'বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ যে কিভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।' রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুসারে সামাজিক অনিশ্চয়তা ও দোলাচলের কালে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে দেবদেবীরা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিলেন এবং বিনা দোষে দয়া করা বা নিগ্রহ করার দ্বারা তাঁদের শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। 'রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরম আদর্শ।' (রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

৯.৪. মঙ্গলকাব্যের নামকরণ

'মঙ্গলকাব্য' শব্দটির অর্থ ও উৎস নিয়ে অনেক মত প্রচলিত আছে। প্রাচীন ভারতে 'মঙ্গল' নামে একটি রাগ প্রচলিত ছিল-মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গলরাগে গীত হত। 'মঙ্গল' দ্রাবিড় শব্দ-এর অর্থ গমন বা যাওয়া। মঙ্গলকাব্যগুলি নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে গীত হত। আবার এগুলি অষ্টমঙ্গলা নামেও পরিচিত ছিল। মঙ্গলবার থেকে মঙ্গলবার আটদিন ধরে গীত হত বলেও 'মঙ্গল' কথাটি আসা সম্ভব। পূর্ববঙ্গে রাত জেগে গান গাওয়া হত বলে এগুলি 'রয়ানী' নামে বেশি পরিচিত। 'চৈতন্য ভাগবতের' পূর্ব থেকেই 'মঙ্গল' শব্দটির প্রয়োগ ছিল, যেমন 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। আবার 'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল'। 'গীতগোবিন্দে এর প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়-'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি'। যাই হোক, এই কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে বা ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয় এই প্রচলিত মত বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্য রচনায় কবিদের উৎসাহিত করেছিল।

৯.৫. মঙ্গলকাব্যের বিকাশ

প্রথমে একেবারে অনার্য মূল থেকে জাত হলেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ব্রতকথাগুলির উপর হিন্দুত্বের বা পৌরাণিক মাহাত্ম্যের প্রভাব পড়তে থাকে। অবশ্যই চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্য পূর্বতন ধারাকে বজায় রেখেও পরিশীলিত হয়ে ওঠে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দিষ্ট বিষয় দেবতার মাহাত্ম কীর্তন। কিন্তু মানব-সম্পৃক্তি ছাড়া কিছুই হয় না, তাই প্রথমে দেবতা পরে মানুষ। পুরাণ-আশ্রয়ী দেবলীলার কথা নিয়ে 'দেবখণ্ড' ও মানুষের জীবনে দেবতারা অপ্রত্যাশিত করুণা নিয়ে 'নরখণ্ড'। স্বর্গের কোনো দেব বা দেবী নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে স্বর্গের কোনো দেবপুত্রকে বা অপ্সরা বা নর্তক-নর্তকীকে অভিশাপ দিয়ে মর্তে প্রেরণ করেছেন। তারা জন্ম নিয়েই নিজের অতীত ভুলে গেছে, পরে হঠাৎই বা স্বপ্নাদেশ পেয়ে বা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিয়ে যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করা কবির উদ্দিষ্ট তার কাছে নতজানু হয়েছে-তার পূজা প্রচার করেছে। কাব্যগুলিতে দেবচরিত্রের একরোখা স্বভাব, ক্ষমাহীনতা, দুর্বল মানুষের উপর নানাপ্রকার পরীক্ষার ছলে অত্যাচার নিশ্চয়ই তাদের দেবমহিমাকে উজ্জ্বল করেনি বরং তাদের পৌরাণিক মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

সব মঙ্গলকাব্যেরই কিছু সাধারণ বর্ণনা আছে। গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি এবং দেবস্থানীয়দের শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মলাভ। এরপর নরখণ্ডে বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা, পাকপ্রণালী বর্ণনা, বিবাহ আচার, বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তি সদাগরের সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি মোটামুটি সব মঙ্গলকাব্যেই আছে।

মঙ্গলকাব্যে রাজা বা রাজবংশের স্থানে সাধারণ মানুষের প্রাধান্য অনেকটাই বেশি। তাদের প্রত্যাশ্যা, দুঃখ-বেদনা কবিদের কাছে মর্যাদা লাভ করেছে। কালকেতু-ফুল্লরার প্রাত্যহিক অভাব দূরীকরণ, লহনা-খুল্লনার স্বামীপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা, সনকার স-পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে সংসার-যাত্রার অভিলাষ কবির দৃষ্টিতে জীবন্ত।

'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের এই তিনটি মূল শ্রেণী ছাড়াও আরও বহু মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যে আছে যেমন, চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়াও 'গঙ্গামঙ্গল', 'শিবায়ন' ইত্যাদি তো আছেই। জীবনী, ব্রতকথা, পাঁচালি, লৌকিক কাহিনিই এর আশ্রয়। পরে এতে মিশেছে পৌরাণিক উপকরণ। সমকালীন দোলাচলতা ও বিশ্বাসহীনতা থেকে জাত এই কাব্যধারা প্রতিভাবান কবিদের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে অমূল্য জাতীয় সম্পদ যার শেষ দৃষ্টান্ত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।

৯.৬. বিশ্লেষণ

সংস্কৃত আখ্যান কাব্যের স্মৃতি থেকেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাংলা আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। কবিরা বেশিরভাগই ছিলেন সুপণ্ডিত। সংস্কৃত শাস্ত্র ও পুরাণে স্নাত। তাই লৌকিক কাহিনি ও ব্রতকথাকে কাব্যের স্তরে উন্নীত করতে গিয়ে পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু তৎকালীন ধর্ম, মানুষ ও সমাজ অনায়াসেই তাঁদের রচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। যদিও একই বিষয় নিয়ে বহু কবি কাব্যরচনা করেছেন-যা 'মঙ্গলকাব্যের পুচ্ছগ্রাহিতা' বলে অভিহিত, তা সত্ত্বেও তাঁদের বেশ কিছু মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেশ কিছু বহুমূল্য চরিত্র 'চণ্ডীমঙ্গলে'র মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, মনসামঙ্গলের গোদা, অন্নদামঙ্গলের

হীরা মালিনী বা ঈশ্বরী পাটানি, ‘ধর্মমঙ্গলের’ কালু ডোম ও লখাই ডোমনী, পাঠকচিত্তে তাদের মৌলিকতা নিয়ে অমর। চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও কাব্যকে যেভাবে রুচিশীল করে তুলেছে, তাও লক্ষনীয়।

অবশ্যই বহু গতানুগতিক বর্ণনা আমাদের ক্লান্ত করে। যেমন, পশুপাখির নামের তালিকা, খাদ্যদ্রব্যের তালিকা, বিভিন্ন যৌতুক দ্রব্যের তালিকা, দেবদেবীর নামের তালিকা ইত্যাদি। আবার তৎকালীন মানুষের সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও এই আচার অনুষ্ঠানের তালিকা থেকে পাওয়া যায় যা অত্যন্ত মূল্যবান।

অনেকে মঙ্গলকাব্যের চরিত্র, পটভূমি, গ্রন্থশেষের সমীকরণের মধ্যে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি খুঁজেছেন-হয়তো সেটা সম্ভবতও ছিল কিন্তু সমকালীন সমাজকে তৃপ্ত করতে গিয়ে, তুচ্ছ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিয়ে যে ব্যাপ্তি এবং বিশালতা মহাকাব্যের বিশেষ আবহ মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় তার প্রকাশ ঘটেনি, চারশত বছরের কাব্যেতিহাস সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্মের পরিবর্তন ও প্রবহমানতার একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবেই এগুলি সার্থক হয়ে আছে।

৯.৭. মনসামঙ্গল: মনসার উদ্ভব ও কাব্যকথা

মঙ্গলকাব্যের মূল তিনটি ধারার মধ্যে প্রথম মনসামঙ্গলই পূর্ণ সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে। চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে-‘দন্তকরি বিষহরি পুজে কোন জনে।’ অর্থাৎ তখনই মনসা উচ্চ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হয়েছেন। ড. সুকুমার সেনের মতে দেবী ভাবনায় ঋগ্বেদের সময় থেকেই মনসার অস্তিত্ব ছিল। তিনি মায়ুরী। বৌদ্ধ মহাযান মতেও ইনি ‘বিষনাশের আরোগ্যের এবং বিদ্যার দেবতা।’ এঁর আর একটি নাম জাগুলি। মনসামঙ্গলের প্রাচীনকবি বিপ্রদাস ‘জাগুলি’ নামের লোক ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন-‘জাগিয়া জাগুলি নাম সিজবৃক্ষে স্থিতি।’ আবার মনসাকে ‘চেঙ্গমুড়ি কানি’ও বলা হয়েছে।

মনসামঙ্গল আটদিন ধরে গাওয়া হত। সাধারণত সারারাত পালাগান হত বলে একে ‘জাগরণ’ বা ‘রয়ানী’ও বলা হত। মহাভারতে নাগজাতি ও জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহের উল্লেখ আছে। এঁদের সন্তান আস্তীক জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পকুলকে রক্ষা করেন। মনসাকে মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে যথা, পদ্মাবতী, কেতকা, বিষহরী, জরৎকারু ইত্যাদি। ‘মনসা’ নামের উৎস হিসাবে বলা হয়েছে কশ্যপ ঋষির মন থেকে সৃষ্ট, তাই ‘মনসা’। আবার কেউ দক্ষিণ ভারতে ‘মঞ্চাম্মা’ থেকে এই নাম এসেছে বলে মনে করেন। যাই হোক ড. সুকুমার সেনের মতে, ‘আদি দেব নিরঞ্জনের কামবাসনোদ্ভূত সর্পরাজ্ঞী মনসার সঙ্গে পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যা ও সিজবৃক্ষ পূজার সংযোগের ফলে পাঁচালি কাব্যের মনসা সৃষ্ট হইয়াছে।’ ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, কৌম সমাজে সাপ প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে পূজিত এবং সর্পদেবী মনসার কোলে একটি ফল বা পূর্ণ সাপের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। মোটামুটি পাল যুগ থেকে এই দেবী ক্রম-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অবশ্য মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে শিবের কন্যা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের নানাস্থানে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলির চলিত নাম মনসামঙ্গল এবং পূর্ববঙ্গে পদ্মাপুরাণ। ড. সুকুমার সেন অঞ্চলভেদে এদের চারটি শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

১। রাঢ়ের মনসামঙ্গল-কবি বিষ্ণু পাল, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র ও বাণেশ্বর রায়।

২। পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ-কবি: নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বংশী দাস ও ষষ্ঠীবর।

৩। উত্তরবঙ্গ বা কামরূপের মনসামঙ্গল-কবি তন্দ্রবিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল, মনকর, দুর্গাবর ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র।

৪। বিহারী মনসামঙ্গল-কাহিনি ও ব্রত আকারে পাওয়া গেলেও এর কোনো কবির নাম পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন স্থানের মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও কাহিনি মোটামুটি এইরকম, প্রথমে দেবখণ্ড-মনসার জনম থেকে পূজা প্রচারের কাহিনি। কাহিনিটি এইরকম, শিবের কন্যা মনসার পদ্মবনে জন্ম হলে শিব তাঁকে চণ্ডীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু ধরা পড়ে যান। চণ্ডী ও মনসার কলহের সময় চণ্ডী মনসার একটি চোখ কানা করে দেন। মনসার বিষে চণ্ডী মূর্ছিত হলে মনসা আবার তাঁর চেতনা ফিরিয়ে দেন। সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষপান করে মহাদেব অচৈতন্য হলে মনসা তাঁকে সুস্থ করেন। চণ্ডীর সঙ্গে তাঁর বিবাহের ফলে পদ্মাবতী জয়ন্তীতে পুরী নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়, এবং আস্তীকের জন্ম হয়। এই পর্যন্ত দেবখণ্ড।

নরখণ্ড মনসার মর্তে পূজা প্রচারের কাহিনি। এই কাহিনির কেন্দ্রে আছেন চম্পকনগরের শিবভক্ত বণিক চাঁদ সদাগর। সে পূর্বজন্মে দেবলোকে ছিল এবং মনসার দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়েছিল। কিছুতেই শিবভক্ত চাঁদ সদাগরকে নিজ পূজা করাতে না পেরে মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলেন, চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী ও শঙ্কর গারুড়ীকে হত্যা করলেন, চাঁদের বাগান ধ্বংস করলেন, চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করলেন। চাঁদ বাণিজ্যে গেলে তার চৌদ্দডিঙা ডুবিয়ে দিলেন, চাঁদ পদ্মবনে আশ্রয় নিল না কারণ মনসার নাম পদ্মা। ইতিমধ্যে চাঁদের শেষ সন্তানের জন্ম হয়েছে, নাম লক্ষ্মীন্দর। চাঁদ মুমূর্ষ অবস্থায় ফিরে এসে পুত্রমুখ দেখল। পুত্রের বিবাহ দিল উজানি নগরের শাহবেনের কন্যা রূপবতী বেহুলার সঙ্গে। মনসার ষড়যন্ত্রে বিবাহ রাত্রিতে লোহার বাসর ঘরে চাঁদকে সাপে কাটল। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা ভেসে গেল দেবলোকের উদ্দেশে। অনেক বিপদ পার হয়ে দেবলোকে পৌঁছে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করে স্বামী ও ছয় ভাসুরকে বাঁচিয়ে নিয়ে চাঁদ বণিকের চৌদ্দ ডিঙা উদ্ধার করে বেহুলা দেশে ফিরে এল-মনসাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবে, নইলে সব নষ্ট হবে। সকলে অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর চাঁদ পিছন ফিরে বাঁ হাতে মনসাকে একটি ফুল দিতে স্বীকৃত হল। অগত্যা মনসাকে তাতেই রাজি হতে হয়। মর্তে মনসার পূজা প্রচলিত হল। স্বর্গের শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব উষা ও অনিরুদ্ধ অর্থাৎ বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর-সশরীরে স্বর্গে গেল।

৯.৮. মনসামঙ্গলের কবি

কানা হরিদত্ত- মনসামঙ্গলের কবি বিয়গুপ্ত এই কবি সম্পর্কে একটি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন-

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।

মনে করা হয়, খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হরিদত্তের গীত লুপ্ত হয়ে যায়। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, 'কানা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেন।' ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বিজয় গুপ্ত যেভাবে কানা হরিদত্তর পদ উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তা আদৌ লুপ্ত হয়নি। যাই হোক, হরিদত্তই মনসামঙ্গলের সর্বস্বীকৃত প্রথম কবি।

নারায়ণ দেব- মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণ দেব। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু উল্লেখ করেননি। কিন্তু তাঁর উত্তরপুরুষ এখনো বর্তমান। সেই বিচারে তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা হয়েছে। রাঢ় থেকে এসে তাঁর পূর্বপুরুষ মৈমনসিংহ জেলার কিশোর গঞ্জ মহকুমার অধীন বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। শুধু বাংলায় নয়, আসামেও নারায়ণ দেবের কাব্য বহুল প্রচার লাভ করেছিল। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, নারায়ণ দেবের একটি উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। মঙ্গলকাব্যের মূল নীতি অনুসারে নিজের কাব্যকে তিনি দেবী পদ্মার স্বপ্নাদেশজাত বলেছেন। কাব্যের পৌরাণিক অংশের ক্ষেত্রে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শ মান্য করেছেন কারণ তাঁর সামনে অন্য আদর্শ ছিল না।

নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মবিরণী ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যান ও তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনি বলা হয়েছে। নারায়ণ দেবের দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তার বেশি এবং এ বিষয়ে তিনি শৈবপুরাণ ও সংস্কৃতি কাব্যের উপর নির্ভরশীল।

সুকবি নারায়ণ দেবের তৃতীয় খণ্ড করুণরসের স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায় সবচেয়ে উজ্জ্বল। বাঁ হাতে ফুল ফেলে দেওয়া চাঁদের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেহুলার প্রত্যাবর্তন ও স্বর্গে গমন নারায়ণ দেবের কাব্যে একটি রূপকের আকার নিয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে কিছু অশ্লীলতা থাকলেও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একে বাড়াবাড়ি বলা যায় না। করুণরস ও হাস্যরসে নারায়ণ দেবের সমপরিমাণ দক্ষতা ছিল। তাঁর কয়েকটি ব্যঙ্গোক্তি প্রায় প্রবাদের রূপ লাভ করেছে। যেমন,

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
বা
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার। -ইত্যাদি

পরবর্তী বহু কবি নারায়ণ দেবের অনুসরণ করেছেন। নারায়ণ দেবের আসামে প্রাপ্ত পুঁথিতে স্থানীয় ও কালগত কারণে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহু পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাপ্ত সব পুঁথিতেই বেশ কিছু প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে গবেষকদের অনুমান।

বিজয় গুপ্ত- বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রচারই সর্বাধিক। এঁর পুঁথির সংখ্যা বেশি নয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কাব্য রচনার সাল তারিখ স্পষ্টভাবে বলা আছে। বহু স্থানের নাম ও বিবরণ আছে। কবির তথ্যানুযায়ী ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। গৈলা ফুল্লশ্রী বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। তাঁদের বৈদ্য বংশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এখনও

অক্ষুণ্ণ। গবেষকদের অনুমান বিজয় গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং কাব্যরচনা করেন। কালনির্ণায়ক শ্লোকটিতে একটু ভুল ছিল।

পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের কবিখ্যাতি সর্বাধিক ছিল। পুঁথি বেশি না পাওয়া গেলেও এগুলির অনেক অনুলিপি তৈরি হয়েছিল ফলে পাঠভেদও স্বাভাবিক। প্রাক-চৈতন্য সমাজের যে অকৃত্রিম বাস্তব চিত্র তা বিজয় গুপ্তের রচনায় আছে। এঁর কাব্যে করুণরসের স্থান খুব সংক্ষিপ্ত। কেবল সনকার পুত্রের মৃত্যুর বর্ণনায় তা মনকে স্পর্শ করে। সনকাই একমাত্র চরিত্র যা অত্যন্ত বাস্তব এবং সর্বোৎকৃষ্ট। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'একদিকে মনসার হৃদয়হীনতা এবং অন্যদিকে সনকার একান্ত স্নেহশীলতা এই উভয়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া বিজয় গুপ্তের কাহিনি উচ্চাঙ্গের কাব্যরস সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।' হাস্যরসের ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় অশ্লীলতার প্রাধান্য আছে। এই কাব্যে দেবাদিদেব মহাদেবের মহিমা একেবারেই ধূল্যবলুণ্ঠিত। অন্য কোনো দেবতারও কোনো দেবোচিত গুণ নেই। মনসার প্রতিশোধস্পৃহা ও কলহ পরায়ণতা তাকে আরও রুক্ষ করে তুলেছে। ছন্দের ক্ষেত্রে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়াও লাচাড়ী ও একাবলী ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এটিকে ভারতচন্দ্রের পূর্বসূরিত্ব বলা যেতে পারে। ব্যাজস্তুতি অলংকারের ক্ষেত্রেও তাই। বিজয় গুপ্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন তাই পুরাণকথায় তাঁকে খুবই স্বচ্ছন্দ দেখা যায়। বিজয় গুপ্ত মনসার ভক্ত ছিলেন কিন্তু বহুস্থানে তাঁর কাব্য বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'চরিত্র চিত্রণ, কাহিনির বয়ন-কৌশল, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি খুঁটিয়া দেখিলে নারায়ণ দেবকেই উৎকৃষ্টতর মনে হইবে।' বিজয়গুপ্ত পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কবি হলেও গবেষকদের মতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তাঁকে দেওয়া যায় না।

বিপ্রদাস পিপিলাই- বিপ্রদাস পিপিলাইকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম মনসামঙ্গল রচয়িতা বলা যেতে পারে। তাঁর মনসামঙ্গল রচনার স্পষ্ট কালনির্ণয় পাওয়া গেছে। ড. সুকুমার সেনের মতে ১৪৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য লেখা হয়েছিল। বিপ্রদাস এই কাব্যকে একবার 'মনসাবিজয়' বলেছেন আবার 'মনসাচরিত'ও বলেছেন। বসিরহাটের অন্তর্গত বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। কলকাতার এত কাছে হলেও ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগে তাঁর সম্পর্কে কারও কিছু জানা ছিল না। দত্তপুকুর থেকে তাঁর তিনটি পুঁথি পাওয়া গেছে সবগুলিই খণ্ডিত। ভাষা ও রচনাভঙ্গি অর্বাচীনকালের। কলকাতা ও কাছাকাছি যে স্থানগুলির উল্লেখ আছে যেমন নিমাইতীর্থ, শ্রীপাট খড়দহ সবই আধুনিক। স্পষ্টতঃই কাব্যটিতে বহু প্রক্ষেপ ঘটেছে।

বিপ্রদাসের হাসেন-হুসেন পালা দীর্ঘতর ও সুপরিকল্পিত। মুসলিম সমাজের চিত্র এখানে খুব বাস্তব। মনসা চরিত্রে স্নেহ-মমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বিপ্রদাস যা অন্য কবির কাব্যে নেই। হাস্যরস বিপ্রদাসের কাব্যে বিরল, নরনারী চরিত্র গতানুগতিক। যে অনমনীয় চাঁদ সদাগর মনসাঙ্গল কাব্যের সম্পদ বিপ্রদাসের রচনায় চাঁদের সেই মাহাত্ম্য নেই। চাঁদ সদাগর মনসাকে নিজের মাথায় পদাঘাত করতে বলেছেন এবং মনসা, 'হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদের মস্তকে।' কিছু অভিনবত্ব থাকলে বিপ্রদাসকে খুব বড় কবি বলা যায় না।

তন্ত্রবিভূতি- মালদহ জেলা থেকে ড. আশুতোষ দাস একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন, কবির নাম তন্ত্রবিভূতি। ইনি আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ইনি তান্ত্রিক ছিলেন বলে বিভূতি নামের সঙ্গে 'তন্ত্র' যোগ হয়েছে। এঁর কাব্যের নাম 'মনসাপুরাণ' কিন্তু উত্তরবঙ্গের এটি তন্ত্রবিভূতি নামেই পরিচিত।

উত্তরবঙ্গের অনেক কবি তন্ত্রবিভূতির দ্বারা শুধু প্রভাবিত হন নি, কাব্যের অনেক অংশ আত্মসাৎ করেছেন। যেমন, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র প্রমুখ কবিরা। তন্ত্রবিভূতির কাহিনির বয়নে, রূপবর্ণনা ও করুণরসের বর্ণনায় নৈপুণ্য ছিল। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী স্বপ্নাদেশ, দেবখণ্ড ইত্যাদি রচিত। জরৎকারুর বিবাহে উপঢৌকন দানে তালিকায় সমাজ-জীবনের প্রতিফলন আছে। কল্পনা ও মানবীয় সহানুভূতির জন্য তাঁকে একজন উচ্চ পর্যায়ের কবি বলা যেতে পারে।

জগজ্জীবন ঘোষাল- উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোচ-আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবন ঘোষালের বাস ছিল। কবির পিতার নাম রূপ, মাতার নাম রেবতী। এঁর রচনায় ক্ষেমানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় সুতরাং ধরে নিতে হয় ইনি ক্ষেমানন্দর পরবর্তী কবি। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত। 'দেবখণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'। এগুলি সম্পূর্ণই পাওয়া গেছে। কাহিনি বয়নে ইনি কিছু আলাদা। 'বণিক খণ্ডে' ইনি তন্ত্রবিভূতিকে অনুসরণ করেছেন। কাব্যটিতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব আছে। জগজ্জীবনের ধর্মমঙ্গলের প্রভাব আছে। জগজ্জীবনের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় 'শূন্যপুরাণ' ও নাথ সাহিত্যের সঙ্গে মিল আছে। আদিরস ও অলংককরণের বাড়াবাড়ি এই কাব্যে আছে।

দ্বিজ বংশীদাস- মনসামঙ্গলের জনপ্রিয় কবি 'দ্বিজ বশীদাস' মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানটি নায়ারণদেবের জন্মস্থানের কাছাকাছি। বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে দেখা যায়, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন। মনে হয়, কাল নির্ণায়ক শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে কোনো সময়ে কাব্যটির রচনা বলে গবেষকদের অনুমান।

জীবিতকালেই বংশীদাসের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মনসা ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। তার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর কন্যা পদ্মাবতী লিখেছেন,

ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।

কথিত আছে, বংশীদাস একবার নরহন্তা দস্যু কেনারামের হাতে পড়েছিলেন এবং তাঁর ভাসান গান শুনে দস্যু তার দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে।

বংশীদাসের কাব্য 'দেবখণ্ড' ও 'মানবখণ্ড' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। কবির ইষ্টদেবতা শিব নন, চণ্ডী। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লক্ষণ কাব্যে স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্থলে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। দেবতাদের পারিবারিক কলহের ক্ষেত্রেও মানবিক আবেদন স্পষ্ট। চাঁদ সদাগরের চরিত্র পরিকল্পনাও অন্য মনসামঙ্গল থেকে ভিন্ন। কাব্যে চাঁদের দৃপ্ত পৌরুষ সুচিত্রিত। কবির পুরাণ জ্ঞান কাব্যে প্রকাশিত। কবি বৈষ্ণব হলেও শাক্তদেবীর বন্দনা করেছেন। অভেদ-কল্পনা তাঁর বৈশিষ্ট্য।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ- কেতকাদাস ক্ষমানন্দ মনসামঙ্গলের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' এতে ক্ষেমানন্দ ব্যতীত আর কোনো পদ্মাপুরাণের পুঁথির নাম করেন নি। সহজেই বোঝা যায়, আর কোনো কবির এতটা পরিচিতি ছিল না। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, পূর্ববঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁর কাব্য 'ক্ষেমানন্দী' নামে পরিচিত ছিল। মনসার আর একটি নাম 'কেতকা'-এজন্য তিনি কেতকাদাস। কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং এক মুসলিম জমিদারের

অধীনে তাঁর পিতা শঙ্কর দাস কাজ করতেন। পরে তাঁরা জমিদার ভারমল্ল খানের আশ্রয়ে এসে থাকেন। সেখানে খড় কাটার সময় এক মুচিনীকে প্রথমে দেখেন তারপর তাকেই সর্পভূষণা রূপে দেখেন। তিনি কেতকাদাসকে কাব্যরচনার আদেশ দেন। আত্মবিবরণীতে কাব্য-রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই, তবে বারা খাঁ নামে একজনের উল্লেখ আছে এবং ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেওয়া একটি দানপত্র পাওয়া গেছে। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি বর্তমান ছিলেন। আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত বিষ্ণু দাস ও ভারমল্ল খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কাব্যটিতে বহু স্থানে চৈতন্যদেবের উল্লেখ আছে এবং কবি মুকুন্দরামের অনুসরণে বহু বর্ণনা আছে।

ক্ষেমানন্দের মতে মনসার জন্ম কেয়াপাতায়। 'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।' এই বর্ণনা আর কোনো কবির রচনায় পাওয়া যায় না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তাঁর ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও বহুলাংশে পূর্বযুগের গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)। চরিত্রচিত্রণে খুব সার্থকতা না থাকলেও মনসার ক্রুর ভয়াল রূপের বর্ণনা সার্থক। কবির কাব্যে আরবী ফার্সি শব্দের ব্যবহারও লক্ষনীয়। ক্ষেমানন্দের চাঁদ সদাগর চরিত্রে দ্বিজ বংশীদাসের অনুকরণ আছে বলে গবেষকরা মনে করেছেন।

এই প্রধান রচয়িতারা ছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, কালিদাস, সীতারাম দাস, জীবন মৈত্র ইত্যাদি কবিরা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীহট্ট জেলার কবি ষষ্ঠীবর দত্ত এখনও সেখানে জনপ্রিয়।

৯.৯. মনসামঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গল ও পরবর্তীকালের মনসামঙ্গলে মনসাচরিত্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ততটা লক্ষনীয় নয়। রুক্ষ, কঠোর স্বার্থপরায়ণ গূঢ় অভিসন্ধিযুক্ত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মনসা প্রায় একইরকম রয়ে গেছেন। হয়তো তাঁর অবহেলিত জীবনকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবিরা তাঁর চরিত্রে এই কঠোরতা এনেছেন। তবু, ভাষা, রুচিবোধ ইত্যাদিতে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের লক্ষণ বেশ কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনির প্রতি কৌতূহল আদ্যন্ত জীবিত করে রাখা মনসামঙ্গলের অন্যতম আকর্ষণ গল্প বলা বা গল্প শোনার চাহিদাও এতে পূরণ হয়েছে যা, লৌকিক অলৌকিকের বাধা না মেনে বহুকাল ধরে শ্রবণপিপাসু মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছে। গল্পরস, নাটকীয়তা, মুহুর্মুহু পটপরির্তন একে ভিন্ন মাত্র দিয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচার উভয় বাংলাতেই ছিল। অন্য কোনো মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগরের মত অনমনীয় মানবচরিত্র আর একটিও নেই। দুর্বল মেরুদণ্ডের বাঙালি জীবনের সাধারণ মাপকাঠিতে তৎকালীন যুগে এতটা প্রতিবাদী চরিত্র নিঃসন্দেহে কাহিনি-পরিকল্পনা ও কবিদের রচনাশক্তির ফসল। সনকার হাহাকার চিরকালীন মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বেহুলার অন্তহীন সমুদ্রযাত্রা যা রূপকের রূপ নিয়েছে, এগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। বাংলার জাতীয় কাব্য বলা না গেলেও এর বলিষ্ঠতা ও চাঁদ সদাগর চরিত্র অনুকরণীয়।

পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের প্রচার বেশি ছিল। রচনাকারের সংখ্যাও বেশি। রোগ, শোক, দুঃখ জর্জরিত বাঙালি-জীবনই মনসামঙ্গলে প্রতিফলিত। মনসামঙ্গল বৃহত্তর জীবন বা আধ্যাত্মিকতার কথা বলে না,

ভক্তিরস বিহ্বলতার মদিরাও এতে নেই কিন্তু মানবীয় জীবনরস এর উপভোগ্যতার কারণ হয়ে উঠেছে।

৯.১০. চণ্ডীমঙ্গল: কাব্য-পরিচয়

বাংলায় চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। উল্লেখ্য, চৈতন্য ভাগবত 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।' দেবী চণ্ডী এবং চণ্ডীপূজার প্রচলন ব্যাপারে বহু তথ্য বহু গবেষক দিয়েছেন। এগুলির ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি বেশ জটিল। কেউ মনে করেন, চণ্ডী ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সংস্কৃতি থেকে জাত, কেউ বা এর মূলে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবতার প্রভাব দেখেছেন। হিন্দুদের দশমহাবিদ্যা বৌদ্ধদের কাছে উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা ইত্যাদি দেবী। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তিও পাঁচটি দেবী। মহাভারতের যুগে দেবীদুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুর-বিনাশিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবীর নামের বিকল্প হিসাবে কুমারী, কালু, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী ইত্যাদি নামও মহাভারতে আছে। প্রাচীন দুর্গামূর্তিগুলিতে অনেক স্থানে দুর্গা ও চণ্ডীর একীকৃত রূপ দেখা যায়। পায়ের তলায় অথবা হাতে দেবী গোধিকা ধারণ করে আছেন এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর আগে থেকে বাংলা দেশে দুর্গা ও চণ্ডীপুজা একীকৃত হয়েছে।

'চণ্ডী শব্দটির উৎস অনার্য, যা পরে সংস্কৃতায়িত হয়েছে। ছোটনাগপুরের ওঁরাও নামক উপজাতির মধ্যে চাণ্ডী নামে এক শক্তিদেবীর পূজা প্রচলিত। ইনি শিকারের এবং বিশেষভাবে অবিবাহিত যুবকদের দেবতা। চাণ্ডী থেকে চণ্ডীর উৎপত্তি সম্ভব। প্রাচীন পুরাণে দুর্গা, উমা, কালিকা ইত্যাদি নাম পাওয়া গেলেও এই নামটি পাওয়া যায়নি। এমনকি 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে'ও নামটি নেই। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি পুরাণে চণ্ডী বা চণ্ডিকার নাম আছে। যেমন দেবী ভাগবত, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' হরিবংশ ইত্যাদিতে। এটি স্পষ্ট, এই দেবী অনার্য সমাজ থেকে ক্রমে উচ্চতর সমাজে উন্নীত হয়েছেন। কেউ কেউ বাশুলী বা গজ লক্ষ্মীকেও চণ্ডীর রূপ বলেছেন। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা পরে মঙ্গলচণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেননি।

চন্ডীর সঙ্গে মঙ্গল শব্দটির যোগ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। 'ব্রহ্মব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বলা হয়েছে 'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষ। সা চ 'মঙ্গলচণ্ডিকা'। যাইহোক, মঙ্গলচণ্ডী মহিলাদের পূজিত দেবী, ঘটে পটে এঁর পূজা হয়। ইনি অবশ্যই শুভ এবং মঙ্গল করেন। চণ্ডীর পূজা প্রচারের ক্ষেত্রে মেয়েদের আচরিত ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না।

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি 'আখেটিক খণ্ড' বা 'বণিক খণ্ড'-কেন এই দুটি পৃথক কাহিনি একত্রিত হল এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর এবং দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতির উপাখ্যান।

'আখেটিক' খণ্ডের পূর্বে যথারীতি 'দেবখণ্ড'- যেখানে হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র ও চণ্ডীর পূজা প্রচারের চেষ্টার কথা আছে। এখানে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে কৌশলে শাপ দিয়ে মর্তে পাঠানো হল। নীলাম্বরও তার পত্নী ছায়া কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে মর্তে বেদের ঘরে জন্ম নিল। কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিবাহ হল। কালকেতু শিকার করে ও ফুল্লরা হাটে সেই মাংস বিক্রয় করে তাদের সাংসারিক জীবন খুব কষ্টেই কাটে একদিন চণ্ডীর ছলনায় কালকেতু একটিও পশু শিকার করতে পারল না-যাওয়ার পথে সে একটি গোধিকা দেখেছিল, তাকেই জালে বন্দী করে ঘরে নিয়ে এল। কালকেতু হাটে গেলে গোকারূপিনী চণ্ডী রূপসী নারীরূপে ফুল্লরার সামনে দেখা দিলেন। ফুল্লরা এই নারী তার সপত্নী হতে পারে ভেবে তাকে

অনেক দুঃখের কথা জানায় এবং সেই নারী তবুও চলে না গেলে সে কালকেতুর কাছে হাটে গিয়ে সব বলে। কালকেতু ঘরে ফিরে সেই নারীকে দেখে কাটতে গেলে তিনি স্বমূর্তি ধারণ করেন এবং সাতখড়া ধন দিয়ে কালকেতুকে গুজরাটে নগর পত্তন করতে বলেন। কালকেতু গুজরাটে নগর পত্তন করল। ভাঁড়ুদত্ত নামক খল চরিত্রকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে সে কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়ে তাকে কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করে। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে। কালকেতুর প্রার্থনায় চণ্ডী কলিঙ্গরাজের রাজ্যে প্রবল বন্যা সৃষ্টি করলেন এবং রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন কালকেতুকে সব ফিরিয়ে দেওয়া জন্য। কালকেতু মুক্তি পেল-চণ্ডীর পূজা প্রচারিত হল। পুত্র, পুষ্পকেতুকে রাজ্য দিয়ে কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গে গমন করল।

বণিক সমাজের প্রধান ধনপতি এই খণ্ডের নায়ক। সে শৈব। এই বণিককে দিয়ে চণ্ডীর পূজা করাতে পারলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হবে। ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনা, সে বন্ধ্যা। লহনার খড়তুতো বোন খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করে। এরপর গৌড়ের রাজা কার্যোপলক্ষে ধনপতিকে বিদেশে পাঠায়। ইতিমধ্যে দুই সপত্নীর মধ্যে দুর্বলা দাসী কলহ সৃষ্টি করে এবং লহনা খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাতে পাঠায়। সেখানে বন্যরমণীদের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করতে দেখে সেও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে। চণ্ডী প্রসন্ন হয়ে লহনাকে আদেশ দেন খুল্লনাকে ফিরিয়ে নিতে। লহনা খুল্লনাকে ঘরে এনে আবার আদর যত্নে রাখতে শুরু করে। ধনপতি 'অসঙ্গত সুখে' মগ্ন থেকে বাড়ির কথা ভুলে ছিল। চণ্ডী স্বপ্নাদেশ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন। খুল্লনা বনে ছাগল চরাত বলে তার সতীত্বের অনেক পরীক্ষা নেওয়া হল। চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার সব কিছুতেই জয় হল।

এরপর ধনপতি গৌড়েশ্বরের আদেশে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করল-খুল্লনা তখন সন্তানসম্ভবা। স্বামীর কল্যাণে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজার আয়োজন করল, কিন্তু শৈব ধনপতি চণ্ডীর পূজা না করে চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ভেঙে দিল। এরপর সে বাণিজ্যযাত্রা করলে সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে তার তরীগুলি ডুবে যায় এবং কালীদহে কমলের উপর অধিষ্ঠাতা এক অপরূপা রমণীকে সে একটি হস্তীকে গ্রাস এবং উদ্গীরণ করতে দেখে। কোনোরকমে সিংহলে পৌঁছে সে রাজাকে এই কাহিনি বললে রাজা তাকে এই দৃশ্য দেখাতে বলে। ধনপতি তা দেখাতে না পারায় কারারুদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে খুল্লনার সন্তান শ্রীমন্তর জন্ম হয় সে বড় হয়ে পিতার সন্ধানে সিংহলে গেল এবং অনুরূপ দৃশ্য দেখে রাজাকে বললে রাজা তাকে এই দৃশ্য দেখাতে বলল। দেখাতে পারলে রাজা তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবে, অন্যথায় তার শিরচ্ছেদ করবে। 'কমলে' কামিনী দেখাতে না পারায় শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সে চণ্ডীর স্তব করে দেবীকে তুষ্ট করল। দেবীর ভুজপ্রতি যুদ্ধ করে রাজার সৈন্যদের হারিয়ে দিল। এবার সিংহলরাজ 'কমলে কামিনী' দর্শন করতে পারল। পথে উজানি নগরের রাজাকেও ঐ কমলে-কামিনী রূপ দেখিয়ে শ্রীমন্ত তার কন্যাকে বিবাহ করল। শাপভ্রষ্ট দেবদেবীরা সবাই স্বর্গে ফিরে গেল।

মনসামঙ্গল কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যেমন একই কাহিনি প্রচারিত হয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তা হয়নি। রাঢ়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গ এই সবকটি জায়গায় কিছু কাহিনিগত ভিন্নতা দেখা যায়। যে কবিদের প্রচেষ্টায় মঙ্গলচণ্ডীর

ব্রত থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার জন্ম সম্ভব হল, তাঁরা হলেন, মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। পরে কয়েকটি নাম পাওয়া গেলেও কাব্যের বিচারে তারা গৌণ।

৯.১১. চণ্ডীমঙ্গলের কবি

মানিক দত্ত- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানিক দত্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন,

মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।।

কাজেই, মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি। কিন্তু তিনি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে কাব্য রচনা করেন নি। যে পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে উল্লেখ আছে-

আইল ফিরিঙ্গি সব বসিল একত্তরে।

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে পুঁথিটি ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত হয়েছিল এবং এর একশো বছর আগে হয়তো এটি রচিত। পুঁথিতে ধর্মমঙ্গলের মত করে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ধনপতির কাহিনিটি মুকুন্দরামের চেয়ে সুপরিকল্পিত। অনুমিত হয়, ইনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ জেলার লোক ছিলেন। এই কবির পরিচিত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল বলে গবেষকরা মনে করেছেন।

দ্বিজ মাধব- দ্বিজ মাধবের পুঁথি ও ব্রতকথা নিয়ে ছোট ছোট পালাগান উত্তরবঙ্গে ও চট্টগ্রামের সুপরিচিত। বরং ঐ সব স্থানে মুকুন্দরাম এত বিখ্যাত নন। পশ্চিমবঙ্গ দ্বিজ মাধবের পরিচিত কম। দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদাচরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। তাঁর সমস্ত পুঁথিতে কাব্যরচনার কাল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ধরে নেওয়া যায় মুকুন্দরামের পূর্বে তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন। কবির জন্মস্থান সপ্তগ্রাম অথবা নবদ্বীপ তা স্থির করা যায় নি। তিনি বলেছেন, তাঁর পিতার নাম পরাশর। মনে করা হয়েছে, মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বের সময় তাঁর পরিবার পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধব আচার্য থেকে দ্বিজ মাধব ভিন্ন। তবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেও অনেকে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিজ মাধব 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র অনুসরণে দেবখণ্ডে মঙ্গলাসুরের বিনাশ দেখিয়েছেন। এইটি অন্য চণ্ডীমঙ্গলে নেই। কালকেতুর কাহিনি খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন ব্রতকথা বা পালাগান হয়, তেমন। একমাত্র ভাঁড়ু দত্ত ছাড়া আর কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে কবির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় নি। তাঁর রচিত লহনা-খুল্লনা চরিত্রও স্পষ্ট নয়। সুশীলার বারমাস্যা গতানুগতিক হলেও অনলঙ্কৃত, সহজ, প্রাণের কথা।

দ্বিজমাধব উচ্চশ্রেণীর কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না। সৃষ্টিনৈপুণ্যের অভাব মেনে নিয়েও বলা যায়, তিনি যে অনেকগুলি বিষ্ণুপদ কাব্যে সংযোজন করেছেন, তা তাঁর ভক্তিপ্রবণ মনের কথা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিসাবে যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তা বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থরচনার কাল হিসাবে ড. সুকুমার সেন মনে করেন, ১৫৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ তাঁর কাব্যরচনার শেষ সীমা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যর মতে '১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোনো সময়ে এই কাব্য-রচনা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।' ড. ক্ষুদিরাম দাসের মতে '১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তিনি কাব্যরচনায় হাত দেন

নি। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মুকুন্দরাম ১৫৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন।' এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে মুকন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁর কাব্যরচনা করেন।

আত্মবিবরণী থেকে দেখা যায়, কয়েক পুরুষ ধরে মুকন্দরামের পরিবার বর্ধমান জেলার দামিন্যা গ্রামে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন কৃষিজীবী। কবিরা শৈব হলেও তাঁর পিতামহ বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। সেই সময় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কবি সপরিবারে দামিন্যা ত্যাগ করলেন। পথে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করলেন। সঙ্গে যে অর্থ ছিল তা ডাকাত কেড়ে নিল। মুড়াই নদী পার হয়ে তাঁরা ডেঙুটিয়া গ্রাম ছেড়ে, দারুকেশ্বর, নারায়ণ, পরাশর, আমোদর নদী পার হয়ে কুচুট্যা নামক স্থানে এলেন। মুকন্দরাম বলছেন সেখানে,

তৈল বিনা কৈলু স্নান করিলু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

এখানে শালুক পোড়া ও শালুক ফুল দিয়ে চণ্ডীর পূজা করে নিদ্রা গেলে দেবী চণ্ডীর কাছে কবি কাব্যরচনার নির্দেশ পেলেন। পরে আরড়া নগরে গিয়ে কবি জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেলেন এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন এবং তার বেশ কিছু পরে 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করলেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনা দুটি পৃথক আখ্যায়িকা নিয়ে সম্পূর্ণ। উপাদানেরর দিক থেকে দেখলে কাহিনি দুটি পৃথক স্তরের। একটিতে সমাজের সবচেয়ে নিচুস্তরের অন্ত্যজ ও দরিদ্র শ্রেণীর নরনারী অন্যদিকে তখনকার অর্থসম্পদ পরিপুষ্ট বণিকের সংসার। এবং পিছনে রয়েছে ধর্ম জাতি বৃত্তিভেদের নিয়ামক জমিদার সম্প্রদায়-এই রাষ্ট্র ও সমাজকে মুকুন্দরাম আমাদের সামনে ছবির মত তুলে ধরেছেন। অন্ত্যজ মানুষেরা সেখানে আজকের মতই ভিন্ন জাতি। তারই মধ্যে গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষে বিভিন্ন জাতির পরিচিতি দিয়েছেন সহৃদয়ভাবে। তাঁদের স্বভাব, জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করেছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন,

বড়ই দানেশ মন্দ না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।

এতে রাষ্ট্রব্যবস্থার অসাম্প্রদায়িকতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যক্তি মুকুন্দরাম এখানে বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। চরিত্র নির্মাণে মুকুন্দরামের দক্ষতা এবং মানবিকতা তাঁকে চরিত্রের গভীরে পৌঁছে দিয়েছে। সপত্নী ভয়ে ভীত ফুল্লরা হাটে গেছে কালকেতুর কাছে বর্ণনা যেমন গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী তেমনি নাটকীয়তায় পূর্ণ। সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল বর্ণনায় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব সবই আছে। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্তের মত জীবন্ত চরিত্রনির্মাণ যে কোনো শিল্পীর পক্ষে গৌরবের।

পরবর্তী কাহিনিতে মুকুন্দরামের সমবেদনা এতটা নেই। ধনপতির চরিত্রে কোনো নৈতিকতা নেই। লহনাকে প্রবোধ দিয়ে খুল্লনাকে বিবাহ করা, শহরে প্রমোদে মত্ত থাকা ইত্যাদি তার চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের পরিচয়। তবু কবিত্ব আছে। লহনা-খুল্লনা সম্পর্ক, দুর্বলা দাসীর প্ররোচনা, খুল্লনার বারমাস্যা, শ্রীমন্তর পিতার প্রতি ভালোবাসা মুকুন্দরাম যথার্থভাবে চিত্রিত করেছেন। মুকুন্দরাম দুঃখের কবি হলেও

দুঃখবাদী নন-ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি শিরোধার্য। দুঃখের নিকষে মুকুন্দরামের সহানুভূতি, হাস্যরস, কৌতুকস্নিগ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আরও উজ্জ্বল। পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রে এই প্রাণরস নেই। নিঃসন্দেহে এই ধারার এবং মঙ্গল কাব্যধারার উজ্জ্বলতম কবি মুকুন্দরাম।

৯.১২. চণ্ডীমঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ

চণ্ডীমঙ্গল কাহিনির উপাদান মনসামঙ্গলের চেয়ে প্রাচীন কিন্তু ব্রতকথা-পাঁচালির স্তর ছাড়িয়ে সর্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠতে তার সময় লেগেছিল। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী নিজ পূজা প্রচারের জন্য অনেক ছলনা ও ক্রূরতার আশ্রয় নিয়েছেন কিন্তু মনসামঙ্গলের সঙ্গে তুলনায় তা অত্যন্ত মৃদু। দেবী চণ্ডী ক্রমে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের সঙ্গে এতাত্মভাবে মিশে গেছেন এবং তার অনার্য উৎস আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। তিনি পশুর দেবতা থেকে পশু-হস্তার দেবতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা অনেকটাই খেয়ালে চলে-তার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কালকেতুকে ধনদান থেকে ধনপতিকে 'কমলে কামিনী' নিয়ে বিপর্যস্ত করা পর্যন্ত তাঁর সেই অনির্ণেয় মেজাজের জন্যই। চণ্ডী থেকে অন্নপূর্ণা এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে তাঁর চরিত্রের যে উন্নতি হয়েছে তা সমাজ এবং কবিমনের উৎকর্ষের সঙ্গে অনেকটাই জড়িত।

মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, ফুল্লরা, কালকেতু, লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা দাসী এইসব জীবন্ত চরিত্রগুলি টাইপ হয়েও তাকে অতিক্রম করে আমাদের কল্পনাকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তৎকালীন জীবনচর্চায় ধনিক সম্প্রদায়ের বিলাস-বাহুলা ও অনৈতিকতার কথা কবিরা ভুলে ভুলে যাননি-তারই প্রকাশ ধনপতি চরিত্রে।

চণ্ডীমঙ্গলের সার্থক কবির সংখ্যা অবশ্যই খুব অল্প কিন্তু তাও এই ধারাতেই কবি প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

৯.১৩. ধর্মমঙ্গল: কাব্য-পরিচয়

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে এবং বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় প্রচেষ্টায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি আলাদা ঐতিহ্য আছে। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল ধর্মমঙ্গল কাব্যের আগেই শিল্পসম্মত কাব্যরূপ পেয়েছে। ধর্মমঙ্গলের ক্ষেত্রে এর উপকরণের পুরোপুরি কাব্য হয়ে উঠতে আরও একশো বছর সময় লেগেছে।

ধর্মঠাকুরের পূজা রাঢ় অঞ্চলে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটনাগপুর পর্যন্ত এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই লৌকিক দেবতা বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে ধর্মঠাকুরের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। পরবর্তীকালে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'কূর্ম' শব্দট থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি রূপও বহুস্থানে আছে। আবার বলা হয়েছে, ইনি জন্মসূত্রে বৈদিক দেবতা বরুণ। ধর্মঠাকুরকে সূর্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বরুণ, যম ইত্যাদি নানা দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মূল পূজক ডোমজাতি। এঁদের ধর্মের দেয়াসী বলা হয়। খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে এদের উল্লেখ করেছেন। পাল রাজাদের সময় থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং সেন রাজাদের সময়েও এইসব অঞ্চল বৈদিক পরিমণ্ডল থেকে ভিন্ন থাকার জন্য নিজস্ব ধর্ম বিষয়ে এরা

অনেক ভিন্ন ছিল। ধর্মপূজা মূলত নিম্নজাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়ে পরে উচ্চবর্ণেও প্রভাব ফেলেছিল। বলা হয়-খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণ কবি রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা করার অপরাধে সমাজে পতিত হয়েছিলেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান অঞ্চলে ধর্মঠাকুর এখনও সাড়ম্বরে পূজিত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি কূর্মাকৃতি পাথর, বা তিনটি পায়ার উপর বসানো পাথর পূজিত হয়, যাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ ত্রিশরণের প্রতীক বলেছেন, 'বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুরটি শালগ্রাম শিলার মত সুগোল তবে শালগ্রামের মত গায়ে কোনো ছিদ্র নাই। আসানসোলের নিকটবর্তী ডেমরা গ্রামের তিনটি ঠাকুরই ডিম্বাকৃতি।' (ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য)।

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে রচিত কাব্য-সাহিত্য প্রধান দুইভাগে বিভক্ত। (১) ধর্মপূজা পদ্ধতি (২) ধর্মমঙ্গল কাব্য। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতিও তাঁরই লেখা। লৌকিক ভাষায়, স্থূল লোকাচার-প্রধান এই পদ্ধতি-মন্ত্রগুলিও লৌকিক ভাষায় লেখা। ধর্মঠাকুর বন্ধ্যানারীকে সন্তান দেন, কুষ্ঠরোগ নিরাময় করেন এবং চক্ষুরোগও নিরাময় করে থাকেন। ধর্মঠাকুর পূজা আদায়ের লালসায় কোনো হীন উপায় বা ছলনার আশ্রয় নেননি সুতরাং দেবতা হিসাবে তাঁকে মোটামুটি নিরাসক্ত বলা যায়। এর পূজা পদ্ধতিও খুবই কঠোর। ফলাযুক্ত পাটার উপর গাড়গড়ি দেওয়া দেহের নয়টি স্থানে লোহার শলাকা ফোটানো, চড়কগাছে লোহার শলাকাবিদ্ধ অবস্থায় ঘোরা, ধর্মস্থান থেকে বিশেষ পুকুর পর্যন্ত 'ভক্ত্যার' গড়াতে গড়াতে যাওয়া-সবই ঠাকুরের কৃপালাভের প্রয়াস। রঞ্জাবতী কোলে ভর দিয়ে পুত্রলাভ করেছিলেন, লাউসেন নিজের মাথা ফেটে হোম করে দেবতার কৃপালাভ করেছিলেন।

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কাহিনির নায়ক লাউসেন। তবে কোন কোনো হরিশ্চন্দ্রও তার স্ত্রী মদনার কথা বলা হয়েছে। কাহিনিটি আকারে দীর্ঘ-২৪টি পালায় বিভক্ত যা বারো দিন ধরে গীত হয়। কাহিনিটি এইরকম। গৌড়ের রাজার শ্যালক মন্ত্রী মহামদ পাত্র। কর্ণসেন ছিল গৌড়েশ্বরের একান্ত অনুগত। সে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে পালিয়ে যায়। ইছাই ঘোষ তাকে পদচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করে। স্বয়ং গৌড়েশ্বর ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র ও স্ত্রী মারা যায়। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের দুঃখ দেখে শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। মহামদ এতে ক্রুদ্ধ হয়। কর্ণসেনের আর কোনো সন্তান না হওয়ায় মহামদ রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে উপহাস করে। রঞ্জাবতী হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী মদনার মত শালে ভর দিয়ে (লৌহশালাকার উপর ঝাঁপ দিয়ে) ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে পুত্র লাউসেনকে লাভ করে। মহামদ তাকে চুরি করে এবং ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে আর একটি পুত্র দেন, তার নাম কপূর সেন। হনুমান ধর্মের আদেশে লাউসেনকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। হনুমানই পুত্র দুটিকে শিক্ষা দান করেন।

লাউসেন বড় হয়ে অনেক প্রলোভন পার হয়ে গৌড়ে পৌঁছেই মহামদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হয়। দাদাকে ছেড়ে কপূর পালায়। ধর্মের কৃপায় লাউসেনের কারামুক্তি ঘটে। অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে লাউসেন একটি তেজস্বী অশ্ব এবং কালু প্রভৃতি বারোজন ডোমকে সঙ্গী হিসাবে পায়। এবার লাউসেন কামরূপ জয় করে রাজকুমারী কলিঙ্গাকে বিবাহ করে। পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অমলা ও বিমলাক বিবাহ করে। মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর সিমুলার রাজকন্যা কানাড়াকে বিবাহ করতে চায়। রাজা বৃদ্ধ বলে রাজকন্যা বিবাহে রাজি হয় না। কানাড়া যুদ্ধের প্রস্তাব দেয় এবং আগেই একটা 'লৌহ গণ্ডা' এনে দুভাগ

করতে বলে। লাউসেন অনায়াসে সেটি দু-ভাগ করে এবং কানাড়াকে বিবাহ করে। এরপর ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধ হয়। ইছাই-এর রাথে পার্বতী এবং লাউসেনের রথে ধর্মঠাকুর থেকে যুদ্ধ করেন। কালুডোম এই যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখায়।

এরপর গৌড়েশ্বর আয়োজিত ধর্মপূজায় ত্রুটির কারণে রাজ্যে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। লাউসেন পাপ দূর করতে 'হাকন্দ' যায়- যাতে সূর্য পশ্চিমে উদিত হন। ইতিমধ্যে মহামদ লাউসেনের রাজ্য আক্রমণ করে। কালু ডোমের পত্নী লখাই ডোমনী এবং রানি কানাড়ার অসামান্য বীরত্বে মহামদ পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে কালু ডোম মারা যায়।

অবশেষে লাউসেন মাথা ফেটে হোম করলে ধর্ম প্রসন্ন হন এবং সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়। শাস্তি হিসাবে ধর্ম মহামদকে কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত করেন। লাউসেনের প্রার্থনায় তার রোগমুক্তি ঘটে কিন্তু একটি দাগ থেকে যায়। লাউসেন সশরীরে স্বর্গারোহণ করে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। শিল্প রচনার স্থান এখানে স্বল্প। বিশেষত ডোমদের বীরত্ব এর উপভোগ্য বিষয়। কাহিনির পাত্রপাত্রী ঐতিহাসিক না হলেও বহু ঐতিহাসিক স্থানের উল্লেখ এই কাব্যে আছে।

৯.১৪. ধর্মমঙ্গলের কবি

ময়ূর ভট্ট- ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি হিসাবে ময়ূর ভট্টের নামই গবেষকরা করেছেন। এঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না তবে, ধর্মমঙ্গলের বহু কবি এঁর সম্পর্কে কথা বলেছেন যেমন, রূপরাম, মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম চক্রবর্তী, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতারাম দাস প্রমুখ। ধর্মমঙ্গলের সব কবিই ময়ূর ভট্টের কাছে তাঁদের কাব্যের উপাদান গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের কাব্যে ময়ূর ভট্টের প্রভাব আছে। ঘনরাম উল্লেখ করেছেন যে, ময়ূর ভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ পুরাণ'-

'হাকন্দ পুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমার দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয়।'

লাউসেন যেখানে দেহ নয় খণ্ড করে কেটেছিল, সেই স্থানেরই নাম 'হাকন্দ'। এসবের কোনো প্রামাণিকতা নেই। হয়তো ময়ূর ভট্ট অন্য কবির রচনার মধ্যেই লুকিয়ে আছেন।

আদি রূপরাম- মানিক গাঙ্গুলীর কাব্যেই এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবে এর কোনো পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

খেলারাম- গ্রন্থ রচনার কালজ্ঞাপক পদটি থেকে মনে করা হয়, ইনি এই ধারার প্রাচীন কবি। মোটামুটি ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে ইনি গ্রন্থরচনা করেন বলে ধরা হয়েছে।

শ্যাম পণ্ডিত- বীরভূম অঞ্চলের কবি। এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'। ড. সুকুমার সেন এঁকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি বলতে চেয়েছেন। সম্ভবত ইনি ডোমেদের ব্রাহ্মণ ছিলেন, আবার বলা হয়েছে, ইনি বণিক জাতীয়ও হতে পারেন।

মানিকরাম গাঙ্গুলী- ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ মানিকরাম গাঙ্গুলীকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলেছেন। যোগেশচন্দর বিদ্যানিধির মতে এঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ। অন্যদের মতে ১৭৮৭

খ্রিস্টাব্দ। গ্রন্থের ভাষা বিচারেও এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা বলে মনে হয়। মানিক গাঙ্গুলীর পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে। একটি বৃদ্ধের রূপ ধরে বাঁকুড়া রায় তাঁকে ধর্মমঙ্গল রচনার আদেশ দেন। এই কাব্যে প্রথমে ২৪টি পালায় দেবতত্ত্ব ও পরে ২৩টি পালায় লাউসেনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ইনি একজন সুকবি এবং সুপণ্ডিত। চরিত্রচিত্রণে এবং বিশেষত বীররসের বর্ণনায় দক্ষ। নানা অলংকারের সমাবেশ ও বাংলা ছন্দের বৈচিত্র তাঁর কাব্যে আছে। আদিরসের বর্ণনা থেকে তাঁর সংস্কৃত রসশাস্ত্রের জ্ঞান সম্পর্কে বোঝা যায়। 'লখ্যা ডোমনীর চরিত্র তাঁর কাব্যের এক অতি অপূর্ব সৃষ্টি।' (আশুতোষ ভট্টাচার্য)

রূপরাম চক্রবর্তী- ড. সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তী ১৬৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে কাব্যরচনা করেন। রূপরামের জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে। বাড়ি থেকে পালিয়ে পথিমধ্যে ধর্মঠাকুর কর্তৃক কাব্যরচনার আদেশ পান। রাজা গণেশ কবিকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়ে গানের দল বেঁধে দেন। তখন থেকে তিনি ধর্মের আসরে গান গাইতে শুরু করেন। এই কারণে সম্ভবত তাঁকে সমাজে পতিত হতে হয়। মানিক গাঙ্গুলীর রচনার সঙ্গে তাঁর রনার প্রভুত মিল লক্ষ করা যায়।

পাঠ শেষ না করলেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। আত্মবিবরণী ও অন্যত্র সহজ সরল মর্মস্পর্শী ভাষার প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তিনিই প্রথম লাউসেনের কাহিনিকে ব্রত, ছড়া, পাঁচালির থেকে মুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণভাবে কাব্যিকতা-খণ্ডিত করে তোলেন।

রামদাস আদক- এঁর কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। কবি জাতিতে কৈবর্ত, বাড়ি হুগলি জেলার হায়ৎপুর গ্রামে। মাতুলালয়ে যাওয়ার পথে সিপাহী কর্তৃক ধৃত ও অত্যাচারিত হন। দীঘির ধারে জলপান করতে গেলে দীঘি শুষ্ক হয়ে যায়, তখন এক দিব্যপুরুষ তাঁকে জলপান করান এবং কাব্য রচনার আদেশ দেন। এঁর গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ।

কবির ভাষা পরিচ্ছন্ন ও সরল। ভাষায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর না থাকলেও অলংকরণ, শব্দযোজনা, রূপনির্মাণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সীতারাম দাস- সীতারাম দাসের কাব্যরচনার কাল ১৬৯৮ বলে গবেষকরা মনে করেন। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে তাঁর জন্ম। কবিরা জাতিতে কায়স্থ। পিতার নাম দেবী দাস, মাতা কেশবতী? 'গজলক্ষ্মী মা'-এর স্বপ্নাদেশে ইনি কাব্য রচনা করেন অবশ্য ধর্মও তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। ময়ূরভট্টের কাব্য এই কবির আদর্শ ছিল। সীতারামের রচনা বিবৃতিধর্মী ও সরল। কবি হিসাবে তাঁকে খুব উচ্চস্তরের বলা যায় না তবে, চরিত্রচিত্রণ নৈপুণ্য ও ঘটনাবৈচিত্র্য তাঁর কাব্যের গুণ।

ঘনরাম চক্রবর্তী- ঘনরাম চক্রবর্তী মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ১৬৬৩ শকাব্দ বা ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য সমাপ্ত হয়। বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। ঘনরামের পিতার নাম গৌরাকান্ত, মাতা সীতা। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের কথা তিনি স্পষ্ট করে বলেননি। তবে তিনি হয়তো রাজার দ্বারা উপকৃত হন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভকরেন। তাই রাজার কল্যাণ কামনা করে বলেছেন,

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

ধনরামের রচনায় কোনো স্বপ্নাদেশের কথা নেই। তবে তিনি এ বিষয়ে তাঁর গুরুর কথা বলেছেন। তাঁর গুরুই তাঁকে উপাধি দেন।

চব্বিশ অধ্যায়ে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, 'ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য।' কবি কাব্যরচনার অবকাশে পুরানের নানা বর্ণনা দিয়েছেন যা অনেক সময় অর্থবোধে অসুবিধা সৃষ্টি করে। অলংকরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। সহজ অনুপ্রাস তাঁর কাব্যকে শ্রুতিমধুর করেছে। কবির ভাষা অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। লখাই ডোমনী, তার সপত্নী সনকা, লাউসেন, কপূরসেন ইত্যাদি জীবন্ত চরিত্র। শোকের ক্ষেত্রে সংযম দেখিয়েছেন ঘনরাম-যুদ্ধের বাতাবরণে শোকের অবকাশ যে কত কম তা তাঁর রচনায় স্পষ্ট। তাঁর রচিত স্ত্রী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের চেয়ে অনেক জীবন্ত। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিকতা থেকে এই বীরত্বগাথা এক বিপরীত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য আরও বহুকবি রচনা করেছেন। যেমন, যদুরাম, রাজারাম দাস, প্রভুরাম, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, রমাকান্ত রায় ইত্যাদি।

৯.১৫. ধর্মমঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ

অনেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারাকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন। ধর্মপূজা ও কাব্যরচনার ক্ষেত্র সীমিত। সারা বাংলাব্যাপী এর প্রচলন নেই। রাঢ়ভূমির যে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান, রুক্ষ, কঠোর জীবনচর্যা, নিম্নশ্রেণীর বিচরণের ক্ষেত্র, তা ধর্মমঙ্গলকে ভিন্ন উপাদানে গঠিত করেছে। প্রকৃত যুদ্ধের কথা এবং যুদ্ধে পারদর্শী ডোমদের কথা একমাত্র ধর্মমঙ্গলেই আছে। বাঙালির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রাঢ়ের সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকায় এবং কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার দৈবশক্তির চেয়ে নিজের বাহুবলের উপর এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভরসা বেশি ছিল। বীরভূম 'মল্লভূম', 'শূরভূম' এই নামের মধ্যে এদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় লুকানো আছে।

বৌদ্ধধর্মের শেষ যুগে বৌদ্ধধর্মে হিন্দু পূজাবিধি ও হিন্দুধর্মে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সংশ্লেষ ঘটেছে তখনকার সেই পুজা-উপাদানের ইতিহাস আছে ধর্মঠাকুরের পূজায়। জটিল আভিচারিক ক্রিয়ার সাহায্যে অলৌকিক ফললাভ এই পূজার উদ্দিষ্ট। এই ধর্মঠাকুর কিন্তু মনসা বা চণ্ডীর মত পূজা-লালসায় কিছু করেননি। ভক্তরাই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য নানা আভিচারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। ভক্তকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা তিনি কোনভাবেই করেননি। মূলত নিম্নশ্রেণী, যারা হিন্দুসমাজের উপেক্ষিত তাদের মধ্য থেকে উঠে এই দেবতা বহুকাল পরে হিন্দুধর্মে এসেছেন। হিন্দুধর্মের মূল ধারায় গৃহীত না হলেও নিম্নশ্রেণীর পূজা অনুষ্ঠানে ইনি এখনও বিরাজমান এবং বর্তমানে বেশ কিছু মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্র।

উল্লেখযোগ্য কবির স্পর্শে না আসায় ধর্মমঙ্গলকাব্য কাব্য হিসাবে ম্লান। তবে কালু ডোম, লখা ডোমনী, কানাড়া ইত্যাদি চরিত্রের বীরত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মমঙ্গলকাব্য করুণরসের কাব্য নয়। নারীরা এখানে ক্রন্দন করে কালক্ষেপ করেনি, যুদ্ধ করে প্রতিশোধ নিয়েছে। লাউসেনর বীরত্বের পাশে

কপূর সেনের ভীরুতা, মানবাতর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। একটি নিম্নশ্রেণীর সমাজ, বিশেষ কাল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই কাব্যে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

৯.১৬. ভারতচন্দ্র রায়: কবিজীবন

মঙ্গল কাব্যধারায় অন্নদামঙ্গল শেষ সংযোজন। চণ্ডী, কালিকা, অভয়া, অন্নপূর্ণা, অন্নদা একই দেবী নানান নামে চিহ্নিত ও বন্দিত। কালের প্রবাহ, ধর্মসংশ্লেষের শেষ অবস্থা, বিশেষত চৈতন্যপ্রভাব এই দেবীকে একেবারে অন্য চেহারা দিয়েছে। এই সময়ে ইনি জগন্মাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। দাক্ষিণ্য ও বরাভয় তাই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত অনন্দামঙ্গলে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও শেষ কবি ভারতচন্দ্র।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন। রচনার সমাপ্তিকাল ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের রচনার পুঁথি দুর্লভ নয়। সবচেয়ে পুরোনো পুঁথি হ্যালহেড্ সংগৃহীত। কাব্যটি প্রথম ছাপিয়েছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। পরে রাধামোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য কবিতায় রচনা করে টীকা-টিপ্পনী সমেত ছাপিয়েছেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছে উপকরণ সংগ্রহ করে এর কিছু পরেই ভারতচন্দ্রের পূর্ণ জীবনী ও কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভারতচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল ভূরশিট পরগনার আধুনিক হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে এঁরা ব্রাহ্মণ, জমিদার ছিলেন। নরেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন ভারতচন্দ্র। পিতৃব্য রাজবল্লভের সহায়তায় কীর্তিচন্দ্র তাঁদের রাজ্য কেড়ে নিলে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে যান এবং ভারতচন্দ্র নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে পালিয়ে যান। সেখানে টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সেখানেই মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেন ও গৃহে ফিরে আসেন। অভিভাবকদের অপ্রসন্নতার কারণে আবার গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলি জেলায় দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে থেকে ফরাসি শিক্ষা করেন। এখানেই তিনি প্রথম সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করে পাঠ করেন। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে গৃহে ফেরেন ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যাপারে তদ্বিরের জন্য বর্ধমান রাজার কাছে যান। এখানে কোনো কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয় এবং তিনি কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে পালিয়ে যান। প্রথমে কটক, তারপর পুরী গিয়ে সেখানে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রামে শ্যালিকা-পতির কাছে ধরা পড়েন। তাঁদের অনুরোধে সন্ন্যাসী-বেশ ত্যাগ করেন, পত্নীকেও আনিয়ে নেন এবং কাজের খোঁজে ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে আসেন। ইন্দ্রনারায়ণ ফরাসি সরকারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠান। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০ টাকা বৃত্তি দিয়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করতে বলেন। এবং কবিকে মূলাজোড় (বর্তমান শ্যামনগর) অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। এবার ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। পরে মূলাজোড় রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'নাগাষ্টক' নামে একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য রচনা করেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

৯.১৭. অন্নদামঙ্গল: কাব্য-কাহিনি

অন্নদামঙ্গল কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই তিনটি খণ্ড প্রকৃতপক্ষে এক একটি স্বতন্ত্র কাব্য। কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সুদৃঢ় যোগ নেই। প্রথম খণ্ডই প্রকৃতপক্ষে 'অন্নদামঙ্গল' বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল।'। এই অংশ কবি মুকুন্দরামের অনুকরণে রচিত। দ্বিতীয় খণ্ড 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' এবং তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ-অন্নদামঙ্গল'-যা মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনি।

প্রথম খণ্ডে পঞ্চদেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণাবন্দনা, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বর্ণনা ও পরে প্রথানুগতভাবে শিব-সীতার কাহিনি, সতীর অন্নপূর্ণারূপে শিবকে ভিক্ষাদান ইত্যাদি আছে। এর মধ্যে এসেছে বেদব্যাসের কথা, ব্যাসের বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দোলাচল, ব্যাসের কাশীনির্মাণ, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস ছলনা, ব্যাসের শাপ ইত্যাদি। এরপর কুবেরের পুত্র বা অনুচর বসুন্ধরের প্রতি অন্নদার শাপ ও বসুন্ধরের হরিহোড় রূপে জন্ম, হরিহোড়ের প্রতি অন্নদার কৃপা ও পরে ছলনা করে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে গমন। ভবানন্দ কুবেরের অন্যতম পুত্র শাপগ্রস্ত নলকুবের এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

এরপর এসেছে 'কালিকামঙ্গল' বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি। কাহিনিটি পূর্বেই বাংলায় অনূদিত হয়েছে যার উৎস বিহ্লনের 'চৌর পঞ্চাশিকা' বা 'চৌরপঞ্চাশ্য' এর প্রথম অনুবাদক কাশীনাথ সার্বভৌম। ভারতচন্দ্রের কাহিনির পটভূমি বর্ধমান। 'বিদ্যালাভ' দ্ব্যর্থক। বিদ্যা অর্জনও বটে, রাজকন্যা বিদ্যাকে লাভও বটে। হীরা মালিনীর গৃহে অবস্থান করে সুন্দর সুড়ঙ্গ কেটে বিদ্যার গৃহে যাতায়াত শুরু করে, ধরা পড়লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মশানে দেবীর স্তোত্রপাঠ করে সে মুক্তিলাভ করে এবং রাজকন্যাও লাভ করে।

তৃতীয় কাহিনি মানসিংহ-অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্রের নিজস্ব রচনা। প্রথম অংশে ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপা ও দ্বিতীয় অংশ মানসিংহের বর্ধমানে আগমন। মানসিংহের উদ্দেশ্য প্রতাপাদিত্যকে দমন। ভবানন্দ মানসিংহের কানুনগো ছিলেন। মানসিংহের অনুরোধে ভবানন্দ তাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি শোনান। যোগসূত্র এইটুকুই। প্রতাপাদিত্য পরাজিত হলে ভবানন্দ খেলাৎ গ্রহণের জন্য দিল্লি যান, সেখানে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য প্রচার করেন এবং 'রাজা' খেতাব লাভ করেন।

৯.১৮. ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তি

ভারতচন্দ্র যে যুগে কাব্যরচনা করেছেন, তা দৈবনির্ভরতার যুগ নয়। ইতিহাস এবং দেবমহিমার মেলবন্ধন ঘটানোও অসম্ভব। এখানেই ভারতচন্দ্রের কেন্দ্রীয় দুর্বলতা। কালকেতু ও হরিহোড় উভয়েই দারিদ্র্যের নিঃসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছে কিন্তু যে সারল্য, অকপট দেবনির্ভরতা কালকেতুর পক্ষে সম্ভব তা বাস্তব-সচেতন হরিহোড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতচন্দ্রের জীবনবোধ এতটাই প্রখর, সুস্পষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ যে তা নির্বিবাদে দেবতাকে আশ্রয় করতে পারে না। কাজই এই কাব্যের ভক্তির বাতাবরণ ও কৃত্রিম, শিল্পচাতুর্যের দ্বারা মণ্ডিত। ভারতচন্দ্র বহুদনি পর্যন্ত, অন্ততঃ মধুসূদনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত তাঁর পরবর্তীকালের কবিদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছেন।

ভারচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে মণ্ডনকলাকে আশ্রয় করেছেন। কাব্যভাষাকে নিজ অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করা খুবই আধুনিক এবং বড় শিল্পীর লক্ষণ। তিনি বলেছেন-

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।

অতএব কহি কথা যাবনী মিশাল।।

এবং-'যৈ হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'। তৎসম, আরবি, ফারসি, লৌকিক ভাষা ইত্যাদিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে নতুন মঙ্গল আশে' তিনি কাব্যরচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রথাগত অলংকরণও তাঁর প্রয়োগকৌশলে মৌলিক হয়ে উঠেছে। শ্লেষ ও যমকের অসাধারণ ব্যবহার 'ঈশ্বরী পাটনী অংশে অবিস্মরণীয়। ছন্দোনৈপুণ্য তাঁর আর একটি কাব্যরচনা কৌশল। বিষয় অনুসারে তিনি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। ছোট ছোট পদগুলি গীতিকবিতার অভাব পুরণ করেছে। পয়ার, ত্রিপদী ছাড়াও দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের ব্যবহার বিষয়ানুযায়ী একেবারে অসামান্য। সেইসঙ্গে রুদ্র ও বীভৎস রসের বর্ণনা কবির দক্ষতা পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কেউ করেননি।

'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য সম্পর্কে অনেকে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। হাস্যরসের মতই শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমাও বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রই নির্ধারণ করলেন। আধুনিক কাব্যের মাপকাটিতে ভারতচন্দ্রের বিচার চলে না কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে বড় কথা এই যে, এই অশ্লীলতা শিল্পিত। বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্পর্কে বলেছেন, 'ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গেলেন। তির্যক ব্যঞ্জনায় কটাক্ষ-কৌতুকে অন্তরতলশায়ী বৈদগ্ধ্য এই অশ্লীলতাকে কাব্যসৌন্দর্যের আবরণে মণ্ডিত করেছে। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মণ্ডনকলাবিদ তাই ভারতচন্দ্রই, যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রাজসভা কবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র দুর্বল। তাঁর মধ্যে ভাব গভীরতার অভাব ছিল। 'তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে এত বেশি মনোযোগ দিতেন যে ভাবের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল না'। (ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) । তবে, ব্যতিক্রমও ছিল, যেমন কয়েকটি চরিত্র, হীরামালিনী গতানুগতিক কুট্টনী চরিত্র হয়েও জীবনরসে উজ্জ্বল। এমনই আর একটি চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পৌরাণিক দেবাদিদেব শিব নিজ মহিমা বর্জন করে ছেলেদের খেলার সামগ্রী হয়ে উঠেছেন। 'দেবতাবাদের মুখোস' খুলে সেই মানব প্রাধান্য বাস্তববাদী ভারতচন্দ্রের রচনায় উজ্জ্বল। আবার সেই শিবই যখন বলেছেন,

চেত রে চেত রে চিত ডাকে চিদানন্দ।

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।।

যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।

যে জন অচেতচিত্ত সেই দা দুখী।

তখন মুহূর্তে তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই ভোলা মহেশ্বরকে যিনি সব দেবতারও দেবতা। 'অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস ছলনা' দেবচরিত্রের অবনমনের আর একটি চিত্র অন্নদার স্বকার্য সাধনের নীচ

প্রয়াস আমাদের চোখে তাঁকে মানবের চেয়েও হেয় করে তোলে। ভারতচন্দ্রের বেশ কিছু প্রৌঢ় উক্তি প্রবাসের আকার নিয়েছে, যেমন-

১. 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ'

২. 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?'

৩. 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর',

৪. 'খুঞ্া তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত'- ইত্যাদি এর সামান্য কিছু উদাহরণ।

৯.১৯. অন্নদামঙ্গল: সামগ্রিক বিশ্লেষণ

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চারশো অথবা পাঁচশো বছরের মঙ্গলকাব্যের ধারা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে পৌঁছে তার সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতচন্দ্রে ছিল না কিন্তু সামাজিক পটপরিবর্তন-ইতিমধ্যেই ফরাসীদের আধিপত্য মোগল শাসনের প্রায় অবসান সমাজ-সচেতন কবি ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল। ভারতচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, তৎকালীন যুগে দেবতার কাছে ভক্তিবিহ্বল আত্মসমর্পণ আর সম্ভব নয়। সম্ভব নয় পূর্বের সারল্য বাঁচিয়ে রাখা। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যে 'নূতন মঙ্গল তিনি রচনা করেছিলেন তার একটি অংশ বিশেষভাবে ইতিহাস-বিবৃতি। সচেতনভাবে ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি দেবীর কৃপার পটভূমি নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁকে অন্নদার ভূতপ্রেতের সাহায্য নিতে হয়েছে। এমনকি দিল্লী দরবারেও তারা প্রভাব বিস্তার করে মোগলদের ভক্তি আদায় করেছে। এর অসম্ভাব্যতা ভারতচন্দ্রের অবিদিত ছিল না। তাই কাব্য হিসাবে বিবৃতি মূলকতা ছাড়া এই অংশে আমাদের কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি।

যেখানে ভারতচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ততা। তা, শিল্পিত সৌন্দর্য। সেখানে প্রথাগত নিয়মের আশ্রয় না নিয়ে তিনি সমৃদ্ধ। শিথিল রচনাভঙ্গি, মননহীন আবেগ, গ্রাম্য সংস্কারের বদলে ভারতচন্দ্রে এল সুমার্জিত বৈদগ্ধ্যপ্রধান মনন, সুনির্বাচিত শব্দবন্ধ, দৃঢ় প্রত্যয়ী অলংকরণ। যে বিদ্যাসুন্দর মূল কাহিনির অন্তর্গত নয়, তার আদিরসকে শিল্পসৌন্দর্যের আবেষ্টনীতে রাজসভার নাগরিক রুচির উপভোগ্য করে তুলেছেন তিনি। ভক্তের নীতিহীনতাকে এখানে দেবী প্রশ্রয় দিয়েছেন।

ভোগবিলাস-প্রাচুর্যের দেবী অন্নপূর্ণা। ঈশ্বরী পাটনীর ক্ষুদ্র আর্তি 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এই স্বচ্ছলতার আবেদনের পিছনে যুগের প্রয়োজনই কাজ করেছে। দেবতাদের নিয়ে কৌতুক, পরিহাস, রঙ্গপ্রিয়তা এই যুগের চাহিদাকেই তৃপ্ত করেছে।

ভারতচন্দ্র পরবর্তী কালকে প্রভাবিত করেছেন-অন্ততঃ একশো বছর বাঙালি ভারতচন্দ্রেই তৃপ্ত হয়েছে। বৈষ্ণব-শাক্ত পদাবলীর রসসিঞ্চনে তাঁর লেখা ছোটো ছোটো গীতগুলি সমৃদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে প্রবাহিত হয়েছে। বিষয় নয়, প্রকাশই যে সাহিত্য, ভারতচন্দ্র তা প্রমাণ করেছেন।

৯.২০. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন-

- মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের ইতিহাস ও মঙ্গলকাব্যের ধারাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উদ্ভবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই ধারার একজন সুপরিচিত কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- মনসামঙ্গলে'র কাহিনি সংক্ষেপে বলুন ও এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার পরিচয় দিয়ে এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবির সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
- কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য এবং তাঁর কবিকৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- দেবী চণ্ডীর উৎস বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত দিন।
- 'পদ্মাপুরাণ' রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্তের কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা করুন।
- ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- মঙ্গলকাব্যের ধারাগুলির শ্রেণীবিভাগ করুন।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগর চরিত্রটি কেমন ছিল বলুন।
- 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যরচনার পটভূমি কোন সমাজ ছিল সংক্ষেপে বলুন।
- 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম ছাড়া অন্য কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
- 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে কয়টি কাহিনি আছে? কাহিনিগুলিকে কীভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে?
- 'মঙ্গল' নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
- টীকা রচনা করুন: কানা হরিদত্ত।
- মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ লক্ষণগুলি উপস্থাপিত করুন।
- মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা কোনখানে তা আলোচনা করুন।
- মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনার কৌশল কোনখানে স্বতন্ত্র তা আলচনা করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- মনসামঙ্গল কাব্য ধারার আদি কবি কে?
- মানিক দত্ত কোন অঞ্চলের কবি?
- বিপ্রদাসের কাব্যের নাম কি?
- 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের রচয়িতা কে?
- 'অনাদিমঙ্গল' কোন মঙ্গলকাব্যকে বলা হয়?
- কানা হরিদত্ত কোথাকার লোক?
- অন্নদামঙ্গল কাব্য কয়টি খণ্ডে বিভক্ত?
- ভারতচন্দ্র কত সালে প্রয়াত হন?
- অন্নদামঙ্গল প্রথম ছাপিয়েছিলে কে?
- চণ্ডীমঙ্গলের কয়টি খণ্ড?
- ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি কে?
- চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি কে?
- ধর্মঠাকুরকে নিয়ে রচিত সাহিত্যকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

একক ১০ ❒ বাংলা রোমান্স ও প্রণয়োপাখ্যান: শাহ্ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল

১০.১. উদ্দেশ্য

১০.২. প্রস্তাবনা

১০.৩. শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও তাঁর কাব্য পরিচিতি

১০.৪. দৌলত কাজী: জীবন ও কাব্য

১০.৫. সৈয়দ আলাওল: কবি পরিচিতি

১০.৬. পদ্মাবতী: কাব্য-কাহিনি

১০.৭. সামগ্রিক বিশ্লেষণ

১০.৮. অনুশীলনী

১০.১. উদ্দেশ্য

এই একক পাঠে আপনি মুসলমান কবিদের বাংলা ভাষায় নানা অবদানের কথা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন আরাকান রাজ্যসভার কথা। জ্ঞাত হবেন প্রণয় কাহিনির ঐতিহ্য সম্পর্কে। আর বিশেষভাবে জানবেন শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল সম্পর্কে।

১০.২. প্রস্তাবনা

ভারতে বিজেতাদের ধর্ম ইসলাম, অন্য বহিরাগত ধর্মের মত ভারতীয় ঐতিহ্যে মিশে যায়নি। মূর্তিপূজার বিরোধিতায়, খাদ্যাখাদ্যে, ভাষা ব্যবহারে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজয়া রাখে। হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দু ছিল প্রবল। সে সময় নানা বেসরা সুফি ভারতীয় ঐতিহ্যে লিপ্ত হয়ে, ভিন্ন রীতির ইসলাম প্রচার করত। তারা সমন্বয়কে গুরুত্ব দিত। ইসলামের ভারত বিজয়ের আগেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ-হিন্দুদের সঙ্গে নানা সমন্বয় ঘটে। আরাকানে বৌদ্ধরাজাদের প্রযত্নে বাঙ্গালি মুসলমানেরা সাহিত্য রচে। এখানে সুফি-ফকিরদের প্রাধান্য ছিল।

ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানের সমাজে গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতানেরা দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় বঙ্গদেশ এবং বাংলাভাষাকে গুরুত্ব দেন। ইলিয়াস শাহী আমলে শাসকদের এ চেষ্টা, জনগণের ধর্মীয় ভেদকে স্তিমিত করে। বেসরা সুফিরা, ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানেরা ক্রমে সমন্বয় এবং সহনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়। শাসকদের সমর্থনে শিক্ষিত মুসলমানেরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় পরিবেশন শুরু করেন।

ধর্ম বা দেবদেবীর কথা বাদ দিয়ে মানুষের প্রেম ভালোবাসার গল্প, বৈষ্ণব ও সুফি দর্শনে গুরুত্ব পায়। এ প্রণয় কাহিনি ভারতীয় ধ্রুপদী ঐতিহ্য, লৌকিক ঐতিহ্য এবং আর্বিকার্সির ঐতিহ্য আকর্ষণ করে কবি সাহিত্যিকদের। এ সময়ে এ বিষয়টি বঙ্গ সাহিত্যে শত পুষ্পে বিকশিত হয়।

১০.৩. শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও তাঁর কাব্য পরিচিতি

শাহ মুহম্মদ সগীরের, 'ইউসুফ জোলেখা'-এর পাণ্ডুলিপি ছিল আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাছে। দেশভাগের অনেক পরে তিনি এ সকল পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। ঢাকার গবেষকেরা সগীরের গ্রন্থের অন্যত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। অবশেষে ১৯৮৪-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনামূল হক এবং আহাম্মদ শরীফের সম্পাদনায় 'ইউসুফ জোলেখা' প্রকাশিত হয়। সগীরের রচনায় সন তারিখের উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠপোষকের নাম অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়েছে এখানে। মুহম্মদ শহীদুল্লাএ পুঁথির প্রাচীনত্ব সমর্থন করেছেন। উত্তরকালে আবদুল হাকিম, ফকির শরীবুল্লাহ প্রমুখের রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য পাওয়া গেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগের পূর্বযুগে, আবদলু করিম সাহিত্য বিশারদের সংগৃহীত এ পুঁথির পরিচয় অজ্ঞাত থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কেউ এ পুঁথির পাণ্ডুলিপি দেখেন নি। তাঁর মতে এ কাব্যের ভাষা পঞ্চদশ শতকের প্রাচীন ভাষা নয়। লেখক, কথকেরা সেকালে পুঁথির ভাষা বদলাতেন।

কাব্য পরিচয়

বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মুসলমান কবিদের রচনাবলির মধ্যে সগীরের পুঁথি প্রাচীনতম। সপ্তদশ শতকের আরাকান রাজসভার কবিদের প্রণয় কাহিনির অনেক আগে তার ইউসুফ জোলেখা রচিত হয়েছিল। তার সঠিক রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও, তাকে পঞ্চদশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী স্তরের কবি মনে করা হয়। তিনি সম্ভবত সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমের কর্মচারী ছিলেন। মুসলমান লেখকদের বাংলা ব্যবহারকে ধর্মনেতারা খুব একটা সমর্থন করতেন না। কিন্তু হিন্দি অবধিতে মুসলমান কবিরা প্রেমকাহিনি রচেছিলেন। তখন শাসকদের সমর্থন এসেছিল বাংলা রচনার পক্ষে। গিয়াসুদ্দিন হাফিজ, বিদ্যাপতির ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সগীর লিখেছেন,

'না লিখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়।
দুষিব সকল তাক ইহা না জুয়ায়।।
গুনিয়া দেখিলু আম্মি ইহা ভয় মিছা।
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাঁচা।।

মাতৃভাষার ব্যবহারেও সগীর আরকান রাজসভার কবিদের অগ্রজ পথপ্রদর্শক ছিলেন।

সগীর তার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন কোরানের সুরা ইউসুফ থেকে। ওয়াকিল আহমেদ দেখিয়েছেন যে, ইমাম গাজালীর কোরানের তপসির ব্যাখ্যা পুস্তকের সঙ্গে সগীরের রচনার মিল বেশি। একাদশ শতকে রচিত ফেরদৌসী তুসীর 'ইউসুফ জোলেখা' এখানে অনুসৃত হয়েছে। সমাপ্তির আমিন-বিধুপ্রভার প্রণয় কাহিনি কবির নিজস্ব সংযোজন। সগীর অনুবাদে আন্তরিক, ভাব না ছায়ানুবাদের

রীতি অনুসরণ করেছেন, সে আলোচনা তার সমালোচকেরা করেন নি।

কাব্যটি শুরু হয়েছে আল্লারসুল, যাবাবা এবং রাজস্তুতি দিয়ে। তৈমুস বাদশার মেয়ে জোলেখা যৌবনাগমে এক সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখে। তার বিয়ে হয় যে আজিজ মিশরের সঙ্গে, সে কিন্তু স্বপ্নে দেখা সুন্দর ছিল না, উপরন্তু সে ছিল ক্লীব। এখানে ইউসুফের জন্ম, সৎ ভাইদের তাকে কুয়োয় ফেলে দেওয়া, কুয়ো থেকে উদ্ধার করে তাকে বাজারে দাস হিসাবে বিক্রয় করার গল্প পাওয়া যায়। নীলনদের জলে স্নান করে ইউসুফ অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। এ রূপে মোহিত হয়ে জোলেখা তাকে ঘরে নিয়ে যায়। গাঞ্জালীর অনুসৃত গল্পের মত এখানেও ইউসুফ জোলেখার দেহসঙ্গী না হওয়ায় তার উপর নানা অত্যাচার হয়। কিন্তু সগীর বৃদ্ধা জোলেখার যৌবনপ্রাপ্তি এবং ইউসুফের সঙ্গে তার ঘটাপূর্ণ বিয়ে দেখিয়েছেন। ফার্সি গল্পে ইউসুফ জোলেখার মিলনের পরে তাদের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। কিন্তু সগীর তারপরেও ইউসুফের ভাই আমিনের সঙ্গে গন্ধর্বরাজা শাহাবালের মেয়ে বিধুপ্রভার বিয়ে, গন্ধর্ব রাজ্যে বাস, অবশেষে মিশরে গমনের বিবরণে গল্পকে আরব, ভারত থেকে মিশরে নিয়ে গেছেন। এখানে ইউসুফের দিগ্বিজয়, তার ছেলেদের বিয়ে, রাজ্যভোগ পর্যন্ত কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে।

ফারসি কাব্যে সুফিতত্ত্ব অনুসারে প্রেমস্রষ্টার স্বরূপ। ইউসুফ জোলেখা আসক মাসকের প্রতীক। কিন্তু সগীরের কাব্যে এ তত্ত্ব প্রাধান্য পায়নি। এখানে প্রতিমা পূজক জোলেখা এবং বিধুপ্রভা স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইউসুফ এবং আমিনাকে পেয়েছে। কাব্যের শেষে হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ডাক আছে। সুফ ভাবনায় এ ধর্মান্তর অনর্থক।

গল্পের ভাব পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, ছন্দ অলংকারের ব্যবহারে, বর্ণনা রীতিতে, বারমাস্যা কথনে এ কাব্য বঙ্গের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে। কোরানের ইউসুফ ছিল ধর্মপ্রাণ, আদর্শ মানুষ। সগীর তার চরিত্রে নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব, বৈষয়িক বুদ্ধিযোগ করে তাকে জীবন্ত মানুষ করে তুলেছেন। জোলেখা উগ্র কামনার দাহে সমাজধর্ম উপেক্ষা করে ইউসুফকে চেয়েছিল। প্রত্যাখ্যানে ভয়ঙ্করী হয়ে প্রেমিকের ক্ষতি করেছিল। এমন কামোন্মাদ চরিত্র বঙ্গ সাহিত্যে বিরল। কিন্তু তা উগ্রতা পরিশুদ্ধ হয়ে নম্র আত্মদানে সমাপ্ত হয়।

উত্তরকালের প্রণয় আখ্যানের পথপ্রদর্শক শাহ মুহম্মদ সগীর।

প্রসঙ্গত 'ইউসুফ-জোলেখা' গ্রন্থের সম্পাদক এনামুল হক ও ভূমিকা লেখক আহমদ শরীফের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, তা থেকে গ্রন্থটির আবিষ্কার ও অন্যান্য বিষয়ে জানা যাবে। আহমদ শরীফ গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে যা লিখেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃতি করি-

তড. মহঃ এনামুল হকের অনুরোধে তাঁর সম্পাদনার জন্যে এ-কাব্যের আদিলিপি তৈরি করেছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রায় চল্লিশোর্ধ্ব বছর আগে। সে সময়কার একটি ঘটনার কথা বলি। এক সকালে সাহিত্য বিশারদ নকল করছিলেন 'নির্দয় ভাইদের দ্বারা ইউসুফ প্রকৃত হওয়ার' করুণ অংশটি। তিনি লিখছিলেন আর ঘনঘন চোখ মুছছেন। বড় বোন হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বিস্মিত ও বিচলিত হয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলেছিলেন, 'বড় জেয়া তুমি কাঁদছ কেন?' আমরা সবাই ওই চিৎকারে সত্তরোর্ধ্ব বয়সের বুড়োর কান্নার কথা শুনে ছুটে এলাম। জানা গেল নির্যাতিত বালক ইউসুফের জন্যেই এ কান্না। তখন আমাদের হাসির পালা শুরু হয়েছে। ঈষৎ বিব্রত সাহিত্য-বিশারদ তখন আত্মপক্ষ

সমর্থনে বললেন, 'শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তো মানুষকে অভিভূত করে, সহমর্মী করে, কাঁদায়, হাসায়।'

শাহ মুহম্মদ সগীরকে অবিসংবাদিত তথ্যে প্রমাণে চৌদ্দ-পনের শতকের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই ড. মুহম্মদ এনামুল হক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় ও যুক্তিপ্রয়োগ চিন্তায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন। স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে, বাংলা একাডেমিতে আর বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে চল্লিশ বছর ধরে প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে বিলম্ব এবং যুক্তিপ্রয়োগের কাল হয়েছে অতিক্রান্ত। ইতোমধ্যে আয়ু হল শেষ। সংকল্প রইল অপূর্ণ আর সিদ্ধি রইল অনায়ও।'

আর উপক্রমণিকায় সম্পাদক মহাশয় (ড. এনামুল হক) বলছেন- তকিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী (১৯২৯) পূর্বকার ব্যাপার। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত 'ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা সমূহের (Indian Vernacular) মধ্য হইতে 'বাংলা ভাষা'কে প্রধান ভাষারূপে বাছিয়া লইয়া আমি সদ্য এম.এ. পাশ করিয়াছি। ফলও আশানুরূপ হইয়াছে। তথাপি, মনে সম্যক প্রশান্তি নাই। বারংবার একটি প্রশ্ন মনে জাগিয়া উঠিতেছিল-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইল বটে, কিন্তু এই সময়ের, সঠিকভাবে বলিতে গেলে, সপ্তদশ শতাব্দীর একমাত্র 'আলাওল' ব্যতীত অন্য কোনো মুসলিম কবির কোনো অবদানের সন্ধান যে পাওয়া গেল না। বাল্লা সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলিম সুলতান ও তাদের আমীর ওমরাহের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রবর্তনা দানের পর্যাপ্ত উদাহরণ (তখন পর্যন্ত) পাওয়া না গেলেও এই ক্ষেত্রে দেশের মুসলিম জনসাধারণের দান এত অপ্রতুল কেন?...

তআমার ছাত্রজীবন হইতেই অর্থাৎ আমি যখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি তখন হইতেই চট্টগ্রাম সুচক্রদণ্ডীর অমর সন্তান মরদুম আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) সহোদয়ের সহিত আমার পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। জানিনা কি কারণে, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এম.এ. পাশ করার পর হইতে যেই সমস্যাটি আমাকে নিপীড়িত করিতেছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহাকে আমার মনোবেদনার কথা জানাইলে... তিনি বলিয়াছিলেন... 'এই ইতিহাসের মধ্যযুগটি এখনও মুসলিম অবদানের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই দিকটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার উপযোগী বহু-মৌলিক উপাদান আমার নিকট সঞ্চিত আছে এবং ক্রমশ এক এক করিয়া সঞ্চিত হইতেছে।...

'তএই সময়ে তাঁহার সহিত আমার সেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকাল (১৯৫৩) অবধি তাহা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে, তৎসংগৃহীত প্রায় দুই সহস্রাধিক হিন্দু মুসলিম পাণ্ডুলিপির পারিবারিক গ্রন্থাগারটির দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই সময়ে শাহ মহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' নামক কাব্যের পাণ্ডুলিপির সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ...এই কাব্যের পাণ্ডুলিপিটির যেই কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি তাঁহার গ্রন্থাগারে ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আমার ব্যবহারের জন্য কাব্যটির একখানি 'Composite Version' বা সমন্বিত পাঠ পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সানন্দ চিত্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।দ ঙশাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ জোলেখা। সম. ড. মহঃ এনামুল হক, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪। মওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।'

কবির আবির্ভাব কাল নিয়ে গ্রন্থটিতে যা লেখা হয়েছে, তা হল-

১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গুড. এনামুল হক। দেওয়া যুক্তিপ্রমাণ ছিল নিম্নরূপ:

'যুসুক জোলেখা কাব্যের ভাষা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে (১৪৮০ খ্রী.) রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র মধ্যবর্তী ভাষা।ত' ["Ê. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮]

১০.৪. দৌলত কাজী: জীবন ও কাব্য

চট্টগ্রামের সংলগ্ন আরাকানের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু তাদের প্রজাদের এক বড় অংশ ছিলেন বাঙালি মুসলমান। রাজা এবং রাজপুরুষদের উৎসাহে সেখানে বাঙালি মুসলমান কবি সাহিত্যিকেরা এক সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন।

চট্টগ্রামের সুলতানপুরে যোড়শ শতকের শেষভাবে জন্মেছিলেন দৌলত কাজী। আরাকান রাজ শ্রীসুধর্মার সময়ে (১৬২১-১৬৩৮) তার অন্যতম সেনানায়ক আসরাফ খানের সহায়তায় দৌলত কাজী লোরচন্দ্রানী বা সতীময়নার গান রচনা করেন। কবির অকাল মৃত্যুতে কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। বিশ বছর পরে ১৬৫৯ নাগাদ এ কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন সৈয়দ আলাওল।

উত্তর দক্ষিণ ভারতে লোরিকমল্লের কাহিনি জনপ্রিয় ছিল। মিয়া সাধন রচেছিলেন, 'মৈনা কা সত'; মুল্লা দাউদ রচেছিলেন, 'চন্দায়ন'। বিহার থেকে আগত গোপেরা মুর্শিদাবাদে এ কাহিনি, গোপ বীরলোরের সঙ্গে চামার বীর বামনের দ্বন্দ্বের কথা এখনো বলে। হিন্দি রচনা থেকে দৌলত সংগ্রহ করেছিলেন এ কাহিনির উপাদান। তাতে যুক্ত করেছেন নিজস্ব সংগৃহীত নানা উপাদান। এ অনুবাদে মূলের ছায়ামাত্র অনুসৃত হয়েছে।

লোর চন্দ্রানীর কাহিনিতে পাই যে, গোহারীর রাজকুমারী চন্দ্রানীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বামনবীরের। কিন্তু সে ছিল নপুংসক। লোর একদা শিকার করতে গিয়ে চন্দ্রানীর সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দু'জনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পথে চন্দ্রানীর স্বামী বামন তাদের আক্রমণ করে। লোর বামনকে নিহত করে। চন্দ্রানীর বাবা মোহরার অনুরোধে লোর চন্দ্রানীকে বিয়ে করে, রাজ্যভার নিয়ে সুখে দিন কাটাতে থাকে। ওদিকে সতীময়না বিচ্ছেদের দুঃখে দিনযাপন করছিলেন। ছাতন নামে এক লম্পট রাজপুত্র ময়নাকে প্রলুব্ধ করে কিন্তু ব্যর্থ হন। তখন এক মালিনী পাঠিয়ে ছাতন ময়নাকে ক্রমাগত কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। ময়নার দুঃখের এক বারমাস্যার বিবরণে জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনার পরে পরেই লোকান্তরিত হন দৌলত কাজী।

বিশ বছর পরে আলাওল বারমাসীটি শেষ করে এ কাব্যটি সমাপ্ত করেন। যে মালিনী ময়নাকে প্রলুব্ধ করছিল তাকে সতীময়না ফিরিয়ে দেন এবং দেন কঠোর শাস্তি। বিরহ পর্বে এক সখী গল্প শোনাত ময়নাকে। এমন এক গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর এক ব্রাহ্মণের দৌতে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছিল। ময়না এক ব্রাহ্মণকে দৌত্যে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছিল। ময়না এক ব্রাহ্মণকে স্বামীর কাছে দূত হিসাবে পাঠায়। ইতিমধ্যে লোর চন্দ্রানীর ছেলে হয়েছে। তাকে রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রানী সহ লোর ফিরে এল ময়নার কাছে। সতী পতি পেল। দু'স্ত্রী স্বামীকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। স্বামী মারা গেল। চন্দ্রানী ময়না সহমৃতা হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পাণ্ডু কুন্তী, দশরথ, রাধা আইহন কাহিনির অক্ষম স্বামীর গল্পবীজটি শাহ মুহম্মদ সগিরে এবং লোর চন্দ্রানীতে অনুসৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও এটি ফিরে এসেছে।

দৌলত কাজীর তুলনায় আলাওলের রচিত গল্পাংশ অনেক শিথিল এবং নিষ্প্রভ। কথিত উপকথাটিতে শকুন্তলার গল্পের আদল ফিরে এসেছে। বিচ্ছেদের কাহিনিকে আলাওল গতানুগতিক মিলনে সমাপ্ত করেছেন। আলাওল সুফি শাস্ত্রে এবং সংস্কৃত পুরাণ ও সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তার রচনায় এ সমস্ত অভিজ্ঞান মুদ্রিত হয়েছে। অন্যদিকে দৌলত কাজীর ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনা তার রচনায় সহজ হয়ে মিশে গিয়েছিল।

দৌলত কাজীর ময়না ও চন্দ্রানী নারীসত্তার দ্বিবিধ পরিচয়কে চিহ্নিত করেছে। একদিকে ধর্মীয় অনশাসনে জাত সতীত্ব বোধ, অন্যদিকে নির্বাধভাবে জীবনকে উপভোগের উল্লাস এখানে দু'নারীর চরিত্রে খুঁজে পাই। ময়না সামাজিক অনুশাসনের কাছে তার আদর্শের কাছে কামনা বাসনাকে বলি দিয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিত চন্দ্রা স্বামী ছেড়ে পরপুরুষে লগ্ন হয়েছে। স্বামীর হত্যায় সে দুঃখ পায়নি। ভোগ এবং যোগ, সংযম এবং স্বৈরাচার, সতীত্ব বনাম লালসার দ্বন্দ্ব এখানে দু'নারী চরিত্রে চমৎকার ভাবে ফুটেছে।

বাংলা ছন্দ অলংকার ব্যবহারে সার্থক হয়েছেন দৌলত কাজী। প্রবাদ প্রতিম বাক্যাংশের ব্যবহারে ঘনত্ব পেয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে তার কাব্যভাষা। ফরাসি কিস্সার সঙ্গে ভারতীয় লোককথাকে, অভিযান কাহিনি, যুদ্ধের সঙ্গে প্রেমকে চমৎকার ভাবে মিশিয়েছেন। সুফি ভাবনা, ইসলাম সংস্কৃতির সঙ্গ হিন্দু যোগ-পুরাণ-সমাজভাবনকে তিনি সফলভাবে সমন্বিত করেছেন। হিন্দু সমাজের আচার আচরণ, সতীত্ব, সহমরণ এ কাব্যে মর্যাদা পেয়েছে। সগিরের কাব্যের ধর্মান্তরের উদ্দেশ্যে এখানে উচ্চারিত হয়নি।

পীর আউলিয়া, দেব দেবতার অলৌকিক কাহিনি ছেড়ে, ধর্মতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে দৌলত কাজী মানুষের কামনা বাসনার, ত্যাগের কাহিনিকে নিয়ে এলেন সাহিত্যে। মুসলমান হয়েও হিন্দুসমাজের কাহিনি রচনা করে, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচনার ভিত স্থাপন করলেন।

১০.৫. সৈয়দ আলাওল: কবি পরিচিতি

আরাকান রাজদরবারের কবি সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাংলার খ্যাতিকীর্তি কবি। দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্যটি তিনি সমাপ্ত করেন। এছাড়াও বহু গ্রন্থ তিনি হিন্দি, আর্বি-ফার্সি থেকে ভাষান্তর করেন।

তার আত্মপরিচয় পাই 'সেকেন্দার নামা' এবং 'সয়কুলমুলক বদিউজ্জমাল' গ্রন্থে। চট্টগ্রাম মতান্তরে ফরিদপুরের মুলুক ফতেহাবাদের জামালপুর গ্রামে কবি ষোড়শ শতকের শেষে জন্মান এবং ১৭৬৩ খ্রি. মারা যান। কবির পিতা রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একদা জলপথে পর্তুগিজ দস্যুদের আক্রমণে কবির পিতা নিহত হন এবং কবি বন্দী হন। বহু বাঁধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে আলাওল শেষপর্যন্ত রোসাঙে আসেন এবং সৈন্যবিভাগে কাজ নেন। আরাকানের অমাত্য মাগন ঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, পণ্ডিত সৈয়দ মুসা কবির গুণে মুগ্ধ হন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে আলাওল কাব্যানুবাদ শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি আরাকানের জেলে বন্দী জীবন কাটিয়ে আবার পূর্বমর্যাদা ফিরে পেয়ে কাব্যরচনায় নিমগ্ন হন।

তার সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-১৬৭০) এক ফার্সি গল্পের অনুসরণে লিখিত প্রেমকাহিনী।

হপ্ত পয়কর (১৬৬০) ফার্সি কবি নেজামী সমরকন্দীর রচনানুসরণে বাহরামের যুদ্ধ জয় এবং সাত বৌ-এর গল্প। তোহফা (১৬৬৩-৬৪) ফার্সি লেখক শেখ রুসুকের 'তুহফাতুন্নসা' নীতিকাব্যের অনুবাদ।

ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দের ফার্সিতে লিখিত কাব্য 'ইসকান্দারনামা' এর সরল অনুবাদ কাব্য হল 'সেকেন্দার নামা' (১৬৭২)। এখানে অনেক যুদ্ধের কথা এবং বিচিত্র সব গল্প পাই। আলাওলের এ সমস্ত রচনা মূলতঃ মুসলমান সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' (১৬৪৬) কাব্য বঙ্গভাষী হিন্দু-মুসলমান সমাজে সমভাবে আদৃত এবং গৃহীত হয়েছিল। এটি ছিল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দির উপভাষায় রচিত 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ।

বলাবাহুল্য, মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে আলাওল সর্বাধিক সংখ্যক কাব্য রচনা করেন। এযাবৎ তাঁর রচিত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য, একটি অর্ধাংশ কাব্য, একটি সঙ্গীত বিষয়ক খণ্ডকাব্য এবং ১৫টি পদ বা গীতিকবিতা সম্পর্কে জানা গেছে। তাঁর সমগ্র রচনা মূল উৎস ও পৃষ্ঠপোষকসহ একটি ছকে নিম্নরূপে দেখা যায়:

কাব্য	প্রকাশ কাল	পৃষ্ঠপোষক	মূল কাব্য	মূল কবি
পদ্মাবতী	১৬৪৮/১৬৫২	মাগন ঠাকুর (প্রধান অমাত্য)	পদুমাবত (হিন্দি)	মুহম্মদ জায়সী
সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল	১৬৫৮-৬৯	মাগন ঠাকুর ও সৈয়দ মুসা (রাজ-অমাত্য)	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (ফারসি)	-----
সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী	১৬৫৯	সোলায়মান (প্রধান অমাত্য)	মৈনাসত (হিন্দি)	সাধন
তোহফা	১৬৬৪	ঐ	তুহফাত-ই-নেসাঈহ (ফারসি)	ইউসুফ গদা
সপ্ত পয়কর	১৬৬৫	সৈয়দ মহাম্মদ খান (সৈন্যমন্ত্রী)	হফত্ পয়কর (ফারসি)	নিজামী গঞ্জবী
সিকান্দরনামা	১৬৭২	মজলিস নবরাজ (রাজ-সচিব)	সিকান্দরনামা (ফারসি)	নিজামী গঞ্জবী
রাগতালনামা	----	----	----	ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র
গীতিকবিতা				মৌলিক রচনা

১০.৬. পদ্মাবতী: কাব্য-কাহিনি

চিতোরের পদ্মাবতী এবং আলাউদ্দিনের কাহিনি এক জনপ্রিয় লোককথা। চিতোরের রাজা রত্নসেন স্ত্রী নাগমতীর সঙ্গে দিন যাপনের সময় সিংহল রাজকন্যা পদ্মিনীর রূপগুণের খ্যাতি শুনে এক শুকপাখি নিয়ে সিংহলে গিয়ে, পদ্মাবতীকে নিয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে পদ্মাবতীর রূপের কথা দিল্লির বাদশা আলাউদ্দিনের কানে পৌঁছায়। আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে রত্নসেনকে বন্দী করে নিয়ে যান, রত্নসেন কৌশলে পালিয়ে আসেন চিতোরে। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মাবতীকে

হাতিয়ে নেওয়ার বিফল চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। রত্নসেন ফিরে এসে দেওপালকে যুদ্ধে হত্যা করেন। কিন্তু নিজেও আহত হয়ে মারা যান। পদ্মাবতী নাগমতী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। ঠিক তখনই আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে রাজপ্রসাদে উপনীত হন। তিনি সহমৃতাদের জ্বলন্ত চিতায় প্রণাম করে ফিরে যান।

জায়সীর কাব্যে সুফি প্রতীকে চিতোর মানবদেহ, রত্নসেন জীবাত্মা, পদ্মিনী বিবেক, শুকপাখি ধর্মগুরু। এখানে নারী নিয়ে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। আলাওল ফকির ছিলেন। বহুক্ষেত্রে তিনি জায়সীর হুবহু ভাষান্তর করেছেন। কিন্তু আলাওলের কাহিনি, ঘটনা, চরিত্রে বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ ফুটে ওঠে। এ কাব্যে এগারোটি সুন্দর গান আছে। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে আলাওল ছিলেন দক্ষ; অলঙ্কার ব্যবহারে নিপুন। পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনায় আলাওল সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুসরণ করেছেন। বিঙ্গলের অষ্টমহাগণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদের নানা তত্ত্ব, জ্যোতিষ, স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনায় আলাওল বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, শিকার, হাতি, ঘোড়ার নানা খেলা এ কাব্যে চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশের ব্যবহার তার কাব্যভাষাকে দিয়েছে সংহতি। অনুবাদে তার কৃতিত্ব অসাধারণ।

আলাওলের প্রায় সব রচনাই অনুবাদমূলক। তথাপি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আলাওল এক অসাধারণ কবি।

আধুনিক যুগে যাঁরা আলাওলের কবি-প্রতিভা এবং রচনা সম্পর্কে আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন, এখন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়।

দীনেশচন্দ্র সেন

পদ্মাবতী কাব্যে আলাওলের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবি পিঙ্গলাচার্য্যের মগন, রগণ প্রভৃতি অষ্ট মহাগণের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশা অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন; আয়ুর্বেদশাস্ত্র লইয়া উচ্চাঙ্গের কবিরাজী কথা শুনাইয়াছেন; জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লগ্নাচার্য্যের ন্যায় যাত্রার শুভাশুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন: একজন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিবাহাদি ব্যাপারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের মত প্রশস্তি বন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তালিকা দিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দিয়াছেন। [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৩২১।]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মধ্যযুগের বাংলার কবিদের মধ্যে আলাওলের স্থান অতি উচ্চে। সংস্কৃত, বাংলা, আরবী, ফারসী ও হিন্দী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক এই মুসলমান কবির সমকক্ষ ভাষাবিদ সেই যুগে কোনও কবি ছিলেন না, একথা জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে।... ভাষাজ্ঞান ব্যতীত আলাওল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃতপিঙ্গল, যোগশাস্ত্র, তসউফ, কামশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, অশ্বচালন বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।... ভাষাজ্ঞান ও বহু গ্রন্থ রচনা এই দুই বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশেষ লক্ষণীয় কবি।... সকলের চেয়ে আশ্চর্য হই আমরা এই মুসলমান কবির অনিন্দ্য সাধু ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া। [পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৩৫৬]

সুকুমার সেন

মুসলমান কবিদের মধ্যে আলাওল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আলাওলের রচনায় অনাবশ্যক ইসলামি গন্ধ নেই।... দৌলত কাজী ছিলেন আসলে গীতিকবি, আলাওল প্রধানত কাব্যকথক। সুফী সাধক ছিলেন দুজনেই। আলাওলের লেখায় কবির আত্মপ্রবণতার পরিচয় আছে বেশী, পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও কম নেই। [ইসলামি বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, পৃ. ৩০]

গোপাল হালদার

তিনিই সভার শ্রেষ্ঠ কবি। 'সতীময়না'র শেষাংশ রচনায় তিনি কবিত্বে দৌলত কাজীর সমতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি, তা সত্য। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আলাওল তথাপি বৃহত্তম প্রতিভা। সে প্রতিভা বহুমুখী, সঙ্গীতে, নৃত্যে, দর্শনে বহু বিষয়ে তা স্বচ্ছন্দ; ভাবৈশ্বর্যেও তাঁর প্রেম গভীর; সুফী প্রেমোন্মাদনার ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সংযোগে তা চিত্তস্পর্শী। তাঁর কবিকৃতি ও বাণী-রচনাও অকৃত্রিম; বাঙ্গার কাব্যের সীমান্ত তিনি ক্লাসিক-ধর্মী বা শিষ্ট-বাণীরূপে মার্জিত করে যান। সর্বোপরি ধর্মসংকীর্ণতামুক্ত মানবিকতার এমন একটি ভাবলোক আলাওল সৃষ্টি করেছেন যা মধ্যযুগে দুর্লভ। তাই কবিকঙ্কণের মত মানব-চরিত্র রসিক না হলেও কিংবা পদাবলী কবিদের মত সুতীব্র হৃদয়াবেগের অধিকারী না হলেও, আলাওলই একমাত্র কবি যিনি সেই মধ্যযুগের পার থেকেও তাঁর উদার মানবিকতায় কতকাংশে স্মরণ করিয়ে দেন এ যুগের রবীন্দ্রনাথকে। [বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ১ম খণ্ড, ১৩৭০, কলকাতা, পৃ. ১৬৬]

মুহম্মদ এনামুল হক

মহাকবি আলাওল রোসাঙ্গ-রাজসভা কবিদের অন্যতম হইলেও বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবী, মহাপণ্ডিত ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা কবি বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও বিরল। ভাব-সম্পদ ও রচনা-পারিপাট্যে বাংলার খুব কম কবিই তাঁহার সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা রাখে। [মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ২৪১]

সৈয়দ আলী আহসান

আলাওল মধ্যযুগের সপ্তদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য প্রবাহে আলাওলের বিশিষ্টতা এবং প্রাধান্য নির্ধারিত এবং স্বীকৃত। জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দসম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের দক্ষতায় এবং কুশল শিল্পচর্চায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। যদিও তাঁর সমগ্রসৃষ্টির মধ্যে প্রধান গ্রন্থ কয়টি মৌলিক নির্মাণের গৌরব রাখে না, তথাপি প্রধানতঃ তৎসম শব্দের ব্যবহারে এবং গৃহীত বাংলা ছন্দের পরিচর্যায়, বুদ্ধি ও জ্ঞানগত নতুন নতুন সংযোজনে আলাওল মৌলিক কবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। [পদ্মাবতী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪]

ক্ষেত্রগুপ্ত

পদ্মাবতী কাব্যকে মাঝে মাঝে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বাতায়ন নামে চিহ্নিত করবার বাসনা জাগে। এ কাব্যে যেন ঘর থেকে বার করে আনে- সে পথ উদ্দাম উল্লাস, অট্টাহাস, প্রবল গতি ও বিচিত্র

দুঃসাহসিক অভিযানের পদচিহ্নে ধন্য। [প্রাচীন কাব্য: সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬০]

১০.৭. সামগ্রিক বিশ্লেষণ

আরাকান রাজসভার কবিদের আগে মানবজীবনের প্রেমকাহিনি রচেন শাহ মুহম্মদ সগীর, বাংলা কাব্যে নূতন সুর এনেছেন। কোরান এবং ফার্সি কাব্য থেকে উপাদান এনে, সেগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে সগীর বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নারীর কামনাবাসনা এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বিদ্যাসুন্দরে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ সুর শোনা যায়।

আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে ফকির-দরবেশী ভাবাপন্ন কবিরা বাংলা ভাষায় নানা ধরনের রচনা রচেন। এদের ভাষা-প্রীতি 'বাংলাদেশ' আন্দোলনের আদিসূত্র। সাম্প্রদায়িক ঐঐতিহ্য অমান্য করে দৌলতকাজী হিন্দু সমাজের কাহিনি নিয়ে লেখেন 'লোরচন্দ্রাণী'। আলাওল লেখেন 'পদ্মাবতী'। এ রচনাগুলিতে বঙ্গতথা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার-সাহিত্যিক ঐতিহ্য, যোগতন্ত্র, হিন্দু সতীত্বের আদর্শকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এমন কী সহমরণ গুরুত্ব পেয়েছে। এদের রচনা অনুবাদ হলেও নানা মৌলিক উপাদানে উজ্জ্বল। এ রচনাগুলি হিন্দু সমাজেও জনপ্রিয় হয়েছে। আলাওল আর্বি-ফার্সি-হিন্দি থেকে অনুবাদ করেছিলেন হপ্ত পয়কর, সেকেন্দারনামা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল। সবগুলিই অভিযান এবং প্রেমের গল্প।

তখনকার বাংলা কাব্যে দেবদেবীর প্রাধান্য ছিল। দৌলত কাজী এবং আলাওল সামাজিক মানুষের প্রেম ভালবাসার গল্প এনে, বাংলা সাহিত্যে মানুষ এবং তার বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাহ্য করলেন। 'বাংলায় হিন্দি ফার্সি রোমান্টিক কাব্য ধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ দরবারের দু'জন সভা কবি দৌলতকাজী এবং আলাওল' (সুকুমার সেন)।

১০.৮. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন-

- তসপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়া নূতনত্বের পরিচয় দেনদ -এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।
- সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবিদের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।
- শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যকৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করুন।
- রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনায় দৌলত কাজীর সাফল্যের পরিচয় দিন।
- আলাওলের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে তাঁর রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের গুরুত্ব বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

- 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যর কাহিনির উৎস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
- শাহ মুহম্মদ সগীরের প্রণয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
- একটি অসমাপ্ত কাব্য লিখ দৌলত কাজী বাংলা সাহিত্যে কেন স্মরণীয় হয়ে আছেন?
- আলাওলের বিচিত্র জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- টীকা রচনা করুন: আরাকান রাজসভার সাহিত্য

একক ১১ ❒ শাক্ত পদাবলী: রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত

১১.১. উদ্দেশ্য

১১.২. প্রস্তাবনা

১১.৩. শাক্ত পদাবলী: ঐতিহ্য, বিষয় ও দেশকাল

১১.৪. শাক্ত পদাবলী: সামাজিক পটভূমি

১১.৫. রামপ্রসাদ সেন

১১.৬. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

১১.৭. অনুশীলনী

১১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি শক্তিদেবীকে নিয়ে চূর্ণ কবিতার বঙ্গীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বাঙালি হিন্দু উচ্চবর্ণের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, বধূ নির্যাতন ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে মিশেছে শাক্তপদে। বাঙালির তান্ত্রিক ঐতিহ্য, মায়ের গুরুত্বের ও বিবরণ পাবেন এখানে। রামপ্রসাদ ছিলেন শাক্তপদের উদ্গাতা স্রষ্টা। আর কমলাকান্ত ছিলেন তার সফল উত্তর সাধক। এ দুজনের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় হবেন আলোচ্য এককে।

১১.২. প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায় কাব্যরস বৈচিত্র্যে শাক্তপদাবলী উল্লেখযোগ্য। শাক্ত পদাবলীর সীমা মাত্র একশ বছর। বর্গির হাঙ্গামা, রাজকর্মচারীদের শোষণ এবং শাসনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেবী কালিকার প্রতি ভক্তের অভিযোগ, আবদার, আর্তি ও মুক্তি প্রার্থনা শাক্ত পদাবলিতে প্রকাশ পেয়েছে। রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত চক্রবর্তী এই দুই পদকর্তা সমাজের দুঃখ-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে শাক্ত পদাবলি রচনা করেছেন। এই রচনায় শাক্ততত্ত্ব যতটা না প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনা। এদের পদ রচনার বৈশিষ্ট্যও এখান থেকে জানা যাবে।

১১.৩. শাক্ত পদাবলী: ঐতিহ্য, বিষয় ও দেশকাল

বঙ্গের তান্ত্রিক ঐতিহ্য সুপ্রসিদ্ধ। পঞ্চোপাসক হিন্দুদের শক্তি উপাসনার রীতিটিও সুপ্রাচীন। তান্ত্রিকচক্রে জাতিবিচার ছিল না। ব্যক্তিগত গোপন তান্ত্রিক সাধনার সমান্তরালে সমাজে নানা দেবী পূজার চলন ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমসময়েই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখের পরিচালনায় কালিকা এবং বাসন্তী, দুর্গা পূজা বঙ্গে প্রাধান্য পায়। নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবায়ন ইত্যাদিতে, পুরাণে, সংস্কৃত কাব্য কবিতায়, চণ্ডীতে

শিবদুর্গার কাহিনি পাওয়া যায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ কবিতায় শাক্ত চূর্ণ কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম এবং পদাবলি, যুগ পরিবর্তনে প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। বৈষ্ণবতন্ত্র নিম্নবর্গে প্রাধান্য বিস্তার করে। বৈষ্ণবীয় আনন্দবাদ এবং মধুর রসের আবেদন সার্বিক যন্ত্রণার যুগে ম্লান হয়ে আসে। মধুররস ও পরকীয়া সাধনার বিকৃতিতে ব্যাভিচার সমাজে সৃষ্টি করেছিল প্রতিক্রিয়া। উপরন্তু কৃষ্ণ বা চৈতন্যকে বাস্তব জীবনে সমস্যা জানানো 'হেতুভক্তি' হিসাবে নিন্দিত হতো। মোঘল শাসনের অবসানের মুহূর্তে বর্গীয় আক্রমণ, নানা দস্যুর অত্যাচার, খাজনার উৎপীড়নে বেঁচে থাকা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এসব দেবীর নেতিবাচক লীলা হিসাবে দেখে ভক্ত, তারই কাছে এর প্রতিবিধান চেয়েছিল। তিনিও উমা-মেনকা-হিমালয় রূপে জীবনের এ তিক্ততা ভোগ করেন। ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে দেবতা মানবায়িত হয়ে ছিল। ভক্ত তার সঙ্গে স্থাপন করেছিল মানবিক সম্পর্ক। আদিশক্তি জায়া-জননী-কন্যা রূপে লীলা করেন। ভক্তকে স্নেহ প্রেমে মায়াবদ্ধ করেন, আবার মায়ামুক্ত করেন। বীরাচার তন্ত্রে জায়া রূপে সাধনা ছিল। কিন্তু সাংসারিক মানুষ বাৎসল্যে কন্যারূপে এবং মাতৃরূপে দেবীকে চেয়েছিলেন। মায়ের আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া, রুঢ় জীবনের সমস্যা থেকে এক নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ছিল। বঙ্গের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কে ব্যাভিচারের কোনো সম্ভাবনা নেই; স্বার্থবুদ্ধি নেই। দেশ, ভাষা সবই মাতৃসম্পর্কে চিহ্নিত হয়। সমস্যা এড়িয়ে বৈষ্ণব বৈরাগি হয়ে তখন পালাবার জায়গা ছিল না। মানুষ দুঃখকে স্বীকার করে, শক্তি সঞ্চয় করে থারের সাগর লঙ্ঘন করতে চেয়েছিল। পরবর্তী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে ভবানী/ কালিকা প্রেরণা দিয়েছিলে।

অষ্টাদশ শতকে বর্ধমানের রাজা, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ শাক্ত ঐতিহ্যের সমর্থক হিসাবে রচয়িতাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরও শাক্তপদ রচেছিলেন।

শাক্তগানের একাংশ আগমনী বিজয়ার গান, অন্য অংশে দেবীর রূপ-স্বরূপের ব্যাখ্যান এবং ভক্তের আকুতি। শিব পার্বতীর পুরাণ কথা বঙ্গের হিন্দু উচ্চবর্ণের কুলনী প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, বধূ উৎপীড়ন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে। এখানে হিমালয়ের ছেলে মৈনাক আত্মহত্যা করে; নিরুপায় কুলীন দম্পতি বৃদ্ধ, নেশাখোর, ভিখারি শিবের সঙ্গে আট বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়। গৌরীর গয়না নেশারু স্বামী বেচে দেয়। নির্যাতনে, অনাহারে গৌরী কালী হয়ে, উন্মাদ হয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান, মদ খান। রক্তসম্পর্কে বিয়ে না হওয়ায় হিন্দু উচ্চবর্ণের মেয়েরা গ্রাম পরিজন ছেড়ে দূরে যেত। সেকালের দুর্গাপূজার সময় মেয়েরা আসতো মায়ের কাছে। দুর্গাপূজা ছিল মেয়েদের পুনর্মিলন উৎসব। এ পটভূমিকায় আগমনী বিজয়ার গান এক অনবদ্য শিল্পরূপে পেয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন চমৎকার করে বলেছেন যে আশ্বিনের বঝরা শেফালির মতো মায়ের কাছে আসার জন্য বালিকা বধূদের অশ্রুজলে রচিত আগমনী বিজয়ার গান, 'তৎকালীন বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।'

১১.৪. শাক্ত পদাবলী: সামাজিক পটভূমি

অষ্টাদশ শতকের নিরন্ন বাংলার নিভৃত পল্লি শাক্ত পদাবলীর সুতিকাগার। বাংলার সেদিন ঘোর দুর্দিন। ১৭২৫-এ মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়েছে। ১৭৩৯-এ আলিবর্দী খাঁ কেড়ে নিলেন বাংলার মসনদ।

বর্গীর অত্যাচার শুরু হল। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে' প্রভৃতি ছড়ায় আজও তার ভয়াবহ রূপটি অক্ষয় হয়ে আছে। ইতিমধ্যে ১৭৫৬তে তরুণ বিলাসী যুবক সিরাজ-উদ্দ্ধ-দৌল্লা মসনদে বসলেন। বিদেশী শক্তির আবির্ভাবের সাথে সাথে একদিকে যেমন প্রশাসনিক অরাজকতা শুরু হল। অন্যদিকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বহু মানুষ প্রাণ হারালো। এমনই এক নিদারুণ মুহূর্তে বাংলার মাটিতে শাক্ত পদাবলীর সুর বাঁধলেন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-১৭৭৫)। তারপর শতাধিক বৎসর ধরে নানা কবি নানা সময়ে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁদের কোন রচনাতেই এই ব্যাপক রাজনৈতিক উত্থান-পতন বা অর্থনৈতিক ভাঙনের ছবি ধরা পড়েনি। কিন্তু কেন?

আসলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে যায়, বাঙালি লেখক তাকে গ্রাহ্যই করেননি- এই ছিল মধ্যযুগের বাঙালি লেখকদের প্রায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে দুঃখ করে লিখতে হয়েছিল 'বাঙালীর ইতিহাস নাই'। শাক্ত কবিদের কাছে আমরা ইতিহাস দাবী করি না। তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে দেশে দেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন হল, ইংরেজের হাতে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হল। দুর্ভিক্ষে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল, অথচ তার কোন ছায়াপাতই কি হতে পারে না কবি চিত্তে? বস্তুত পক্ষে রাজনীতি তখনও মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। কারণ রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্রে সেদিন জনগণের খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। অর্থনীতির গূঢ় তত্ত্ব সাধারণ মানুষ বুঝতো না। তাই সামাজিক জীবনের নানা জটিলতাই সেদিন শাক্ত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল।

শাক্ত সাহিত্যের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে গৌরীদান প্রথা, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা, আর এইসব সামাজিক কুপ্রথায় নিষ্পেষিত হত পুরুষশাসিত নারী সমাজ। তাই বালিকা বধূদের কান্না, সন্তানহারা জননীর হাহাকার, বৎসরান্তে একবার কাছে পেয়েও কন্যাকে ছেড়ে দেবার মর্মান্তি যন্ত্রণা, বৃদ্ধ, মাতাল স্বামীগৃহে সতীনের গঞ্জনা শুধু শাক্ত সাহিত্যেই নয়, সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যের তটভূমিকে স্পর্শ করেছিল।

স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ মানতে গিয়ে সে যুগের বাংলার মেয়েরা বালিকা অবস্থাতেই বধূ হয়ে যেত, এই সামাজিক কুপ্রথার ইঙ্গিত রয়েছে শাক্ত সাহিত্যে, তাই শিশুকন্যা উমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে মা মেনকা ভেবেছে- 'উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে মা মা বলে।' কৌলিন্যপ্রথা এক ভয়ংকর ব্যাধির মতো সমাজের বুকে চেপে বসেছিল। ফলে বালিকা বধূদের বিয়ে দিতে হত বহু পত্নীক বৃদ্ধ বরের সঙ্গে। উমারও বিয়ে হয়েছে-সহায় সম্বলহীন এক বৃদ্ধ স্বামী মহাদেবের সঙ্গে। তাই তার মা অনুযোগ করেন গিরিরাজের কাছে-

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে কেমনে রয়েছ ঘরে
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে।
জানতো জামাতার রীতি, সদাই পাগলের মতো
পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লয়ে যায় তারে
কত আছে কপালে উমার

শুনেছ নারদের ঠাঁই, গায় মাখে চিতা ছাই
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণীহার
একথা কহিব কায়, সুধা ত্যাজি বিষ খায়
কহো দেখি এ কোন বিচার?

এমন অনাচারী স্বামীর সঙ্গে শুধু উমাকে নয়, সে যুগের শত শত বাঙালি রমণীকেই ঘর করতে হতো। এর পরিচয় আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যেও পাই। দেবী অন্নদা নিজের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেছেন

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

শুধু অনাচারী স্বামীর অবহেলা নয়। সেইসঙ্গে ছিল স্বামীর গৃহে সতীনের জ্বালা, শাক্ত সাহিত্যের নানা পদে সতীনের গঞ্জনার আভাস রয়েছে। মা মেনকা গিরিরাজকে বলেছেন,

একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা
যাতনা প্রাণে কত সয়েছে,
তাহে সুরধনী স্বামী সোহাগিনী,
সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।

বহুপত্নীক স্বামীর গৃহে সতীনের গঞ্জনার কথা শুধু এখানেই নয়। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত কাহিনি কাব্যেরই বিষয় হয়ে উঠেছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত এই সতীন যন্ত্রণার কথা আমরা পেয়ে থাকি।

পুরুষ শাসিত সমাজ বলেই নারী নানা ভাবে লাঞ্ছিত হতো, তাই উমা বৎসরের একাধিকবার পিতৃগৃহে আসতে পারে। আর সে কারণেই সমস্ত বৎসর মা মেনকাকে অপেক্ষায় থাকতে হয়। বৎসরান্তে গিরিরাজ উমাকে আনতে যায়, তবু মায়ের মনে আশঙ্কা থেকে যায়। তাই মা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভোলানাথের কাছে গৌরীকে নিয়ে আসবার প্রার্থনা জানাতে বলে গিরিরাজকে-

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পুজবে, বিশ্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে
ভুলবে ভোলার মন
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তার ধন।

বস্তুত পক্ষে সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের পদতলে। নারী ছিল পণ্য স্বরূপ। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের মালিকানায় নারীকে জীবন কাটাতে হবে- মনুর এই বিধান, মধ্যযুগে

বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর এই সামাজিক অবস্থানকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। মেনকার কথায় তার আভাস রয়েছে-

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বোঝে মন।
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার।।

লক্ষণীয় 'তনয়া পরের ধন' এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থানের আভাষ, সেইসঙ্গে এই উক্তিতে নারী জীবনের অসহায়তা ফুটে উঠেছে, যখন শুনি-

আমি অচলা নারী, অচলের নারী
যেতে নারি কৈলাসপুরে আনিতে তোমারে।

তখন শৃঙ্খলিত নারী সমাজের পরাধীনতার বেদনাকে আমরা অনুভব করি। বৎসরান্তে অপেক্ষমান মেনকা, এ অপেক্ষা উমাকে ঘরে আনার অপেক্ষা। কিন্তু ঘর ছেড়ে পথে নেমে উমাকে আবাহন করা সম্ভব নয়, তাই ঘরে বসে করাঘাত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, এই করাঘাত শুধু মেনকার নয়, পুরুষ শাসনে বন্দি সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে শৃঙ্খলিত সমগ্র নারী সমাজের যন্ত্রণা কাতর হাহাকার-

কামিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি।
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।।

সমস্ত মধ্যযুগের নিষ্পেষিত নারী সমাজের অসহায় আর্তি এখানে বিধাতার দরবারে কান্না হয়ে ঝরে পড়েছে।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে চলেছিল শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদজনিত দলাদলি। এই সাম্প্রদায়িকতার দিনে শাক্ত কবিরা একটি অসাম্প্রদায়িক তটভূমি গড়ে তুলতে চাইলেন- বিশেষত কবি রামপ্রসাদের গানে একটি সুন্দর সমন্বয়ের সুর শোনা যায়- 'এই যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।' কিংবা 'জীবমাত্র মায়ের ছেলে কেহ নয় তার পর ভাবনা' প্রভৃতি পদগুলি সমকালীন সমন্বয়ী ধর্ম সাধনার। কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও আমরা অনুরূপ সমন্বয়ী ধর্ম ভাবনার ইঙ্গিত পাই।

১১.৫. রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)- চব্বিশ পরগনার হালিশহর কুমারহট্টে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তার দু'ছেলে, দু'মেয়ে ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতার কোনো এক জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে নিষ্কর জমি দেন; দেন কবিরঞ্জন উপাধি। রামপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে রাজসভায় যাননি। দারিদ্র্যও তাকে ছেড়ে যায়নি। গ্রামে তার গানের প্যারোডি রচতেন বৈষ্ণব আজু গোঁসাই। দ্বিজ রামপ্রসাদ এবং কবিয়াল রামপ্রসাদের রচনা তার গানে মিশে আছে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জীবনী ও গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর রচিত তিনশত গান সংগৃহীত হয়েছে।

কালী কীর্তন (বিদ্যাসুন্দর) এবং কৃষ্ণকীর্তন নামে তাঁর দু'টি ক্ষুদ্র কাব্য রয়েছে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি মূলত শাক্ত পদাবলির ভগীরথ হিসাবে। রামপ্রসাদ বাংলা গানের বিশিষ্ট এক রীতির স্রষ্টা। রামকৃষ্ণদেব যথার্থই

বলেছেন, 'রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ।' তাঁর গান ছিল তাঁর সাধক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তাঁর রচিত শাক্ত গানকে (১) আগমনী-বিজয়া (২) দেবীর স্বরূপ (৩) সাধন তত্ত্ব (৪) দেবীর রূপ (৫) ভক্তর আকৃতি প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করা হয়।

কুলীন প্রথা, গৌরীদান, বহুবিবাহ, সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিকায় হিমালয়-মেনকা-গৌরী-শিবের চূর্ণ কাহিনি রূপ পেয়েছে আগমনী-বিজয়ার গানে। মেয়েকে আনার জন্য, দেখার জন্য মা এবং মেয়ের যন্ত্রণা আগমনী গানের বিষয়। বিজয়ার মেয়ে এসে তিনদিন থেকে চলে যায়, সুবর্ণপ্রতিমা বিসর্জিত হয় জলে। মায়ের কাঁদনে চারপাশ যন্ত্রণাক্ত হয়। এবিষয়ে কবির পদ কম হলেও তা বাৎসল্য রসে এবং বঙ্গের সমাজচেতনার প্রক্ষেপে অসাধারণ।

দেবীর রূপ এবং স্বরূপ বর্ণনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। নানাভাবে দেবীর রূপ ও স্বরূপ বর্ণনার পর তিনি লিখেছেন-

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে
মা বেটী কি মারি মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে তিনি শ্যাম-শ্যামাকে অভিন্ন করেছেন। এ মুক্ত বুদ্ধির পথে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামপ্রসাদের স্মরণীয় রচনা হল তার ভক্তর আকৃতি। এ পর্যায়ে দেবীকে সাক্ষাৎ গর্ভধারিনী করে গ্রাম্য বালকের মতো কবি তাকে আনন্দের লোভ দেখিয়ে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। জীবনের সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে কলহ করেছেন। কিন্তু অন্তে কালভয় হরণে তারই শরণ নিয়েছেন। উকিল ও কর্মচারী, মূল্যবোধহীন সমাজের এ গান এক গুরুত্ব পূর্ণ তথ্যচিত্র। এখানকার গ্রামীণ জীবন চিত্তে কাল্পনিকতা নেই। বাস্তব গ্রামের নিম্নবর্গের 'অঙ্গবিন্যাসে রক্তমাংস উঠিয়া যায় নাই।' বৈষ্ণব বাৎসল্যে বৃহত্তর আর্থসামাজিক পটভূমিকা না থাকায়, রামপ্রসাদের বাৎসল্য রসের পদ তুলনায় জীবন্ত এবং গভীর। তার গান শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়, বাস্তবের ধূলায় তার আসন পাতা। এ পর্যায়ের পদে তত্ত্ব, বাস্তবতা এবং কাব্যরসের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। তাঁর কাব্য মানব জমিনে সোনা ফলানোর অন্য নাম।

নিরাভরণ কথ্য ভাষাভঙ্গী এবং লৌকিক ছন্দে রামপ্রসাদের পদ, এসময়কার সালঙ্কার কাব্যভাষা থেকে ভিন্ন স্রোত নির্মাণ করেছে। তার কাব্যভাষায় প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার বাক্যকে কাব্য করে জীবন ঘনিষ্ঠ করেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'যে তার জীবনের অনেক গল্প নিয়ে তিনি লোকজীবনে বেঁচে আছেন। 'তাঁর গানগুলি উদার আকাশের মত বিশাল, সরল সুরের হাওয়ায় মন্ত্রের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা বিক্ষোভ বিদ্বেষ দূর করে দেয়।'

ফার্সি ইংরাজি শব্দ দিয়ে নষ্ট বিচার ব্যবস্থাকে বর্ণেন তিনি-

আমায় ফিকিরে ফকির করে বসে আছ রাজকুমারী
হুজুরে উকিল যে জমা ডিসমিশে তার আশায় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যে রূপে মা আমি হরি।।
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ-তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।।

তত্ত্ব কথাকেও তিনি বাস্তবের উপমায় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেন-

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে

তুমি দম সামর্থে এক ডুব যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে শিব যুক্তি মতন চাইলে।।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার লোভে সদাই চলে
তুমি বিবেক হল্ দি গায়ে মেখে যাও ছোবে না তার গন্ধ পেলে।।

১১.৬. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

বর্ধমানের কালনা গ্রামে আঠারো শতকের শেষার্ধে কমলাকান্তের জন্ম। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে পঞ্চাশ বছর বয়সে তার দেহাবসান ঘটে। বাল্যে পিতৃহীন হয়ে তিনি বর্ধমানের চান্নায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। টোলে শিক্ষান্তে তিনি টোলে শিক্ষকতা করতেন, তান্ত্রিক সাধনা করতেন এবং শাক্তগান লিখতেন। বর্ধমানের রাজাদের তিনি সভাপণ্ডিত এবং গুরুস্থানীয় ছিলেন। প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে এক তত্ত্বকাব্য লিখেছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর কমলাকান্তের প্রায় তিনশ পদের এক গ্রন্থ মুদ্রিত করেছিলেন বর্ধমান রাজারা। কমলাকান্তকে নিয়ে লোককাহিনি প্রচলন আছে।

শাক্তগানের আগমনী বিজয়া পর্যায় সূচিত করেছিলেন রামপ্রসাদ। বহুপদ লিখে এ পর্যায়টিকে সুগঠিত করে পূর্ণতা দেন কমলাকান্ত। বাৎসল্য শাক্ত ঐতিহ্যের প্রধান রস। একে সাময়িক সমাজচিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে জটিল এবং বিচিত্র পূর্ণতা দেন কমলাকান্ত। প্রবীণ মেনকা-হিমালয়ের ধনজন হীনতা, অসহায়তা; হিমালয়ের বাঙালি পুরুষের মতো আলস্য ও উদ্যোগ হীনতা দেখিয়েছেন কমলাকান্ত। এ দম্পতির ছেলে মৈনাকের অকালমৃত্যুর ফলে একমাত্র মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল মেনকার। বৃদ্ধ, দরিদ্র স্বামীর ঘরে, সতীনের সঙ্গে দিনযাপনে বালিকা গৌরীর দুর্দশার কথা স্মরণ করেন মেনকা। মেয়ে না আনার জন্য প্রতিবেশীরা দেয় খোটা। লোকমুখে ভেসে আসে মেয়ের নানা দুঃসংবাদ। স্বামী ছাড়া কেউ নেই মেনকার কথা বলার। তার দিন কাটে দুর্ভাবনায়, রাত কাটে দুঃস্বপ্নে।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতনে কত ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল
আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে।।
মনের তিমির নাশি উদয় হৈল আসি
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি চেতনে হারালাম গিরি হে

ধৈরয় না ধরে মম জীবনে।।
আর শুন অসম্ভব-চারিদিকে শিবা রব হে
তার মাঝে আমার উমা একাকিনি শ্মশানে।
বল কি করিব আর কে আনিবে সমাচার হে
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে।।

এ যন্ত্রণার পদেও কবি তত্ত্ব মিশিয়েছেন অনায়াসে। বৈষ্ণব পদকর্তার মতো ভণিতায় মেনকা গৌরীর লীলা কাহিনিতে অংশ নিয়ে প্রবোধ দিয়েছেন মেনকাকে। স্বপ্নে মেয়ে বরণ আভরণ হারিয়ে কালিকা রূপে দেখা দেন। ধ্যানে ইষ্টকে পেয়ে চেতনে তাকে হারিয়ে হাহাকারের মধ্যে মিশে যায় সাধন তত্ত্ব আর মাতৃশোক।

মেনকা বারবার মেয়ে আনতে বলে স্বামীকে, তার আর্তনাদে মিশে যায় সে সময়ের তাবৎ নারীর যন্ত্রণা-

'কামিনী করিল বিধি তেই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রনা সহিতে।'

বিজয়া পর্বে মেয়ে এসে প্রতি-অনুযোগ করে, স্বামী ঘরের দারিদ্র্য গোপন করে, নিজের গর্ব করে। দেখতে দেখতে বিজয়ার মরণশেল আসে। বসুধালিঙ্গন করে মায়ের হাহাকারে ভরে যায় চারদিক। এ পর্বগুলির বিস্তারিত পদ লিখেছেন কমলাকান্ত।

দেবীর রূপ ও স্বরূপ বর্ণনায় তিনি দক্ষতা ও কাব্য কুশলতা দেখিয়েছেন। শ্যাম শ্যামাকে তিনি একাকার করেছেন। মনমোহিনী এলোকেশী কালী তার পদে অপরূপা। কমলাকান্ত মৃত্যুরূপা কালীর বর্ণনায় মাধুর্য এনেছেন। তার ভয়ঙ্করী রূপকে শুভঙ্করী করেছেন। ভক্তের আকুতিতেও তিনি বিশিষ্ট-

'মজিল মনভ্রমরা কালীপদলীন কমলে
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে।'

তিনি,

'কভু বজ্রপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশি
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।'

রামপ্রসাদের কাব্যভাষা ছিল সহজ, সরল, অপ্রসাধিত। সে তুলনায় কমলাকান্তের ভাষাও ছন্দ মার্জিত, সংহত, সংযত। তিনি সাধক; কিন্তু সচেতন শিল্পীও বটে। কিন্তু তার ভাষায় অষ্টাদশ শতকীয় নিষ্প্রাণ অলঙ্কারের মল্লক্রীড়া নেই। রামপ্রাদের মতোই তিনি একজন স্মরণীয় কবি-সাধক। পরবর্তীকালে গিরিশ চন্দ্র, মধুসূদন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বহুজন শাক্তপদ লিখছিলেন।

১১.৭. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন-

- বাংলা সাহিত্যে রামপ্রসাদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
- শাক্ত পদাবলির সফল কবি হিসাবে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের বিচার করুন।
- শাক্ত পদাবলীর প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
- 'সামাজিক জীবনের নানা জটিলতাই শাক্ত সাহিত্যের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল'- মন্তব্যটি বিচার করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-

- রামপ্রসাদের 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
- 'আগমনী' পর্যায়ের গানে কমলাকান্তের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।
- তৎকালীন বাঙালি সমাজের প্রতিচ্ছবি কীভাবে শাক্ত পদে উঠে এসেছে তা অতিসংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- শাক্তপদের উদগাতা স্রষ্টা কে?
- শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব কখন হয়?
- রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান লিখুন।
- 'রামপ্রসাদ গানে সিদ্ধ' , উক্তিটি কার?
- রামপ্রসাদের গানের প্যারোডি রচনা করতেন কে?
- রামপ্রসাদের জীবনী ও গান কে সংগ্রহ করেন?
- রামপ্রসাদের দুটি কাব্যের নাম লিখুন।
- 'সাধকরঞ্জন' কাব্যটির রচয়িতা কে?
- কমলাকান্ত কোন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন?
- কমলাকান্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন কোন কবি?

একক ১২ ❒ বাউল গান: লালন সাঁই, হাসন রাজা, দুদ্দু সা

১২.১. উদ্দেশ্য
১২.২. প্রস্তাবনা
১২.৩. বাউল গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য
১২.৪. লালন সাঁই
১২.৫. দুদ্দু সা: জীবন ও রচনা
১২.৬. হাসন রাজা
১২.৭. অনুশীলনী
১২.৮. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.১. উদ্দেশ্য

বাউলদের নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার উত্তর হিসাবে এ পর্যায়টি পড়া যেতে পারে। চর্যাপদের কাল থেহে বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাউলদের দেখা মেলে। তারপর এখানে এসে মিশেছে বেসরা সুফিদের মধ্যপ্রাচ্যের নানা সমধর্মী ঐতিহ্য। সমন্বয় এবং মানবতা বোধ, ইহদেহবাদ বাউল দর্শনের মূলকথা। তাদের বিষয়ে সাধনার বিষয়গুলি এ পর্যায়টি পাঠ করলে জানা যাবে।

জানা যাবে লোক জীবনের মহাকবি লালন সাঁই-এর পরিচয়। তাকে তুলে ধরায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে লালনের প্রভাব নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

লালনের শিষ্য দুদ্দুসা'র তীব্র সমাজচেতনা বাউল ভুবনের আরেক দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে।

বাঙালি বাউল হাসন রাজা আরেক বর্ণময় চরিত্র এবং বঙ্গের অন্যতম লোক দার্শনিক। তার পরিচয় মিলবে এ পর্যায়টিতে।

১২.২. প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে এক ধরনের সাধক সম্প্রদায় বাউল সংগীত রচনা করেন। এগুলো মূলত আধ্যাত্মিক পর্যায়ের গান। বাংলার সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট সম্পদ উৎকৃষ্ট এই বাউল সংগীত। বাউল সাধক সম্প্রদায় ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। তারা ঈশ্বরের ভাবরসে মাতাল। কেউ কেউ বাউলদেরকে বায়ুরোগ গ্রস্ত বলে থাকেন। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফি আউলিয়া সম্প্রদায় এবং আরও অনেকের সাধনা এই বাউলগান। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশিষ্ট বাউল সাধক লালন ফকিরের গানকে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন। 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে'-এটাই বাউল সাধনার মূল কথা। লালনের গানে আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে, তবে তাঁর বলিষ্ঠ ভক্তিচেতনা মানুষকে মূল্য

দিয়েছে। লালনের মতোই অধ্যাত্মমার্গের বাউল সাধক ছিলেন হাসন রাজা, দুদ্দুসা। এরাও কিছু উৎকৃষ্ট বাউল গান রচনা করেছেন। লালন লোকজীবনের মহাকবি, লালনের প্রিয় শিষ্য দুদ্দুসা বাউলগানের প্রচারে ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন আর রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হাসন রাজা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সব মিলিয়ে বাউলগান বাংলা দেশের এক বিশিষ্ট সাহিত্য সংগীত।

১২.৩. বাউল গানের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বজ্রকুল-রক্তকুল-বৈতুল্যবাদী, শৈব-বৈষ্ণবের বাতুল বেসরা সুফিদের আউল এবং সমোচ্চারিত বহু শব্দ বাউল শব্দে আশ্রয় নিয়েছে। শব্দটির মধ্যে রক্ষণশীলদের অবস্থা এবং সাধকদের প্রতিবাদ মিশে আছে।

বাউল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ এক লোকধর্ম এবং জনপ্রিয় লোকগান। রক্ষণযোগ্য মূল্যবান শিল্প হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাউলগান স্বীকৃত হয়েছে। দু'বঙ্গের প্রায় সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান সমাজে বাউল, ফকির, সাধু, শব্দগান, ভাবগান, মালজোড়া, বিচারগান, তুক্কা প্রভৃতি ভিন্ন নামে আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নানা পরিচয়ে এ মতের সাধক এবং গায়কদের খুঁজে পাওয়া যায়। এদের রচিত পদাবলি এবং সাধনার পুঁথি বঙ্গভাষার একক বৃহত্তম সম্ভার। এখানে হিন্দু মুসলমানের নর-নারীর বা তদ্বিপরীতে গুরুশিষ্য হয়। এটি পৈতৃক ধর্ম নয়, গুরুজাতীয় ধর্ম। যে কোনো ধর্ম-বর্ণের নরনারী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে এক দলে পরিণত হয়। জাতবর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভাগ, বৈদিক/ শরিয়তি আচার বাদ দিয়ে এখানে গুরুদের সদাচারে জীবন যাপিত হয়। প্রচলিত সমাজে শিথিলভাবে সংযুক্ত থেকে অথবা গোপনে অনেকে বাউল চর্যা পালন করে। অনেকে ভেক সন্ন্যাস নিয়ে (খেলাফতি) খানকা বা আখড়ায় আলাদা জীবন যাপন করে। এ জীবনে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা আচার মানা হয় না। তারা বেদ/শরিয়ত বিরোধী জীবনযাপনে বেশ, খাদ্য, চর্যায় বিশিষ্ট। অন্তরঙ্গ গোপন সাধনায় তারা দেহমনকে বদলান। এ বদলে তারা আত্ম সর্বস্বতা ছেড়ে সবার সঙ্গে মিলে, অন্যকে সুখী করে, এক নিন্দা হিংসামুক্ত শান্ত জীবন যাপন করতে চান। দেহের রোগ এবং মনের শোক নাশ করে বাউল সাধনা। বাউল তত্ত্ব শাস্ত্রনির্ভর বিশ্বাসকে বলে অনুমান। কেননা কল্পিত ঈশ্বর, পূর্ব-পরজন্ম ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে প্রমাণিত হয় না। তারা প্রামাণ্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় বা তত্ত্বকে মানে। তা হল বর্তমান। বাউল বর্তমান মানে, অনুমান মানো। তারা ভারতীয় লোকায়াত দর্শনের অনুসারী। তারা ইহদেহবাদী; গুরুবাদী। কল্পিত ঈশ্বর বা দেব-দেবতা নয়, বাউল মানুষের সেবাপূজা, উপাসনা করে। চৈতন্যের সর্বত বিকাশ মানবদেহে, তাই মানুষ সবার উপরে। দেহের চৈতন্য সত্তাকে দেখতে, জানতে ও বুঝতে চায় তারা। পার্থিব বস্তুসম্ভারে নয়, মহাসুখ নিহিত থাকে মানবীয় সম্বন্ধে। মরণশীল জীবনে এ আনন্দের অমৃতকে তারা খোঁজে। দেহে মনের মানুষকে, স্রষ্টাকে খোঁজার অন্য নাম বাউল সাধনা। মন্দির মসজিদে না গিয়ে তারা দেহকে শুদ্ধ করে দেবালয় বানায়।

বঙ্গে বাউলের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র, কর্তৃত্ব, আচার-অনুষ্ঠান নেই। নানা ছোট ছোট দল নানা ভিন্ন নামে, সাজপোশাকে, বাদ্যযন্ত্রে, নৃত্য গীতরীতিতে দেশের সর্বত্র দৃশ্য হয়। বড় মেলা, মহোৎসবে, সাধুভাষায় এরা সমবেত হয়। নানা বর্ণের গাভীর মতো বাইরে বাউলদের বহু বৈচিত্র্য। কিন্তু অন্তরঙ্গে বহুবর্ণ গাভীর এক বর্ণ দুধের মতো মানুষ ভজনার ঐতিহ্য এদের। ধর্মের আচার, বিধি, জাতবর্ণ বিভাগ অগ্রাহ্য করে

তারা মানুষকে এক জাতি বলে প্রচার করে। ইহদেহের মহিমা গায়।

আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নানা ভিন্ন নামে এদের চিহ্নিত করা হয়। এ নামগুলিকে অনেকে সাধনার স্তর বলে থাকেন। অনেকে চারভূতের কোনোটিকে বেশি গুরুত্বের চিহ্ন কলে এ নামকে দেখে থাকেন। নাথ, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সুফি, বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে সহবাসিতার নানা চিহ্ন বাউলের মতাদর্শে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু এসব ধর্মশাস্ত্রের প্রসঙ্গ বা চরিত্রগুলি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করে সাধক। প্রাগুক্ত সম্প্রদায়ের একটিও নয় বাউল। তারা বঙ্গের এক স্বাধীন লোকতন্ত্র। বাউলের আখড়ায় সুফি বৈষ্ণবে হয় কোলাকুলি। বাউল গানে বাঙালি মনের নিভৃত ভুবনের গোপন দ্বার খুলে যায়।

শাস্ত্রীর ধর্ম আচারের ভিত্তিতে মানুষকে খণ্ড করে। আচার মুক্ত বাউলেরা বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, ভাষা, লিঙ্গ বিভাজন অগ্রাহ্য করে মানুষকে এক জাতি বলে। স্বল্প উপাদানে, দেহকে নীরোগ রেখে বাউল জীবনকে বাসযোগ্য করে তুলতে চায়। কিন্তু শাস্ত্রীয় ধর্ম, ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে, এককে অন্যের চাইতে বেশি ভোগে প্রবৃত্ত করায়। এতে একে অন্যকে বঞ্চিত, শোষণ করে। ফলে হিংসা এবং রণরক্তের পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু ভোগের পদ্ধতি না জেনে, রিপুইন্দ্রিয়ে তাড়নায়, মনের অতৃপ্তিতে ব্যক্তি পৌঁছায় যমের দুয়ারে। কাম হরণ, ধ্বংস মত্ত হয়। দেহ ক্ষয় করে নির্বিচারে বহু সন্তানের জন্ম দেয়।

এ দুনিয়াদারীর বিরুদ্ধে ইমানদারীর, আসমানদারীর প্রস্তাব দেয় বাউল। রচনা করে হিংসার বিরুদ্ধে প্রেমের সনদ।

১২.৪. লালন সাঁই

লোকজীবনের মহাকবি লালন সাঁই রবীন্দ্র-নজরুলের মতোই দু'বঙ্গর সংস্কৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। বাংলাদেশের তিনি গণ অধিনায়ক। ছেউড়িয়ায় তাঁর সমাধি বাংলাদেশের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। দোলের সময় এখানে এক মেলা বসে এবং উৎসব হয়। শ্বেত পাথরের সমাধি সংলগ্ন বিশাল গৃহে তার নামে স্থাপিত হয়েছে গবেষণাগার।

লালনের গুরু সিরাজ সাঁই ছিলেন পালকিবাহক। হরিশপুরে ছিল তাঁর নিবাস। সেখানে তার মাজার আছে। তিনি লালনকে ভেক সন্ন্যাস দেন। সন্ন্যাসীরা তাদের পূর্ব জীবনের কথা বলেন না। লালনও তার শিষ্যেরাও বলেননি। ফলে তার জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, পারিবারিক পরিচয় নিয়ে মতভেদ শোনা যায়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমসময়ে কোনো এক বছরে (১৭৭২/১৭৭৪) কুষ্টিয়ার ভাড়ারা/চাপড়া গ্রামে হিন্দু পরিবারে তার জন্ম। বাল্যে তার পিতার মৃত্যু হয়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান লালনের বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। বহরমপুর/নবদ্বীপ/ খেতুরী মেলায় গিয়ে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। মৃত ভেবে সঙ্গীরা তাকে নদীতীরে বিসর্জন দিয়ে চলে আসে। মৃত ধরে নিয়ে মা-বৌ তার শ্রাদ্ধশান্তি করে। ওদিকে প্রায় মৃত লালনকে সিরাজ সাঁই বাড়িতে এনে চিকিৎসায়, সেবায় সুস্থ করে তুলেন। অনেক পরে গ্রামে ফিরলে মুসলমানের বাড়িতে অন্নজল গ্রহণের অপরাধে হিন্দুসমাজ তাকে জাতিচ্যুত করে। মা-বউও তাকে স্বীকার করতে পারেনা। লালন ফিরে আসে গুরুর কাছে এবং ভেক ফকিরি দীক্ষা নেয়। গুরু, লালন, লালনের শিষ্য হিন্দু বা মুসলমান সমাজ থেকে এসেছিল। কিন্তু কোনো ধর্ম গোষ্ঠীতেই সামিল ছিল না। নানা দেশ

ঘুরে লালন কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় আশ্রম বানান। জোলা সম্প্রদায় তার সমর্থক ছিল। আশ্রমে জীবনসঙ্গিনী লালমোতি, ধর্মকন্যা পিয়ারী, তার স্বামী ভোলাই এবং অন্যান্য শিষ্যেরা থাকত। গান, কবিরাজি চিকিৎসা, সামান্য চাষ ছিল তার পেশা।

শতাধিক বছরের জীবনে তিনি সাধক, গায়ক, পদকর্তা হিসাবে খ্যাত হয়ে, দশ হাজারেও বেশি অনুগামী পান এবং শরিয়ত ও বেদের বিধিবিধান বাতিল করে মানবমণ্ডলি গঠন করেন। মধ্যবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি আন্দোলনের তিনি অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। তিনি হিন্দু বা যবন পরিচয় দিতেন না। ১৮৯০-এর ১৭অক্টোবরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর তার নির্দেশমত মৌলবী বা পুরোহিত ছাড়াই সাধুর রীতিতে তার সমাধি হয়। পারলৌকিক ধর্মাচারের পরিবর্তে হয় গানের মহোৎসব। সম্পত্তির বিভাগে বড় অংশই দিয়ে যান স্ত্রী ও মেয়েকে। সাম্প্রদায়িক আচার বর্জনের এ দৃষ্টান্ত সেকালে ছিল অকল্পনীয়। সমকালীন বিদগ্ধ জনেরা তাকে চিনতেন। খ্যাতকীর্তি গায়ক লালনের পদ ধর্মবাণীর মর্যাদা পেত। তার সহস্রাধিক পদের কথা শোনা যায়। কিন্তু তার এত পদ পাওয়া যায়নি। পূর্ব পাকিস্তান পর্বে তার নামে ইসলামি জাল পদ রচিত হয়েছে, পদের শব্দ বদলানো হয়েছে, লেখা হয়েছে জাল জীবনী। লালন বিষয়ক জাল রচনা তখন ছিল এক বড় শিল্প (রাহুল পিটার দাস)।

লালনের পদাবলির অনন্যতা আকর্ষণ করেছিল বহুজনকে। ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিকেরা তাকে নিয়ে লিখেছিলেন। তার গানের আদিসংকলন ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং হরিনাথ মজুমদার। কুমারখালির জনউডরফের মান্যতান্ত্রিক কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত হরিনাথ মজুমদার ছিলেন গ্রামবার্তা প্রকাশিকার সম্পাদক। ঠাকুর জমিদারদের প্রজা পীড়নের তথ্য প্রকাশের দায়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক আক্রান্ত হলে, সশিষ্য লালন তাকে রক্ষায় এগিয়ে যান। লালন, দুদু, পাঞ্জু, গোসাই গোপাল বা তাদের অনুরাগীরা ঠাকুর জমিদারদের প্রজা ছিলেন। তারা কোথাও দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের কোনো শ্রদ্ধাযোগ্য উল্লেখ করেন নি। লালন ব্রাহ্মদের সমালোচনা করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের শেষ বয়সের এক ছবি এঁকেছিলেন। সরলাদেবী তার গান, স্বরলিপি এবং জীবনী প্রকাশ করেন পত্রিকায়। ইন্দিরা দেবী করেন লালনের গানের স্বরলিপি। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (১৩২২) লালনের বিশটি গান প্রকাশ করেন। সংগ্রহ করেন লালনের গানের প্রামাণ্য খাতা। ছন্দের আলোচনায় তিনি লালনের অসাধারণ ছন্দ এবং অসামান্য কাব্যভাষার আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শন শাখার অভিভাষণে (১৯২৫), মানুষের ধর্ম-এ লালনের গানকে উপনিষদের ঋষি এবং শেলির রচনার সমতুল্য মর্যাদা দিলেন। হারামণির ভূমিকায় আচার বর্জন করে কোরান পুরাণের সমন্বয়ের প্রবক্তা হিসাবে তিনি বাউলদের চিহ্নিত করলেন। খাঁটি বাউলদের আলোচনায় তিনি ঘুরে ফিরেই লালনের কথা বলেছেন। বহু স্বদেশি গানে তিনি বাউল সুর ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছেন। তার প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, কবিতা, গান, গল্প উপন্যাসে বাউলের প্রসঙ্গ এবং প্রভাব বহু বিস্তৃত। নাটকে তিনি বাউল ভূমিকা নিতেন। পত্রপুটের ১৫নং কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন, 'কবি আমি ওদেরই দলে।'

সমকালে বিপুল খ্যাতির সমান্তরালে গোড়া হিন্দু এবং মৌলবাদী মুসলমানদের বিরোধিতা ছিল লালনের প্রতি। মৌলবাদী মুসলমানেরা লাগাতার লালনকে এবং শিষ্যদের মসী এবং অসি দিয়ে আক্রমণ করেছিল।

গান আর কবিতা, গ্রামীন জনতার বিচিতর বাকরীতির সঙ্গে ধ্রুপদী রীতি মিশে, হিন্দু-ইসলাম চরিত্র-কাহিনি-প্রসঙ্গ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল তার কবিতার দেহমন। উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনি মহান এক লোককবি। কথা ও সুরের জন্য লালনের গান বঙ্গের এক মহামূল্যবান শিল্পকর্ম। তন্ত্র, বৈষ্ণব ও ইসলামিতত্ত্বাদি, স্থাননাম নিজস্ব অর্থে ব্যবহার করেন তিনি যেমন-

আছে আছে আদি মক্কা এই মানুষ দেহে দেখ নারে মন ভেয়ে।
দেশ দেশান্তর দৌড়ে কেন এবার মরিস হাফিজ।
করে অতি আজব ভাক্কা গঠেছেন সাঁই মানুষ মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে
ও তার চার দ্বারে চার নুরি ইমাম মধ্যে সাঁই বসিয়ে।।

চণ্ডীদাস, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, শহীদ মনসুর হাল্লাজ, মস্কাবন্দী, সোহাসী সুফি, ভারতীয় ভক্তি আন্দোলনের নেতারা, শিব-কৃষ্ণ-চৈতন্য-হজরত মহম্মদ তার গানে স্থান নিয়েছেন। তার মতই, বিবাহিত বধূকে ঘরে রেখে নিঃসন্তান চৈতন্য, সমাজের বিরোধিতায় ফকিরি নেয়। লালনের চৈতন্য জামালকে দীক্ষা দেন, যবন রূপ সনাতনকে দেন গোস্বামী পদ। যবন হরিদাসের সমাধি দেন তিনি। তার 'নাই বেতের বোল, বলে হরিবোল লালনও 'জাতকে হাতে পেলে পুড়াতাম আগুন দিয়ে' বলেছেন। নবি-চৈতন্য-গুরু বন্দনা, দেহতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, জাতবর্ণের বিরোধিতা, বৈদিকতা ও শরিয়তের সমালোচনা, প্রার্থনা, আত্মনিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে তার গান আছ। তার গানে কলিকাল, ভণ্ডসাধুরা সমালোচিত হয়েছে, ভিন্নব্যাখ্যা হয়েছে শাস্ত্রবচনের। লালনের রচনা সংযত, সংহত, বিচার বিতর্কে আলোড়িত। বহুপদে শোনা যায় তার দ্বিসত্তার কথোপকথন। তার কথা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে সাধকেরা।

১৯৯০ তে লালনের মৃত্যুর শতবর্ষ পালিত হয়েছে দু'বঙ্গে। তার নামে ঘোষিত হয়েছে পুরষ্কার। স্থাপিত হয়েছে মঞ্চ, সূচিত হয়েছে মেলা মহোৎসব। তাকে নিয়ে পুতুলনাচ, যাত্রা, নাটক, গল্প উপন্যাসে রচিত হচ্ছে। দুবঙ্গে এবং বহিবিশ্বে লালনকে নিয়ে চলেছে বহুগবেষণা। তানভির মোকাম্মেল এবং গৌতম ঘোষ লালনকে নিয়ে অসামান্য সিনেমা তৈরি করেছেন। তার রচনা অনূদিত হয়েছে হিন্দি, ফরাসী, ইংরাজীতে। অকালে প্রয়াত ক্যারল সলমন, লালনের গানের অন্তর্নিহিত অর্থ নিষ্কাষণ করে ইংরাজীতে নূতন রীতির এক অনুবাদ করেছেন (City of Mirrors Songs of Lalan Sai, oxford university press,)। এ অনুবাদটি এক সৃজনশীল গবেষণা।

বঙ্গে হিন্দুসমাজের নগর কেন্দ্রিক নবজাগরণের সমসময়ে, হিন্দু-মুসলমান আপামর জনগণকে সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক ধর্মাচার, সঙ্কীর্ণ ভোগবাদ এবং ব্যক্তিগত সম্পদের অতিরেক বর্জন করে এক বাসযোগ্য সমাজ নির্মাণের ডাক দিয়েছিলেন লালন। ধর্ম-অর্থ-লিঙ্গ বৈষম্যহীন এখানে সবাই মানুষ। মানুষতত্ত্বই লালনের দর্শন। এ মানব জমিনে আজীবন আমরণ সোনা ফলাতে ব্যস্ত ছিলেন লালন সাঁই। ভারতীয় ভক্তিবাদের যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহ্যের তিনি ছিলেন সর্বোত্তম প্রতিনিধি। কল্পিত ঈশ্বর, দেবতা-অপদেবতা নয়, বাস্তব মানুষে ছিল তার অভিনিবেশ। হিংসা নিন্দার বিরুদ্ধশক্তি প্রেম, প্রেম মানুষকে মিলিত করে। লালনের দর্শনের, সাধনার মূলে মানুষ। মানুষ তার ভুবনের কেন্দ্রে। মানুষের পক্ষে হিতকর সব কিছু ধর্ম, আর অহিতকর বিষয়গুলিই হল অধর্ম। লালনের মনের মানুষ সাঁই, বাস্তব মানুষে মিশে থাকে। আর্শিনগরের

পড়শীর মানুষের মত হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা-নাভি (নাই)। তিনি দ্বিপদ, দ্বিভুজ। দৃষ্টির আচ্ছন্নতায় আমরা জীবে শিবকে, আদমে আল্লাকে, মানুষে ক্রীড়ারত শ্যামরায়কে দেখতে পাই না। লালন বলেন, 'আমি একদিনো না দেখিলাম তারে'।

আমাদের সাম্প্রদায়িক রক্তে ভেজা দেশে, জাতবর্ণে শত ছিন্ন সমাজে, ভোগবাদে বিকৃত সংস্কৃতিতে, মানুষের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার নিবিড় ঘন আঁধারে লালন এক উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র।

তাঁর অতিখ্যাত পদ-

১) আমি একদিনো না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আর্শিনগর এক পড়শী বসত করে।।
সেই গ্রাম বেড়ে অগাধ পানি নই কিনারা তাই তরণী পারে
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারি কেমন সে গাঁয়ে যাই রে।।
বলবো কি সেই পড়শীর কথা ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর আবার ক্ষণেকভাসে নীরে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো যম যাতনা সকল যেতো দূরে
সে আর লালন এক খানে রায় থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকে রে।
২)পাপ পুণ্যের কথা আমি কারো বা শুধাই।
এদেশে যা পাপে গণ্য অন্য দেশে পুণ্য তা।।
তিব্বত নিয়ম অনুসারে এক নারী বহু পতি করে
এদেশেতে হলে ব্যাভিচারী দণ্ড তায়।
শুকর গরু দুইটি পশু খাইতে বলেছেন যিসু।
এখন কেন মুসলমান হিন্দু পিছেতে হটায়।।
দেশ সমস্যা অনুসারে ভিন্ন বিধান প্রচারে
লালন বলে বিচার কর্লে পাপপুণ্যের নাহি বালাই।
পুণ্য করলে স্বর্গবাসী, পাপ হলে ভবে আসি
লালন বলে নামে উদাসী নিত্য নিত্য প্রমাণ পাই।।

১২.৫. দুদ্দু সা: জীবন ও রচনা

যশোহর জেলার হরিশপুরে বেতলা গ্রামে ঝড়ুমণ্ডলের ছোট ছেলে ছিলেন দরিরুদ্দিন বা দুদ্দু সা'। তাঁর মৃত্যু ১৯১১; জন্মকাল ১৮৪১, তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ এবং আর্বি-ফার্সি-সংস্কৃত ভাষার পাঠ নিয়েছিলেন তিনি। শিখেছিলেন বাউল এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব। গ্রামে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সাধকেরা। হত তাদের যৌথ গানের আসর। এদের গান এবং তত্ত্বালোচনা শুনতে শুনতে বড় হচ্ছিলেন দুদু। ক্রমে তিনি বিতর্কমূলক বাউল গানের দক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠেন। সাধক লালন সাঁই-এর সঙ্গে গানের পালা করতে করতে তিনি লালনের শিষ্যত্ব নিয়ে গুরুর সঙ্গে ছেউরিয়া আশ্রমে দীর্ঘ সময় বাস করে শেষ জীবনে ফিরে আসেন বেলতলায়। তার উত্তরপুরুষেরা বাউল

মত না নেওয়ায় তারা দুদ্দুর গানের খাতা, শিষ্য তালিকা কিছুই রক্ষা করেনি। এমন কি তার সমাধির চিহ্নিত প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। এখন জীর্ণ অবস্থায় তার সমাধি রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি মৌলবাদ তার নামে জাল লালনের জীবনী প্রচার করেছে। ঢাকা, বাংলা একাডেমি থেকে তার গানের সংকলন প্রকাশের সময় তার কোনো জীবনী মেলেনি। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও পাননি জীবনী। সাধক গায়কদের মধ্যে বেঁচে আছে দুদ্দু সার গান। রৌদ্রে জলে মরে নি তার রচনা;-আয়ু তার দুরন্ত লোহার। আমরা তার দু'শতাধিক গান উদ্ধার করে মুদ্রিত করেছি।

লালনের প্রিয় শিষ্য দুদ্দুর উপর লালনোত্তর কালের বাউলদের নেতৃত্বে বর্তেছিল। বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করে বাউল গানও সাধনা প্রচার ও প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। শরিয়তি ইসলাম এবং বিধিমার্গের বৈষ্ণবতার সঙ্গে, শাক্ত বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে বাউলের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন তিনি। গুরু লালনের দুরূহ পদের ব্যাখ্যা পাই দুদ্দুর পদাবলিতে। সমকালীন দেশ, সমাজের সমস্যাকে, পরাধীনতাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি আরবি/সংস্কৃত ভাষার স্বর্গীয় দাবী নাকচ করে বঙ্গভাষার গৌরব ঘোষণা করে বলেছেন যে নব হজরত মহম্মদ এদেশে জন্মালে কোরান বাংলা ভাষায় লেখা হতো। গোড়া মুসলমানেরা গানকে হারাম বলে। এর বিরুদ্ধেই ইসলামি শাস্ত্র থেকে তিনি নানা তথ্য উদ্ধার করে গানকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। মুসলমান সমাজের পিছিয়ে পড়ার জন্য ধর্মপালদের অবহেলা নয়, অতীত মুখীনতা, অতীতের বৃথা গর্ব, নিশ্চেষ্টতা, অদৃষ্টে বিশ্বাস, অলিখিত জাতি-বর্গভেদ, গোষ্ঠীগত দলাদলিকে দায়ী করে তিনি বঙ্গে মুসলমান সমাজ পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছেন। হিন্দুসমাজে তিনি দেখেছেন বর্ণজাতিভেদ, মূর্খ ব্রাহ্মণ, মানুষকে ছোট করে প্রতিমা পূজার বাহুল্য, সতীদাহাদি প্রথা। তিনি দেখেছেন হিন্দু-মুসলমানদের অনৈক্যের ছিদ্রপথে ব্রিটিশ শক্তির অনুপ্রবেশ-

শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে ফিরিঙ্গিরা রাজা হল এদেশে এসে।
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান পরস্পরের হিংসায় দিল প্রাণ।
তাইতো পাদ্রি খ্রিস্টান যিশু খিস্ট্রের দ্বিন প্রকাশে।।
কোটি কোটি ভারতবাসী এক হয়ে রইল না মিশি
কয়জন ফিরিঙ্গি আসি, এদেশে জুড়ে বসে।।
হায় রে ধর্ম মানুষ জাতি এই কিরে তোর রীতিনীতি
লালন সাঁই কয় দুদ্দুর প্রতি ত্যজো জাত জাত নেশে।।

সাম্প্রদায়িক আচার বন্ধনগুলি ত্যাগ করে, দুদ্দু হিন্দু-মুসলমনকে এক মানববন্ধনে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম ব্যবসায়ীরা অদৃষ্টে দিয়ে দৃষ্ট সমাজ বৈষম্যকে যুক্তিসিদ্ধ করে, জাতপাত ধর্মে লিঙ্গে মানুষকে শত খণ্ডে ভাগ করে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বর্তমানকে মান্যতা দিয়ে দুদ্দু কাল্পনিক অনুমানের এ সমস্ত অলীক তত্ত্ব বর্জনের ডাক দিয়েছেন। অদৃষ্ট, কর্মফল, পুনর্জন্ম, নিয়তি, জাতবর্ণের অবান্তর বিভাগ অগ্রাহ্য করে তিনি জনগণএক নিজের ভাগ্য নিজে গঠন করতে বলেছেন। মানুষকে তিনি একজাতি বলেছেন।

নিজেকে হিন্দুমুসলমান না বলে তিনি মানুষ বলেছেন। জাত-বর্ণ-গোত্র চতুর মানুষের সৃষ্টি; প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নয়। এগুলি ভারতীয় ঐক্যের বড় বাঁধা।

নারী দুদ্দুর কাছে স্রষ্টা, মহিমাময়ী। তাকে লাঞ্ছনা বা পীড়ন করা অবৈধ, অধর্ম। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দরবেশী ঐতিহ্যের সঙ্গে বৌদ্ধ শাক্ততন্ত্র এবং বৈষ্ণবতার মিশ্রণে বাউল মতের উদ্ভব ব্যাখ্যা করেছেন। নিজেকে তিনি ইহদেহবাদী, বস্তুবাদী বলেছেন-

'যে খোঁজে মানুষে খোদা সেই তো বাউল
বস্তুতে ঈশ্বর খুঁজে পায় তার উল।।
পূর্ব পুনর্জন্ম না মানে চক্ষু না দেয় অনুমানে
মানুষ ভজে বর্তমানে, হয়রে কবুল।'

সেকালের বঙ্গদেশে দুদ্দুসা ছিলেন এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বর।

দুদ্দুর গানের ভাষা সংযত, সংহত, স্পষ্ট-প্রসাদগুণে ভরা। অশেষ দক্ষতায় তিনি বাউলদের গুপ্ত পরিভাষা ব্যাখ্যা করেন। ইসলামি তত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, তন্ত্রের আলোচনায় তিনি নিপুন। নবি মহম্মদ এবং প্রভু চৈতন্য তার গানের বন্দিত নায়ক। আর গুরু লালন তার সর্বস্ব।

গানের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ মুসলমানদের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তার তথ্য পূর্ণ পদ-

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরান মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়।।
রাগরাগিনী সুর রূহানী বলিয়া মসহুর
এত আলাপন আছে নিরূপন, তাতে হারাম কেন নয়।।
আর্বি পার্শি সকল ভাষায় গজল মর্সিয়া সিদ্ধ হয়
নবিজী যখন মদিনায় যায়, দফ বাজায়ে মদিনায় নেয়।।
বেহেস্তে সুর না-জায়েজ নয় দুনিয়ায় কেন হারাম হয়
দুদ্দু কয়, শুনি কোথায় গানের ফতোয়া পায়।।

১২.৬. হাসন রাজা

দেওয়ান হাছন রজা চৌধুরী/ হাছন রাজা-সিলেটের রামপাশা লক্ষণশ্রীতে ১২৬১ এর ৭ পৌষ জন্মে ১৩২৯-এর ২৩ অগ্রহায়ণ মারা যান। তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। হাসনের পিতা ছিলেন আলি রেজা, জননী জাহানবেগম। তারা ছিলেন শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের সম্ভ্রান্ত জমিদার। এ পরিবারে ছিল গানের চর্চা। হাসনের সৎ বোন সহিফা বানু হাজিবিবি সিলেটের অন্যতম কবিও গীতিকার। উর্দু বাংলা দুভাষায় তিনি লিখতেন। তার রচিত গ্রন্থ হল 'সহিফা সঙ্গীত'। হাসনের দু ছেলে গনি ও একলিমুর কবি ও গীতিকার ছিলেন। একলিমুর রাজা রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

বাংলাদেশে হাসন রাজাকে নিয়ে সিনেমা হয়েছে। অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জন্মভূমিতে তার নামে গবেষণারগার ও সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, তাকে সপ্ত সাধকের মধ্যে স্থান দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রকাশ করেছে তার স্মরণে ডাকটিকিট ও ফার্স্ট-ডে কভার।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না হাসন রাজার। কিন্তু গান রচনায়ও সুরারোপে তিনি দক্ষ ছিলেন। দু'শতাধিক তার গান সংগৃহীত হয়েছে বহুগান হারিয়ে গেছে। সিলেটের 'আল ইসলাহ' পত্রিকায় হাসনের গানও জীবনী সংগৃহীত হয়েছিল। বেঁচে থাকতেই তিনি নিজের কাব্য সংগ্রহ 'হাছন উদাস' (১৯০৭) প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় 'হাছন উদাস'-এর। দ্বিতীয় সংস্করণ। এবং 'হাছন বাহার' ও 'সৌখিন বাহার' বই দু'টি। সৌখিন বাহারের বিষয় ছিল নারী, ঘোড়া এবং কুড়া পাখির বাহ্যিক আকৃতি দেখে প্রকৃতি বিচার।

তার গানের ভাষায় শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থাকলেও ভাবে এবং সুরে তা সর্বজনকে নন্দিত করে। গানে কখনও একাধিকবার ভনিতা ব্যবহার করেছেন তিনি। কথিত হয় যে তিনি চিস্তিয়া মতে দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু পদে মুর্শিদের নাম নেই তার। নিজেকে তিনি বাউল, আউল, পাগল, ফকির, কাঙ্গাল, বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রাম্য কবি বলেছেন। হাসনের সমসাময়িক শ্রীহট্টের পদকর্তা ছিলেন রাধারমন, শাহনুর, আবদুল ওহাব প্রমুখ। এখানে মহাপ্রভু চৈতন্যের, রাধাকৃষ্ণের এবং বেসরা সুফিদের সমন্বিত ঐতিহ্য বহমান ছিল। হাসন কোরাণ, বেসরা সুফি, কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গকে নিগূঢ় অর্থে তার গানে ব্যবহার করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমকে বলে 'পঞ্চম পুরুষার্থ'। প্রয়োজন'। মালিকপন্থী সুফিরা প্রেমে স্রষ্টা স্বরূপ আস্বাদন করেন। এক নিজেকে আস্বাদন করার জন্য, দ্বিখণ্ডিত হয়ে অন্যজনকে খুঁজে ফিরে। প্রেমে মিলন ঘটে। এ প্রেমতত্ত্ব রূপ পেয়েছে হাসনের গানে। তার গানে অনিত্য জীবন, সাধনায় অক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। হাসনের গানে গুরুত্বপূর্ণ হল আমিতত্ত্ব/ আত্মতত্ত্ব। ভাণ্ডে আছে ব্রহ্মাণ্ড এবং স্রষ্টা। তাই নিজেকে চেনা, দেখা গুরুত্ব পূর্ণ। হাসন নিজের মধ্যে ভোগী হাসন রাজা, আর যোগী হাসনজান এ দুসত্তার উপস্থিতি দেখেছেন। অচিন স্রষ্টাকে ধরতে গিয়ে, 'দেখি ধরছি হাসন রাজারে'। বেসরা সুফিরা আদম/ নর দেহে আল্লাকে খুঁজতেন। এ সূতেরই মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন 'আনাল হক/ আমি সত্য'। এ মতাদর্শ প্রভাব ফেলেছে হাসনের গানে। সত্যকাম, সত্যাশ্রয়ী হাসন নিজের ভোগলিঙ্গা নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ করেছেন। ক্ষণস্থায়ী জীবনের অতৃপ্তির কথা বলেছেন। জীবনে অমৃত পানের সুখের কথা বলেছেন। সিদ্ধান্ত করেছেন-

'আপনি চিনিলে খোদা চিনা যায়
হাসন রাজা আপন চিনিয়া এ গান গায়।।

ধর্মাচার, ইসলামি শরিয়তের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান ছিল হাসনের জীবনে ও গানে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম অগ্রাহ্য করে তিনি লিখেছেন-

'হিন্দু বলয়ে তোমা রাধা, আমি বলি খোদা
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লামুন্সিয়ে দেয় বাঁধা।'

আচার ধর্মের অনুসারীদের তার গান না শুনতে বলেছেন তিনি-

'আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা।'

বর্ণময় জীবন কাটিয়েছেন হাসন রাজা। জমিদারী চালিয়েছেন যথা নিয়মে। তিনি বড় এক ভাওয়ালি নৌকায় নাচ, গান, বাজনা আর সঙ্গিনীদের নিয়ে কাল কাটাতেন। ডাঙ্গার বাড়িঘর, নানা ভোগ্যদ্রব্যে তার আসক্তি ছিল না। এগুলির অনিত্য সত্তা জেনেই তার বিখ্যাত গান-

'কি ঘর বানাইমু আমি শূন্যের মাঝার'

শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজ পত্রিকায়, প্রভাতকুমার শর্মার 'মরমী কবি হাসন রাজা' (১৯২৪) প্রবন্ধ দেখে, লেখকের কাছে হাসনের গান চেয়ে পাঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রভাতের পাঠানো পদ পেয়ে কবি, অবিলম্বে ১৯২৫-এ ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভায় অভিভাষণে হাসন রাজার পদের আলোচনা করেন। Philosophy of our people নামে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় মর্ডান রিভিউতে (১৯২৬)। পরে প্রকাশিত হয় বঙ্গানুবাদ।

পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই, সেটি এই যে, ব্যক্তি স্বরূপের সমন্ধের সূত্রেই বিশ্বসত্য। তিনি গাহিলেন,

'মম আখি হইতে পয়দা আসমান জমিন
শরীর করিল পয়দা শক্ত আর নরম
আর পয়দা করিয়াছে ঠান্ডা আর গরম
নাকে পয়দা করিয়াছে খুসবয় বদবয়' (মূল রচনায় এর ভিন্ন পাঠ পাই)

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে শাশ্বত পুরুষ তাহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনিভাবে বলিয়াছেন, যে পুরুষ তাহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠত।' পরে হিবার্ট লেকচারেও বাউল প্রসঙ্গ আসে।

রবীন্দ্রনাথের এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় হাসন রাজা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদগ্ধ জনেরা নানাভাবে তার মূল্যায়ন করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি পদ-

১) বিচার করিয়া দেখি সকলই আমি
সোনামামী সোনামামী গো
আমারে করিলা বদনামী।।
আমি হৈতে আল্লা রসুল আমি হৈতে কুল
পাগলা হাসন রাজা বলে তাতে নাই ভুল।।
আমার হইতে আসমান জমিন আমি হইতেই সব
আমি হৈতে ত্রিজগৎ আমি হৈতে রব।।
আপন চিনিলে দেখ খুদা চিনা যায়
হাসন রাজা আপনি চিনিয়ে এই গান গায়।।

২) বাউলা কে বানাইল রে
হাসন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে।।
বানাইল বানাইল বাউলা তার নামটি হয় মৌলা।
দেখিয়া তা রূপের চটক হাসন রাজা আউলা।।
হাসন রাজা হইছে পাগল প্রাণ বন্ধুর কারণে।

বন্ধু বিনে হাসন রাজায় অন্য নাহি জানে।।
হাসন রাজা গাইছে গান হাতে তালি দিয়া
সাক্ষাইতে দাঁড়াইয়া শোনে হাসন রাজার প্রিয়া ।।

১২.৭. অনুশীলনী

বিস্তারিত প্রশ্ন-

- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল সংগীতের ভূমিকা নির্ণয় করুন।
- বাংলার শ্রেষ্ঠ বাউল আপনি কাকে মনে করেন? তাঁর জীবন সাধনা ও রচনার পরিচয় দিন।
- হাসন রাজার দর্শনের কোন দিকটি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল, তার বিবরণ দিন।
- হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যকে দুদ্দু শাহ্ন্ধ কেন পরাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তা বিশ্লেষণ করুন।
- সংক্ষেপে বাউল সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।
- লালন সাঁইকে লোকজীবনের মহাকবি বলা কতদূর যুক্তিসংগত তা আলোচনা করুন।
- সংক্ষেপে লালন সাঁই-এর কবিপ্রতিভা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- রবীন্দ্রনাথ লালনকে কীভাবে তুলে ধরেছিলেন তা আলোচনা করুন।
- লালনের মানবতাবাদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- ধর্মতত্ত্ব থাকলেও বাউলগানে মানুষকে বড় করে দেখানো হয়েছে- আলোচনা করুন।
- শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের থেকে বাউলদের ধর্মসাধনা কোথায় স্বতন্ত্র তা আলোচনা করুন।
- লালন সাঁই-এর জীবন সম্পর্কে আমরা কী কী তথ্য পেয়ে থাকি, তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
- টীকা রচনা করুন: হাসন রাজা।
- দুদ্দু শাহের গানে সমাজচেতনা কতখানি ধরা পড়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।
- বাউল দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- লালনের গানকে প্রথম কে শিক্ষিত জনমানসের মধ্যে তুলে ধরেন?
- লালনের সমাধি কোথায় রক্ষিত আছে?
- লালনের গুরু কে ছিলেন?

- লালনের গানের আদি সংকলক কারা ছিলেন?
- ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখুন।
- রবীন্দ্রনাথ কোন পত্রিকায় লালনের গান প্রকাশ করেন?
- লালনের শেষ বয়সের ছবি এঁকেছিলেন কে?
- লালনকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এমন দু’জন পরিচালকের নাম লিখুন।
- দুদ্দু শাহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- দুদ্দু শাহের গুরুর নাম কী?
- ‘হাছন উদাস’ গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
- হাসনের গানে কোন অঞ্চলের ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়?
- কার লেখা প্রবন্ধ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ হাসনের গান সংগ্রহ করেন?
- রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বক্তব্যে বাউল ধর্মদর্শন ও বাউল সংগীত রচয়িতাদের প্রসঙ্গ আছে?

১২.৮. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- অমরেন্দ্রনাথ রায়, শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৫৯।
- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা।
- আহাম্মদ শরীফ, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩।
- আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা।
- ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ঢাকা।
- ওয়াকিল আহমদ, লালন গীতি সমগ্র, বইপত্র, ঢাকা, ২০০২।
- কাজল চক্রবর্তী, (সম্পা.) প্রামাণ্য হাছন রাজা, সাংস্কৃতিক খবর, কলকাতা, ২০১৭।
- ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বাংলার বাউল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা।
- বসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির, বঙ্গীয় পুরান পরিষদ, শান্তিপুর, ১৩৬২।
- ব্রতীশ ঘোষ, সুফী সাহিত্য সংস্কৃতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, অচিন প্রকাশনী, বারাসাত, ২০০৫।
- বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাউল গান ও দুদ্দুশাহ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৩৭১।
- মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩।
- শক্তিনাথ ঝা, দুদ্দু সা’র পদাবলি, সহজপাঠ, কলকাতা, ২০১২।

- শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই দেশকাল এবং শিল্প, বর্ণপরিচয়, কলকাতা।
- শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই-এর গান, ১৪২১ কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা, ২০০৫।
- শক্তিনাথ ঝা (সম্পাদিত), হাসন রাজা মরমী মৃত্তিকার ফসল, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।
- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, কলকাতা।
- সুকুমার সেন, ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, কলকাতা।

মডিউল-৪

বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস এবং সমন্বয় চেতনা

একক ১৩ ❒ বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস

১৩.১. উদ্দেশ্য
১৩.২. প্রস্তাবনা
১৩.৩. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস: প্রাচীন যুগ
১৩.৪. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস: মধ্যযুগ
১৩.৫. বাঙালির ধর্মচেতনা
১৩.৬. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম
১৩.৭. বাংলায় জৈনধর্ম
১৩.৮. বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম
১৩.৯. সমন্বয় চেতনা
১৩.১০. সারাংশ
১৩.১১. অনুশীলনী

১৩.১. উদ্দেশ্য

বাংলা ও বাঙালিকে জানতে হলে তার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস যেমন জানতে হয় তেমনই এই সব বিষয়গুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাজনৈতিক অবস্থাও জানা প্রয়োজন। তাই শিক্ষার্থীদের বাংলার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচয় দেওয়া এই এককের উদ্দেশ্য। আবার সমাজবিধি, রাজনীতি, অর্থনীতি যেমন মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তেমনই 'ধর্ম' ব্যাপারটিও মানুষের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। অন্যান্য জাতির মত বাঙালিও ধর্মকে কেন্দ্র করে টিকে আছে। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম বাঙালিদের মধ্যে বহমান। বিভিন্ন প্রধান ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করাও এই এককের উদ্দেশ্য।

১৩.২. প্রস্তাবনা

আমরা রাজনীতি ও politics-কে সমর্থক ভাবি। অথচ দুটির মধ্যে অর্থের ফারাক আছে। রাজনীতি হল রাজার নীতি। তা সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার ভাবে ব্যবহৃত হত। রাজনীতি বলতে রাষ্ট্রশাসননীতিও বোঝায়। অথচ ইংরেজিতে যখন 'politics' ব্যবহার করি, তখন অর্থটা অনেকটাই পালটে যায় বাংলা 'রাজনীতি'র থেকে। ইংরেজিতে এর অর্থ দাঁড়ায়- ১. সরকারি চারুকলা ও বিজ্ঞান ২. রাজনৈতিক নীতি বা আচরণ ৩. শক্তি, মর্যাদার জন্য কার্যপ্রণালী।

আদিতে রাজনীতি বা politics যে অর্থেই চালু থাক না কেন, বর্তমানে এটির অর্থ বিস্তার (extension of meaning) ঘটেছে। রাজা বা শাসকের রাজনীতির পাশে শাসিতের, অধিকারীর সঙ্গে অনধিকারী, সরকার বনাম বিরোধী, উচ্চবর্ণ-মধ্যবর্ণ বনাম দলিত, বড়লোক-গরীব লোক, স্ত্রী বনাম পুরুষ-সব কিছুতেই রাজনীতি আনা হচ্ছে। এর বিপরীতে যখন বলা হয় অরাজনৈতিক বা রাজনীতিহীন (nonéôépolitical or apolitical) তখন সমস্যায় পড়ি। কাজেই রাজনীতির আওতায় কেউ বাদ যায় না-সরকার সমাজ গোষ্ঠী দল উপদল সমর্থক বিরোধী।

অন্যদিকে রাজনৈতিক ইতিহাস সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল করে ভাবা কঠিন। এক বিশেষ সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় চাপে যখন এক বিশেষ রাজনীতির কথা ভাবছি, তখন তার সহযোগী বা প্রতিরোধী রাজনীতি একেবারে ছিল না, এটা বলা যায় না। কেন না রাজনীতি শক্তি, মর্যাদা, অধিকার, প্রভুত্বের কামনার ইতিহাস-যেখানে দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার। দলীয় রাজনীতির পাশে ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি (self centred politics) চোখে পড়ে। কখনও ব্যক্তিশাসক বা রাজগোষ্ঠীর রাজনীতি দেখতে পাই, কখনও জনগণেরও। তবে এই জনগণ সবসময়েই নানান স্তরে বিভক্ত থাকে।

রাজনীতির আঙিনায় ব্যক্তির জন্য দলীয় রাজনীতি ভেঙে যাচ্ছে কিংবা দলের চাপে ব্যক্তির শ্বাসরোধ হচ্ছে-এই ইতিহাসও পাই। আসলে রাজনীতির ইতিহাস বেশ জটিল তাতে অর্থনীতি সমাজ ধর্মের বিচিত্র টানাপোড়েন, স্বার্থের হানাহানি যেমন প্রবল, তেমনি বিশেষ রাজনীতির জন্য সর্বস্বত্যাগ এমনকি প্রাণের আহুতি দেখতে পাই। শুধু এই নয়, ভাষা নিয়েও রাজনীতি চলে। কাজেই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে দেখতে হবে নানা দৃষ্টিকোণ (point of view) থেকে, সরলরেখায় একমাত্রিক স্রোতে ভাসলে চলবে না। বাংলার জটিল ও পরিবর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসকে যুগ ধরেই আলোচনা করা শ্রেয়। এই সূত্রেই আমাদের আলোচ্য হল বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এর পাশাপাশি বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম নিয়ে হানাহানি, মারামারি, বিদ্বেষ বর্তমান যুগে যেমন আছে, প্রাগাধুনিক যুগেও তেমনি ছিল। বাংলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচলন দেখা যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পরিক সহানুভূতি ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিদ্বেষের কথা সর্বজনবিদিত। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক উচ্চবংশজাত শিক্ষিত মানুষ থাকলেও হিন্দু তথা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। তবুও এদের এই পরস্পর হানাহানির মধ্যেও ঐক্যের ভাবনা, সমন্বয়ের চেতনা, লক্ষ করা যায়। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ চোখে পড়ে না। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব (চৈতন্য) যুগে হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তী বেশ কয়েকটি উপ-এককে সে বিষয় আলোচিত হবে।

১৩.৩. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস: প্রাচীন যুগ

বাঙালির প্রাচীন রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রযন্ত্র কিভাবে সেখানে রূপ নিয়েছিল, তার কথা। এই রাষ্ট্র যন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার-এর মতো কোনো বই আমরা পাই না। শুধুমাত্র রাজকীয় দলিলই সম্বল, সাহিত্যরচনার মধ্যেও বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য লাভ করি। পঞ্চম শতকের আগে কিছু জানা যায় না।

গুপ্ত বংশের বাংলা অধিকারের আগে উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ (North Indian Model of State) ছিল না। আর্য রাষ্ট্রবিন্যাসের আদর্শ ও অভ্যাস ধীরগতিতে এলে প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিবর্তন (transformation) ঘটল।

কৌম শাসনব্যবস্থা

এক সময় রাজা ছিল না, কিন্তু কৌম সমাজ (community) ছিল। সমাজের নীচু স্তর কিংবা পার্বত্য আরণ্যক কৌমের মধ্যে দলপতি, সামাজিক শাস্তি, আচার ব্যবহার, পঞ্চায়েতী প্রথা, জমি ও শিকার জায়গার (hunting ground) বিলি বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকারের শাসনে একটা শাসনতন্ত্রের (administrative machinery) আবছা পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্দারের ভারত শাসন ও মৌর্যাধিকারে এই কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছিল। বাংলার রাজতন্ত্রের আদিকথা মহাভারতের দুয়েকটি কাহিনি এবং সিংহলী পুরাণ দীপবংশ-মহাবংশের বিজয়সিংহের গল্পে লক্ষ করি।

গুপ্ত সম্রাটরা বিজিত রাজ্যকে নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতেন, কোনো কোনো জায়গায় সামন্ত নরপতি দ্বারা শাসিত হত (feudal chieftains)। তবে সমস্ত বিজিত রাজ্যই কেন্দ্রীয় শাসনকে প্রতিরূপ (model) রূপে দেখতেন। দুজন সামন্ত-নরপতির কথা এসময় বাংলায় শুনতে পাই-১. মহারাজ রুদ্রদত্ত ২. বিজয়সেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড়ো বিভাগ ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল বীথি গ্রাম এগুলি ছিল ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রায়িত বিভাগ (smaller divisions)।

ভূমি দান-বিক্রয়, ন্যায়বিচার-এগুলি বিষয়পতিরা বিষয়াধিকরণে দেখতেন। সার্বিক দায়িত্ব বিষয়পতির ওপরে ছিল, তার নীচে থাকতেন নিগম-সভাপতিরা। এদের সহযোগিতার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তর থাকত।

এই রাজতন্ত্র ছিল সামন্তনির্ভর। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালেদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে চারশ বছর ধরে এক নতুন রাজবংশের সূচনা হল। সামন্ততন্ত্র আরও জোরদার হল। প্রধান রাজপুরুষরূপে মন্ত্রী বা সচিব পদ সৃষ্টি হল। মহাদণ্ড নায়ক (Chief Justice), মহাসন্ধিবিগ্রহিক (foreign minister, defence minister), মহাক্ষপ্টলিক (Chief Controller of Expenditure, Finance Minister) পদ তৈরি হল। ধর্মের ক্ষেত্রে শাসকবাহু বিস্তৃত হল। বর্ণব্যবস্থা, লোকাচার এই বৌদ্ধ পাল নরপতিরা বহাল রাখলেন।

সেন পর্বে এই একই ব্যবস্থাই চলেছিল। তবে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ়ভাবে সমাজে তাদের শিকড় প্রোথিত করেছিল। আমলাতন্ত্রের (bureaucracy) পাশে রাজবংশের মর্যাদা মহিমা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিষয়-মহিমা (ভুক্তি থেকে গ্রাম-এই বিভাগ) আর রাষ্ট্রীয় বিভাগ (state division) থাকছে না, তা ভৌগোলিক বিভাগের মতো হয়ে যাচ্ছে।

রাজপুরুষেরা অনেকেই কর্তব্য ও নীতিপালন করতেন। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে বিষয়পতির (local adminstrator) লোভহীনতার কথা বলা হয়েছে। তবে মানুষের যে একেবারেই অত্যাচার হত না, সেকথা কবিতার লেখক বলেন নি। রাষ্ট্রের জন্য কর-উপকরও (Tax and other liabilities). কম ছিল না। সমাজের নীচু শ্রেণীর কাছে এই করভার বহন করা সহজ ছিল না।

গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য এল পূর্ব দক্ষিণবঙ্গ এবং বর্ধমান অঞ্চলে কেন না ইতিমধ্যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে

হুণ আক্রমণে গুপ্ত রাজারা দিনে দিনে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ অবধি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করি।

শশাঙ্কের যুগে গৌড়ীতন্ত্র (Gaudism) গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল। নতুন নতুন সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি জানিয়েছে। শশাঙ্ক নিজে মহাসামন্ত ছিলেন বলে সামন্তেরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তবে রাজার ক্ষমতা বা রাষ্ট্র দুর্বল হলে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিরোধী ছিলেন। ফলে রাষ্ট্রের সমাজ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাঁর শত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের পরম অনুরাগী ছিলেন। বাংলার পাঁচটি বিভাগেই বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের রমরমা ছিল।

অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশে নৈরাজ্যের (anarchy) সূচনা হয়। রাজার তখন জোর নেই। রাষ্ট্র টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। অনেকটা অবস্থা হল-আমরা সবাই রাজা। এই সময় রাষ্ট্র পরিচালকরা গোপালদেবকে অধিরাজ নির্বাচন করলেন। শশাঙ্কের পর কোনো রাজা বছরখানেকও রাজত্ব করতে পারেন নি, তাকে নিহত করে অন্যে রাজা হয়েছেন। একশ বছর ধরে এই অরাজকতা চলেছিল। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত পালবংশ রাজত্ব করেছিল। এরা কেউ উচ্চবর্ণের ছিলেন না। ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০) সুদূর রাজস্থান, পাঞ্জাব, কনৌজ অঞ্চল জয় করে উত্তর ভারতে স্বরাট হয়ে ওঠেন। তার পুত্র দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পরে দশম শতাব্দীতে মহীপাল (৯৭২-১০২৭) পাল সাম্রাজ্যের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করলেও চারশ বছরের পাল রাজ্য ও রাষ্ট্র একেবারে ভেঙে গেল। পাল রাষ্ট্রের ভিত ছিল সামন্ততন্ত্র এবং তার মধ্যেই ছিল তার দুর্বলতার বীজ। দেবপালের পর বিজিত রাষ্ট্রেরা স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব (local self administration) নিয়ে পাল সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়েছিল। লৌকিক সমস্ত আচরণই বিভিন্ন কর্মচারীর অধীনে ছিল। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন (centralisation) ঘটেছিল।

কর্ণাটি থেকে আসা রাঢ়ভূমিতে বসতকারী সেনবংশের সামন্ত সেন এর ছেলে হেমন্ত সেন মহারাজাধিরাজ হয়েছিলেন। বিজয় সেন বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেনের সময় অবধি (১১৭৯-১২০৬) সেনবংশ রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন পুরী, বেনারস ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ গড়েছিলেন। তাঁর প্রায় সাতাশ বছরের শাসনকালে রাজ্য ও রাষ্ট্র ক্রমে হীনবল হয়ে উঠেছিল। ফলে ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক বখতিয়ার খিলজী বাংলা অধিকার করলেন ত্রয়োদশ শতকের সূচনাতেই। ইতিহাসের দিক থেকে এবং রাজনীতির মধ্যযুগ (medieval period) শুরু হল।

১৩.৪. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস: মধ্যযুগ

মধ্যযুগের ইতিহাসের শুরুতেই দেখা যায়, লক্ষ্মণ সেন নদীয়া থেকে পূর্ববাংলায় পালিয়ে গেলেন। এখানে সেনবংশ রাজত্ব চালাল আরও বছর পঞ্চাশ মতো। খিলজীর রাজনৈতিক অভিসন্ধির চেয়ে বড় ছিল লুঠপাট চালানো। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে এই ঘটনার গুরুতর তাৎপর্য লক্ষ করা যায়।

খিলজি সত্যিকারের বঙ্গবিজেতা নন। কারণ সেনবংশের রাজারা তেরো বছর স্বাধীন রাজত্ব চালান। আবার ত্রিপুরার হরিকালদেব সামন্ত হালেও স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতেন। মুসলমান শাসনের লখনৌতি রাজ্য বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল। এটি পরে গৌড়-সুলতানিয়তে পরিণত হয়। তিনি বৌদ্ধমঠ হিন্দু

মন্দির ধ্বংস করলেও মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ মুসলমানের সংখ্যা না বাড়ালে সদ্য তৈরি মুসলিম রাষ্ট্র টিকবে না, এটা তিনি অনুভব করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলি মর্দান সরকারিভাবে এই অঞ্চলের শাসনভার পাওয়ার পর তিনি আমীর ও হিন্দু প্রজাদের উপর অসহ্য অত্যাচার করেন। এখানে তাকে সাহায্য করেছিল সদ্য আনা তুর্কি বাহিনী। অর্থাৎ তুর্কি গোষ্ঠী খিলজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

পরে সুলতান কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১২১০) তুর্কি সাম্রাজ্য চার টুকরো হয়ে যায়। আলি মর্দান প্রথম সুলতান উপাধি নেন। পরে তুর্কি-খিলজি আমীরদের হাতে তিনি নিহত হন।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সেনরাজারা মুসলিম ভয়ে ত্রস্ত থাকতেন। লক্ষ্মণ পুত্র কেশব সেনের গৌড় ত্যাগ এবং বিশ্বরূপ সেনের 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ প্রমাণ করে যে তারা স্বাধীন রাজাই ছিলেন।

বাংলার সংঘবদ্ধ মুসলমান সমাজের বিরোধিতা যে কঠিন তা ইলতুৎমিস জানতেন। তবু অযোধ্যায় হিন্দু বিদ্রোহের সুযোগে তিনি পুত্র নাসিরউদ্দিনের সাহায্যে লখনৌতি দখল করেন।

প্রায় ষাট বছর (১২২৭-১২৮৭) বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানিয়তের অধীনে থাকে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে দশজন শাসনকর্তাই ছিলেন সুলতানের ক্রীতদাস 'মামলুক'। এদের শাসনকালে রাজদরবার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বড়ের শীর্ষে উঠেছিল। অথচ ক্ষমতার জন্য আমীর ওমরাহদের প্রতিযোগিতা ও হানাহানি প্রকট। অরাজক চেহারা নিয়েছিল। এ যুগে একটা রাজনৈতিক রীতি গড়ে ওঠে লখনৌতির শাসককে হারাতে পারলে তিনি সারা বাংলার মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু প্রজারা ধর্মনির্বিশেষে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। মুসলিম শাসক ও হিন্দু শাসিতের মধ্যে সহযোগিতাও গড়ে উঠল। উত্তর ভারতের উদ্বাস্তু হিন্দুরা বাংলায় আশ্রয় সন্ধানে আসত। তাদের সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত বাঁধত। কিন্তু পরে বিদ্বেষ কমে যায় এবং হিন্দুরা সরকারি মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

দিল্লী থেকে বাংলায় এসে হাজী ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির বদলে বাঙ্গালার রাজা এবং ইলিয়াসী শাহী বংশের সুচনা করলে তারা প্রায় দেড়শ বছর মর্যাদার সঙ্গে এখানে রাজত্ব করেন। একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু কর্মচারীরা অভিজাত সম্প্রদায়ের পত্তন করল যার পরিণতিতে গণেশের উদয়, নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (১৪১৪)। মুসলিম সাধু সন্ত, মোল্লা উলেমারা বিরুদ্ধে গেলে জৌনপুরের সুলতান বাংলা দখল করলেন। গণেশের পুত্র যদু ধর্মান্তরিত হন। ফলে এক ধর্মান্তরিত রাজবংশের রাজত্ব শুরু হল। ক্রীতদাসেরা সুলতানকে হত্যা করে এবং পরে আমীর-ওমরাহরা ১৪৪২ ইলিয়াস শাহী বংশের একজনকে সিংহাসনে বসান। হাবসী খোজাদের আমদানি করার পর তারা ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করে। সুলতানিয়কে রক্ষার পরিবর্তে হাবসীরা (Abyssinians) প্রভু হয়ে পঞ্চাশ বছর প্রায় শাসন চালান। সকলে এদের বিরুদ্ধে গেলে উজীর হুসেন শাহ ১৪৯৪ নাগাদ এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে সুশাসন, সুসংস্কৃতি, ন্যায়রাজকতা, গৌড় রাজ্য ছিল শত্রু দিয়ে ঘেরা। লোদীদের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হলে তা বাংলার নিরাপত্তায় বাধার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক স্থিরতা (political balance) এবং উদার রাষ্ট্রনীতির ফলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি ও বিনাশ সংগঠিত হয়েছিল। সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এক আলাদা চেহারা নেয়।

হুমায়ুনের আগ্রাসী মনোভাবের গুজব প্রচলিত হওয়ায় বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

পরে রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে কর্মচারী, শাসনকর্তারা স্বাধীন আচরণ শুরু করেন। এই সময় বাংলাকে আফগান শের খাঁর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পর্তুগীজদের সাহায্য নেওয়া হয়। ১৬১৭ নাগাদ পর্তুগীজরা চট্টগ্রামে ঢোকার অনুমতি পায়। এর পর তারা ব্যবসা ও কুঠি গড়ার অনুমতি পেল। বিদেশি বাণিজ্যশক্তি এভাবে আসায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (political stability) বিপন্ন হল। ১৫৩৮-এ শের খাঁ বাংলা দখল করলেন। বাংলা স্বাধীনতা হারাল, রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলল সপ্তদশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর অবধি।

১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ পর্যন্ত মোগল-আফগান লড়াই চলতেই থাকে। বাংলা জয় করতে তাই মোগলদের লাগল ১৫ বছর। আকবর এ বাংলার সেনাপতি ও শাসনকর্তারূপে মানসিংহকে নির্বাচন করার পর ১৫১৫-এ তিনি (মানসিংহ) রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করে 'ভাঁটি' বা পূর্ববাংলায় অভিযানে যান। বার ভূঁইয়ারা হেরে যাওয়ার পর ঢাকা হল রাজধানী।

রাজনৈতিক শান্তি ফিরে এল শাহজাহান এখান থেকে যাওয়ার পর যে বিদ্রোহী রূপে বাংলা দখল করেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে জাহাঙ্গীরের আমল হল যুগান্তকারী। প্রজাদের সঙ্গে সম্রাটের যোগাযোগ ছিল সামান্য। মীরজুমলার শাসনে মোগল প্রশাসন ভেঙে পড়ে। প্রজাদের ওপর চরম অত্যাচার চলে। শায়েস্তা খাঁর আমলে আবার রাজনৈতিক স্থিতি ফিরে আসে। ঔরঙ্গজীবের সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে নাম দেওয়া হল ইসলামাবাদ।

শাহজাহানের আমলে পতুগীজদের সঙ্গে মোগলদের সদ্ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। ঔরঙ্গজীবের সময় মোগলদের সঙ্গে ইংরেজরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। পরে শান্তি এলে জোব চার্ণক আসেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ হয়ে। কলকাতা ও পাশের এলাকায় ইংরেজ জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হল। বণিকের মানদণ্ড শেষে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগল। ১৩৫৬-তে ডাচ বণিকরা চুঁচুড়া বাণিজ্য কুঠি, পরে দুর্গ গড়ে তোলে। অর্থাৎ সপ্তদশ শতক শেষ হওয়ার আগে ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য সভ্যতা বাংলায় বিস্তৃত হয়েছিল।

শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ ১৬৯৫-৯৬ সালে বিদ্রোহ করে। একে উপলক্ষ্য করে ইংরেজ, ফরাসী ও ডাচ বণিকরা বিদেশি কুঠিগুলিকে বাঙালির আশ্রয়স্থল (shelter) রূপে গড়ে তোলে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ১৭৪০ নাগাদ আলিবর্দী খাঁ স্বাধীন নবাব হতে পেরেছিলেন। বাংলায় এ সময় মারাঠা বর্গীদের অভিযান এবং লুঠতরাজ বাঙালিকে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি করে। ফলে উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর অবধি বিরাট অংশ বাংলার নবাবীর হাতছাড়া হল। পশ্চিম বাংলার নানান সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশার মানুষ নিরাপদে থাকবে বলে কলকাতায় এল। সরকার এসময় তাদের সাহায্য করেছিল। মারাঠা আক্রমণ এবং পরে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) বাংলার রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কোম্পানির শাসন, নবাবী শাসন-এই দ্বৈত ব্যবস্থা এই শতকের শেষ দিকে পুরোপুরি ইংরেজের অধীনে চলে গেল।

১৩.৫. বাঙালির ধর্মচেতনা

বাঙালির ধর্মচেতনার একটা সরল ছবি আঁকাও সম্ভবপর নয়। ধর্মকর্মের জীবন প্রতিদিনের জীবন আলোচনার থেকে অনেক কঠিন। কেন না ধর্ম ও তার লোকাচার, বিশ্বাস এবং সংস্কার বর্ণ শ্রেণী জাতিভেদে আলাদা হতে বাধ্য। একে অনেকটা বহুস্তরীয় (multi level) বলা যেতে পারে। ধর্ম ছাড়াও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস যোগাচার কিভাবে তাদের ভাবনা থেকে মূর্তি, মন্দিরে রূপায়িত করল, সেটা জটিল বিষয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে পূজা উদযাপন একটা সমষ্টির, বারোয়ারির রূপ নিয়েছে। সেখানেও ধর্মাচরণ এক হতে পারে, ভক্তি বিশ্বাসের পাত্রবদল ঘটতে থাকে। আবার এর সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতার যোগাযোগ থাকে। যারা সমাজে ক্ষমতাশালী, তাদের ধর্মই একটা স্তরে পৌঁছয় যা অন্যদের প্রভাবে ফেলে। অর্থাৎ ধর্মের জগতেও একটা অতিক্ষমতাবান, মধ্যক্ষমতাবান কিংবা ক্ষমতাহীনতার লীলা দেখা দেয়। আবার রাজধর্ম হিসেবে যা বলবত্তর, তা প্রজাদের অনুসরণযোগ্য মনে হয়। রাজারা বৌদ্ধ হলে দেশে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ, অনুরাগ, পূজাস্থল বা বিহার নির্মাণ, ভিক্ষুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আবার রাজধর্মের বদল হতে পারে। আবার রাজধর্ম হলেই তা প্রজার ধর্ম না হয়ে দুটি স্রোত বইতে থাকে-একটি রাজধর্মের, অন্যটি লোকধর্মের। এদের মিশ্রণও ঘটতে পারে, যাকে আমরা সমন্বয় বলতে পারি। এমনও হতে পারে একটি ধর্মের স্রোতে অন্য ধর্মেরা মিলে গিয়ে নবরূপে প্রকাশ পেল। তখন আদি ধর্মের লক্ষণগুলি গণনা করা দুস্কর হয়ে ওঠে। বাংলায় ধর্মচেতনার আলোচনায় এই সামান্য কথামুখটি সম্প্রসারিত হতে পারত নানান তথ্যের জটিলতায়। আমরা বরং আলোচ্য তিনটি ধর্মের বন্ধীকরণ উপলক্ষ্যে এই মিশ্রণ বা সমন্বয়ের অনুপাত ধরার চেষ্টা করব।

১৩.৬. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

বাঙালির ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে সমন্বয়ের সাক্ষ্য কমই আছে। সেখানে অনেক জনও কৌমের অর্থাৎ আদিবাসীর পুজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের ইতিহাস পাই। জন্ম-মৃত্যুর বিশ্বাস, দেব-দেবী রূপকল্পনা আচার অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের ধ্যান ধারণাগুলি আমরা গ্রহণ করছি।

বৌদ্ধ জনশ্রুতি যদি মেনে নিই তবে জৈনদের আজীবকদের কালেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলায় বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোকের আগে বৌদ্ধধর্ম বাংলার কোন কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। অশোকের সময়ে তা বাঙালির মন জয় করেছিল নিশ্চয়ই। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্ষুরা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করতেন।

প্রাক্-গুপ্তপর্বে বৌদ্ধদের প্রভাবের প্রমাণ পেলেও ব্রাহ্মহ্মণ্যধর্মের কোনো চিহ্ন মেলে না। বেদ সংহিতায় বাংলার কোনো উল্লেখ নেই, ঐতরেয় আরণ্যকে নিন্দা করা হয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বৌদ্ধ প্রভাব বেশি হয়েছিল। বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে বিশেষত উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করতেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত স্তূপ স্থাপন করেন উত্তরবঙ্গের কোনো স্থানে। ফা হিয়েন তাম্রলিপ্তি বন্দরে বৌদ্ধ সূত্র ও প্রতিমা চিত্রের নকলনবিশী করেছেন দু বছর। তার সময়ে ঐখানে বত্রিশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

চীনা শ্রমণদের সৌজন্যে সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেয়েছি। ঘুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। পুণ্ড্রবর্ধনে ছিল দশটি বিহার, তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে বসবাস করতেন। সবচেয়ে বড়ো বিহারে সাতশ মহাযানী ভিক্ষু বাস করতেন। তাম্রলিপ্তে দশের বেশি বিহারে এক হাজারের বেশি অধিবাসী ছিলেন। এ সময়ে বেশির ভাগ বাঙালি শ্রমণ ছিল হীনযানপন্থার। এক-চতুর্থাংশ ছিলেন মহাযানপন্থী, সর্বাস্থিবাদী, ধর্মগুপ্তবাদী, মহাসাংঘিকবাদী শ্রমণেরা হীনযানের বিনয়-শাসন মেনে চলতেন। তাম্রলিপ্তের জনৈক চীনা সন্ন্যাসী পরে চীনদেশে নিদানশাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদও করেন। কঠোর নিয়ম সংযম তারা মানতেন, সংসার থেকে দূরে থাকতেন, জীবহত্যার পাপ করতেন না। ভিক্ষুনীরা কখনই বাইরে একা যেতেন না।

বঙ্গ ও সমতটের খড়্গ রাজবংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ এবং তারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমতটের পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের সেনাপতি বৌদ্ধ জয়নাথ ব্রাহ্মণদের পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য জমিদান করেছিলেন। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে উল্লিখিত রাজবংশ ছাড়া বৌদ্ধধর্মের কোনো পৃষ্ঠপোষক ছিল না। বিহারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি কম ছিল। মুয়ান চোয়াঙের সময়েই বৌদ্ধধর্ম তার সমৃদ্ধি হারিয়েছিল। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সহায়তা পেলেও বৌদ্ধধর্মের অবনতির স্রোত আটকানো যায় নি। যদিও বঙ্গ, গৌড় এবং মগধে রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে এই ধর্মকে আরো চার-পাঁচশ বছর টিকিয়ে দিল। ফলে মহাযান-যোগাচার-বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের নতুন রূপ এল। এই নতুন বৌদ্ধধর্মের রূপারোপ একান্তভাবে বাঙালি মনীষার সৃষ্টি। বজ্রযান গুহ্য সাধনার সূক্ষ্ম স্তর হল সহজযান। এখানে দেবদেবীকে স্বীকার করা হয়নি, তেমনই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি নেই। এই সাধন পদ্ধতি দোহাকোষে ও চর্যাগীতিতে ধারণ করা আছে।

সহজযানীদের মতে বোধি বা পরমজ্ঞান সাধারণ লোক কেন বুদ্ধদেবও জানতেন না। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থান কোথায়? সকলেই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন এবং দেহই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান। শূন্যতাবাদ, বিজ্ঞানবাদ দূরে সরে গেল। এল শুধু দেহবাদ, কায়াসাধন। শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ: এদের মিলনে বোধিচিত্তের পরমানন্দ আসে সেটাই মহাসুখ। এখানে ইন্দ্রিয়বোধের বিলুপ্তি ঘটে, সংসারজ্ঞান থাকে না, আত্মপর বোধ থাকে না, সংস্কার লোপ পায়।

ধীরে ধীরে গোপন বা গুহ্য সাধনা প্রবল হতে থাকে। বৌদ্ধ মহাসুখবাদ সঙ্গে তান্ত্রিক মোক্ষ সাধনপন্থার কোনো ফারাক রইল না বলে একে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলেও অনেকে অভিহিত করেন।

১৩.৭. বাংলায় জৈনধর্ম

বাংলার সবচেয়ে পুরনো ধর্ম হল জৈনধর্ম। এটি গুপ্ত রাজত্বের আগে উত্তরবঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। অথচ গুপ্ত পর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা মূর্তির প্রমাণ মেলে নি। পঞ্চম শতকে পাহাড়পুরে একটি জৈনবিহার ছিল। বারাণসীর নিগ্রন্থনাথ আচার্যের শিষ্য ও তাদের অনুসরণকারীরা বিহারের হলেও তারা এক ব্রাহ্মণ দম্পতির কাছ থেকে জমি লাভ করেছিলেন দৈনন্দিন পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য। মাত্র

দেড়শ বছর পরে ঘুয়ান-চোয়াঙ জানাচ্ছেন যে বাংলার দিগম্বর জৈনদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এটা কেন হল, তা বলা এখন কঠিন। বাংলায় একসময় আজীবকদের প্রতিপত্তি ছিল। তাদের সঙ্গে জৈন নিগ্রন্থীদের আচরণের ফারাক ছিল না। বহু সময় এদের একের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় আজীবকরা আলাদা অস্তিত্ব তৈরি না করায় নিগ্রস্থীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে মুয়ান-চোয়াঙও ভুল করেছিলেন।

পাল ও সেনপর্বে জৈনদের কোনো লিপি বা গ্রন্থ দেখি না। কিন্তু প্রাচীন বাংলার অনেক জায়গায় জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। নিগ্রন্থ জৈনরা এসব মূর্তি তৈরি করেছেন। পাল পর্বের শেষ দিকে বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে নিগ্রন্থ জৈনদের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের অনেক জৈন মূর্তি ও মন্দির পরে পাওয়া গেছে।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দশ-বারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে একালে। এই মূর্তিগুলি ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ ও পার্শ্বনাথের (পরেশনাথ)। মুর্তিগুলি সবই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। একাদশ-দ্বাদশ শতকে গৌড়ে, বঙ্গে ও পশ্চিম রাঢ়ে এদের সংঘ অস্তিত্ব (institutional identity) ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মূর্তিটি মুন্ডহীন, ভগ্নবাদ, একান্ত নগ্ন জৈন মূর্তিটি আদিতম জৈন প্রতিমা হিসাবে আমাদের কাছে এসেছে।

বহুকাল পরে জৈন ধর্ম ও আচার প্রতিপালন গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের জগৎসিংহ পরিবারের এবং সহযোগী ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে। এই মুহূর্তে বাংলায় জৈন ব্যবসায়ীদের সংখ্যা প্রচুর বলে তাদের রীতিনীতি, মন্দির স্থাপন দেখতে পাই। জৈনধর্ম নিয়ে একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তবে এদের অনুরাগীদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা এখন বিশেষ নেই।

১৩.৮. বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের সূচনার আগে থেকেই বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মের উপাসকদের পাওয়া যায়। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব (বিষ্ণু, অন)। আর বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, তাই কৃষ্ণের উপাসকগণ বৈষ্ণব নামেই পরিচিত। সারা ভারতে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার মূর্তি পাওয়া যায় যা থেকে বৈষ্ণবদের কথা জানা যায়। তবে সবই তখন সংগঠিতভাবে হয়নি।

গৌড়বঙ্গে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। চৈতন্য নিজে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পথে নামেন নি। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে, সংকীর্ণতার পরিবর্তে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবটি ফুটে ওঠে এবং তাঁর অনুগামীরা আকৃষ্ট হন। প্রায় তিন শতকের বেশি সময় ধরে বৈষ্ণব আন্দোলন চলতে থাকে এবং গৌড়বঙ্গ উৎকল, সমগ্র পূর্বভারতে সেই আন্দোলনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এরও স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে, বর্তমানে আমরা সংক্ষেপে সেই ইতিহাসটি একটু দেখে নিতে পারি।

বাংলায় পুরনো লিপিতে (ধর্মপালের খালিমপুর) নন্ন নারায়ণের (গু নন্দ নারায়ণের) উল্লেখ আছে।

ইনি নন্দদুলাল কৃষ্ণাবতার নারায়ণ। দণ্ডায়মান বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী (শ্রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান। তাদের পূজা একত্রেই হত। স্তম্ভশীর্ষ গরুড় প্রতিমাও নানান জায়গা থেকে পাওয়া গেছে।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলায় বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যা বেশি। এই বৈষ্ণব পরিবারের পরিচয় হল বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; কোথাও দেবী বসুমতী; নিচে বাহন গরুড়; দুই দ্বারপাল জয়-বিজয়; বিষ্ণু-কৃষ্ণের বারো অবতার এবং ব্রহ্মা।

বেশির ভাগ বিষ্ণু মূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান, আসন বা শয়ান মূর্তি কম। কখনও কখনও চতুর্মুখ বিষ্ণু মূর্তিও পাওয়া গেছে ব্রহ্মার আদলে। অবতার হিসেবে বিষ্ণু মূর্তি বরাহ, বামন, নৃসিংহ রূপে পাই।

সেন-বর্মণ পর্বের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুদিকে সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে বিষ্ণুর দশাবতার অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পনা। এই রাধাকৃষ্ণের ধ্যানকল্পনা চৈতন্য পর্বের (ষোড়শ শতক) সৃষ্টি তা সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত সবচেয়ে পরাক্রমী ধর্মভাবনা। সেন পর্বে রাধা গোপিনীরূপে কল্পিতা-এখানে শাক্তধর্মের প্রভাব আছে। কৃষ্ণ বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র আর রাধা হলেন শক্তিদেবী, বজ্রযানীর নৈরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। এভাবে অতীত ও সমকাল বৈষ্ণব ধর্মকে স্পর্শ করেছিল। পরবর্তী সহজিয়া রাধাকৃষ্ণ পুরুষ প্রকৃতি ও শক্তি ধ্যান কল্পনার সঙ্গে একত্র হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম আমাদের উদ্দেশ্য হলেও তার প্রাকপট না জানলে এমন মনে হতে পারে যে চৈতন্যের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম ছিল না। চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মকে কালোপযোগী করে, শাস্ত্র থেকে এদের মানবীয় কল্পনা করে, বিভিন্নভাবে ভক্তি-প্রেম-কামের বৈলক্ষণ চিহ্নিত করলেন। তার চেয়ে বড়ো হল নিজের জীবনকে এই রাধাকৃষ্ণের অন্বয় বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক ভাষ্য তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু তার দিব্য জীবনকে মনে করা হয়েছে অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর কিংবা রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্। সমস্ত মিলিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব শুষ্কতা কিংবা শাস্ত্রবিতর্ক সব কিছু একটা ক্রমে এসে পৌঁছেছে চৈতন্য জীবনে। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা করলেন, সমকালে ও উত্তরকালে বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম শ্রেণীর কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রসপর্যায় নিয়ে অসামান্য কবিতা লিখলেন যা শতাব্দী পার করে এখনও প্রতিক্রিয়া জানায়। বৈষ্ণবতত্ত্ব ভাষ্য লিখলেন ষড় গোস্বামী। প্রথম মানুষের জীবনী সাহিত্যে এল চৈতন্য জীবনীর রূপ ধরে। এভাবে একজন মানুষ মহামানব হয়ে উঠলেন তার পূত বা চিত্রজীবন রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বাংলায় প্রত্যক্ষ করাল। কীর্তন গান এল যা আসলে জাতপাত ভেদহীন সম্মেলন সংগীত। বৈষ্ণব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পরবর্তী পর্যায়ে। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো বছর ধরে চৈতন্যপ্রভাব বৈষ্ণব ধর্মের একটা জনপ্রিয় রূপ বাঙালির সামনে হাজির করল।

চৈতন্যদেবের লালিত রাধাকৃষ্ণ ভক্তিলীলার 'জনতারে দিই কোল' অনেকদিন স্থায়ী হয়নি। কেন না বৈষ্ণব মঠ মন্দিরে এক সময় নারীরা আশ্রয় পেলেন। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে দেখি যে ঐগুলি নৈতিক অধঃপতন, যৌন দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠল। বৈষ্ণবদের নেড়ানেড়ি বলে বিদ্রূপ করা শুরু হল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমধারা বাঙালির জীবন থেকে অন্তর্হিত না হলেও এক শুকনো আচার অনুষ্ঠান নিত্যকৃত্যে পরিণত হল। যদিও চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অসামান্য প্রয়াসে বাংলা উড়িষ্যা এবং বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ভক্তের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছিল, সেভাবে অনুরাগী পরিবারের সংখ্যা এখনও অগণিত।

যদিও বৈষ্ণব পরিচয় দেওয়াটা একালে একটু আড়ালে চলে গেছে। তবু রাধাকৃষ্ণ মন্দির ভজনা নামগান কীর্তন এখনও বাঙালির গ্রামীণ জীবনের সম্পদের মতো, ঐতিহ্যের মতো। কালের কঠিন স্পর্শে বৈষ্ণবতা হয়তো আমরা পালন করি না। কিন্তু প্রেমের, অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে বীজমন্ত্র চৈতন্য আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, তা প্রকট না হলেও সযত্নে লালিত অন্তরচারী ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৩.৯. সমন্বয় চেতনা

সমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাকেও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে। সহজযানী সরহপাদ চর্যাগীতিতে অন্য সব ধর্মকে আক্রমণ করেছেন, বর্ণাশ্রমকে আক্রমণ করেছেন, বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার, বেদ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার জানিয়েছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করেছেন, কঠোর সাধনার সন্ন্যাসকে প্রত্যাঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন জৈনদের মতো উলঙ্গ (দিগম্বর) থাকলে যদি মুক্তি আসে তাহলে শেয়াল কুকুর আগে মুক্তি পাবে। বল্লাল সেন নাস্তিকদের পদচ্ছেদ করতেন। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করতেন। আবার চৈতন্য ভাগবতে দেখি বৌদ্ধদের প্রতি বৃন্দাবনদাস কটুক্তি করেছেন।

এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের দৃশ্য বজ্রযানী দেবদেবী কল্পনাতেও আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইন্দ্রকে বলা হয়েছে মার (অশুভ, হত্যা)। শিবকে দশভুজামারীচীর পায়ে পিষ্ট দেখানো হয়েছে। ত্রৈলোক্যবিজয় শিবগৌরীকে পায়ে মাড়াচ্ছেন। ইন্দ্র অপরাজিতার ছাতা ধরে আছেন। ইন্দ্রাণী পরমেশ্বরের কাছে অপদস্থ হচ্ছেন। গণেশ তিনজনের দ্বারা পদপিষ্ট। অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুর কাঁধে উঠে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরাজয় ঘোষণা করছেন। এতটা নির্মিত ভাব বাঙালি ভাস্কর্যে করে নি। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। এখানে গণেশ কাজী, ব্রহ্মা মহম্মদ, বিষ্ণু পয়গম্বর, শিব আদম, নারদ শেখ এবং ইন্দ্র মৌলানা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এখানে পর্যুদস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই ধর্মসংঘাত একান্ত বাইরের বস্তু (outward manifestation) মিলন-সমন্বয়ের কথা হল বাঙালির মনের কথা। মানবতার যে কথ্য চর্যা থেকে চৈতন্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তাকে মুছে ফেলা যায় না। পরমতসহিষ্ণুতা যেমন বাঙালির গুণ ও দুর্বলতা, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটা ঐক্যসন্ধান বা সমজাতীয় (homogeneous) করে তোলা তার বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। খলা, পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা এই মিলনযজ্ঞে উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দেবদেবীর রূপকল্পনায় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। বৌদ্ধ দেবালয়ে যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী স্থান পেতে শুরু করলেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সীমানায় বৌদ্ধ দেবদেবীরা প্রবেশ করলেন। বৌদ্ধ সরস্বতী, বিঘ্ন নাটক ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস থেকে নেওয়া। চর্চিকা ও মহাকাল রূপে তারা বৌদ্ধধর্মে স্থান পেয়েছেন। যোগাসন এবং লোকেশ্বর বিষ্ণু, ধ্যানী শিব বুদ্ধের ধ্যান মূর্তি থেকে নেওয়া। বিষ্ণু ও শিবমূর্তির ওপরে খোদাই করা দেবমূর্তি তো ধ্যানী বুদ্ধেরই রূপভেদ।

বৌদ্ধ তারা দেবী, কালী, দুর্গা, উমা, পদ্মাবতী, বেদমাতা সকলে একই দেবীর ভিন্ন রূপ। লোকায়ত স্তরে এদের আলাদা মনে করা হত না।

অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাঙ্গীকরণের (assimilation) মাত্রা বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বেশি ছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে শিব পার্বতী গণেশ মনসারা পুজো পেতেন। এখানে বৌদ্ধধর্মের উদারতা সক্রিয় ছিল। অথচ বৌদ্ধ সংসারী মানুষের কাছে ব্রাহ্মণ্য মত কেন জানি না ক্রমেই গ্রাহ্য হচ্ছিল। পাল আমলের শেষ দিকে

উচ্চ এবং মধ্য বাঙালির স্তরে বৌদ্ধ প্রভাব কমে আসছিল।

আসলে সিদ্ধাচার্যরা তাদের সাধনাকে গোপন থেকে গোপনতম করায় সাধারণ মানুষ যারা বৌদ্ধ মতের অনুরাগী ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেন আমলে রাজারা হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। আবার প্রতিমা আরাধনার দিক থেকে (idol worship) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবধান করতে শুরু করল।

তত্ত্বের দিক থেকেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। যেমন আজও শিবলিঙ্গের মাটির প্রতিমার ওপর একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়, তার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়ে তাকে সরিয়ে তবে ঐ মূর্তি শিবপূজার যোগ্য হয়। এখানে সংঘাতের চিহ্ন আছে, আবার সামান্যের (proximity) বিন্দু আছে।

বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের অংশ করে নেওয়া হল। ব্রাহ্মণ কবি মাঘ শিশুপালবধ কাব্যে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে বুদ্ধাবতারকে বেদবিরোধী বলে প্রণতি জানানো হয়েছে। জয়দেবের গীত গোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধের যজ্ঞে পশুবধ-বিধির প্রবর্তক দেবসমূহের নিন্দার উল্লেখ করা হয়েছে-ত্নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজ্ঞাতং...দ।

এভাবে বেদবিরোধী বৃদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য একাকার হল। বিহারগুলিতে কিংবা সংঘারামে সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর ধর্মচেতনা সতেজ থাকলেও সেন-বর্মণ আমলে তার মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতা ঢুকে গেল। একসময় নালন্দা-বিক্রমশীলা-ওদন্তপুরীর মহাবিহার তৃর্তী আক্রমণে ভেঙে পড়ল, হাজার পুঁথি নষ্ট হল, শতেক শ্রমণ প্রাণ হারাল। যারা বেঁচে থাকলেন তাঁরা বহু কষ্টে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করে তিব্বতে-নেপালে-কামরূপে ওড়িশা পেগু আরাকান আরও দূরে আশ্রয় নিলেন। সেই অবলুপ্তির থেকে বেঁচে যাওয়া বইয়ের কিছু অংশ উনিশ বিশ শতকে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এই ধ্বংসলীলা এবং তার থেকে জানকুম্ভ রক্ষা আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেন রাজবংশের শেষ রাজারা যখন পূর্ববঙ্গে ছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম একদম নিশ্চিহ্ন হয়নি।

আবার যখন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি সুফী ধর্মকে মেনেও কবি আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেছেন হিন্দু জনশ্রুতি নিয়ে। মৈমনসিংহ গীতিকার মুসলিম-হিন্দুর প্রণয় নিষেধাজ্ঞা পায় নি। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, ওলাবিবি এসবের পূজো প্রমাণ করে ধর্মের সমন্বয় ক্ষমতাও একটা বিচার্য বিষয়। বাঙালির বিভিন্ন পূজাপার্বণে মুসলিমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন মণ্ডপ নির্মাণ, পুজোর উপচার সংগ্রহ, দেবীমূর্তি রক্ষায়। দেবীর প্রসাদ গ্রহণেও তারা বীতরাগ নন। সব মিলে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সমন্বয় কামনার একটা জোরালো দিক আছে। সেটি সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে সচকিত হলেও অনেক সময়ই সংকীর্ণ চেতনার দাসত্ব করে থাকি।

১৩.১০. সারাংশ

আলোচনার শেষে সংক্ষেপে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখ করা যায়। বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রাচীন ভারতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। মহাভারত বা অন্যান্য দু'একটি গ্রন্থে শুধু 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ বাংলার শাসন ব্যবস্থায় আসার আগে বাংলার রাষ্ট্রাদর্শ সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোনো কিছু জানা যায় না। পরে শশাঙ্কের রাজত্বকাল গৌড়-বঙ্গের পরিচয়

পাওয়া যায়। প্রাচীন বঙ্গদেশে কৌম শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গুপ্ত রাজারা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় আসার পর এখানকার শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত-নির্ভরতা দেখা দিয়েছিল। তবে অষ্টম শতক নাগাদ পাল বংশের সূচনা থেকে ত্রয়োদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রাচীন যুগের অবস্থ্য বলা যায়। বখতিয়ারউদ্দিন খিলজির বাংলা আক্রমণ ও লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ার পর থেকেই 'মধ্যযুগ' ধরা হয়ে থাকে। তারপর ক্রমশ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সূচনা ও দীর্ঘকাল তার স্থিতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনভার নেওয়া পর্যন্ত। এভাবেই বাংলার রাজনীতিতে আধুনিক যুগের সূচনা।

আবার বঙ্গদেশ নানান ধর্মভাবনায় পূর্ণ। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, তাদের নানান শাখা-প্রশাখা। হিন্দুদের মধ্যেই অজস্র শাখা, তার উপর অনার্য ধর্মভাবনায় বাংলা বৈচিত্র্যময়। তাই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। হিন্দুদের নানা শাখায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। আবার হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-ইসলাম সংঘাত যেমন বর্তমানে তেমনি প্রাচীনকালেও লক্ষণীয়। এরই মাঝে সমন্বয়ের চেতনা বা সাধনা দেখা গেছে। বিশেষ করে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রসার লাভ করে, যদিও বৈষ্ণবরা বহুযুগ ধরে ভারতে ধর্মাচরণ করে চলেছেন। চৈতন্যদেব নিজে ধর্ম প্রচারের জন্য পথে নামেন নি, তবে তাঁর আচার-আচরণে, তাঁর কৃষ্ণভক্তির গভীরতায় (তাঁর 'আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শেখায়') যে আদর্শ ধরা পড়ে, তাই ভক্তরা গ্রহণ করেছেন। ক্ষুদ্র, হীন, নীচ, পরধর্মী হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ লুপ্ত করে তিনি মানবতাকেই চরম মর্যাদা দিয়েছেন। সেই ধারাতেই বাংলায় সমন্বয় চেতনা জেগে উঠেছিল বাঙালি সমাজে।

১৩.১১. অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরাভিত্তিক প্রশ্ন:

- রাজনীতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- কৌম শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
- মধ্যযুগের সূচনায় রাজনৈতিক প্রবাহের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দিন।
- বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিকাশ ও সূচনা প্রাচীনকালে কিভাবে হয়েছিল, তার বিবরণ দিন।
- বৈষ্ণব ধর্ম কিভাবে বাঙালি মনে স্থান করেছিল, তার বিবর্তনধারা বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

- জৈনধর্মের সম্পর্কে কি জানতে পারা যায়?
- বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলমিশ কিভাবে দেখানো হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
- বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা চৈতন্য কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন।
- সংঘাত ও সমন্বয় কামনা ধর্মের অপরিহার্য পরিণাম, তা জানান।
- ধর্মের সমন্বয়ী চেতনার একটি উদাহরণ দিন।

একক ১৪ ❒ চৈতন্যদেব ও বাঙালি সংস্কৃতি

১৪.১. উদ্দেশ্য

১৪.২. প্রস্তাবনা

১৪.৩. চৈতন্যদেব: জীবনালেখ্য ও পটভূমি

১৪.৪. চৈতন্য-সমকালীন ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্যপ্রেক্ষিত

১৪.৫. চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি

১৪.৬. বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব

১৪.৭. চৈতন্যের উত্তরাধিকার পর্ব

১৪.৮. সারাংশ

১৪.৯. অনুশীলনী

১৪.১. উদ্দেশ্য

চৈতন্যদেব বাংলার জনমানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘ দু'তিন শতক। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁকে ঘিরে বাঙালির জীবন বিবর্তিত হয়েছিল দীর্ঘদিন। সেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

১৪.২. প্রস্তাবনা

চৈতন্য একজন ব্যক্তি, রাধাকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ, পরমভক্তই নন, তাঁকে বাংলা সংস্কৃতির একটা মোড় ফেরানো ব্যক্তিত্বরূপে (epach making) কল্পনা করা উচিত। ব্যক্তি জীবনে যেমন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা অর্জন করেছিলেন, তেমন বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা বাঙালির জনমানসে শতকব্যাপী প্রভাব ফেলেছিলেন। অনেকে তাঁর সমকালকে 'চৈতন্য যুগ' নামে চিহ্নিত করতে চান। বাংলায় ব্যক্তি নামে যুগের নামকরণ দেখি না। আসলে তাঁর ভক্তিস্নাত প্রেমমূর্তির পাশে সমাজ ভাবনা সমকালীন বাঙালি চেতনাকে কম আলোড়িত করে নি। প্রায় পাঁচশ বছর পরে তিনি আলোচনার বিষয়, বিতর্কের বিষয় এমনকি গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষা এবং মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে তিনি গণ্য হয়েছেন। বাংলায় তাকে নিয়ে সমকাল উত্তরকালে অজস্র কবিতা রচনা করা হয়েছে, তাঁর জীবনী লেখার প্রসঙ্গ হয়ে জীবনী সাহিত্যের সূচনা করেছে, এমনকি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রাধাকৃষ্ণ লীলার পরিশ্রুতির ভূমিকা নিয়েছে, যা ঈশ্বরের প্রেমলীলাকে সঠিকভাবে গ্রহণের চাবিকাঠি বা কুঞ্চিকা। এর নাম গৌরচন্দ্রিকা।

একদিকে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন, ভক্তি প্রচারে পরিব্রাজক 'কৃষ্ণনামে দিই কোল' মানবপ্রেমে মাতোয়ারা

মানুষটির জীবন যতটা আকর্ষণীয়, ততটাই প্রভাব ফেলেছে বাঙালির মন-মনন-শিল্প-সাহিত্যচর্চায় এমনকি জীবনচর্যাতেও। সেই মহৎ জীবন এবং তার যুগান্তকারী সঞ্চরণশীল প্রভাব স্রোতমালা বাঙালির অবশ্যপাঠ্য রূপেই এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজিত হচ্ছে। ব্যক্তিজীবন কিভাবে সমষ্টিকে আন্দোলিত করতে পারে, তার একটা অনুভবী উপস্থাপনা আমাদের লক্ষ্য।

১৪.৩. চৈতন্যদেব: জীবনালেখ্য ও পটভূমি

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমায় চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। প্রথম সন্তানের জন্মের পর ছয়জন নবজাতকের মৃত্যুতে মিশ্র দম্পতি শোকগ্রস্ত হয়ে চৈতন্যের বাল্যকালে নাম দেওয়া হল নিমাই। আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আবার তাঁর গৌরবর্ণের জন্য প্রতিবেশীরা তাঁকে গোরা, গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ বলে সম্বোধন করতেন। পনের-ষোল বছরে বিবাহ হল। পাত্রীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। যৌবনেই তিনি পণ্ডিত বলে গণ্য হয়েছিলেন। শ্রীহট্টে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যখন নবদ্বীপে নেই, তখন স্ত্রীর মৃত্যু হল। আবার বিবাহ হল, পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। সংসার খুব সচ্ছল ছিল তাও নয়। টোলের ছাত্রসংখ্যা সামান্য। অন্নচিন্তা চমৎকারা হয়ে চৈতন্যকে কষ্ট দিলেও সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা পেয়েছিলেন লক্ষ্মী দেবীর প্রয়াণে। মনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক আকৃতি জেগে উঠল। তার্কিক পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের সাধক হয়ে উঠলেন। ভক্তি গানের আসর, সঙ্গীর সংখ্যা বাড়ল। সুলতান হোসেন শাহের অনুগত নবদ্বীপের কাজী প্রথমে চৈতন্যের নগরকীর্তন, ও পরিক্রমণ বন্ধ করলেও হোসেনের নির্দেশেই আবার সব কিছু আগের মত চলতে থাকল। চৈতন্যগোষ্ঠী থেকে সতর্ক হলেন হোসেন শাহ।

এই সঙ্কট মুহূর্তে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ (১৫১০), ভক্তির ভাবস্রোত সহপাঠী ও বন্ধুদের ভক্ত হিসাবে আত্মপ্রকাশের মধ্যে ১৫১০ নাগাদ তিনি সংসার ত্যাগ করলেন, বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় গিয়ে একই সঙ্গে সুলতানের রক্তচক্ষু এড়ালেন। সন্ন্যাসী হলেও নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার মধ্যে এক বাস্তব দূরদর্শিতা লুকিয়ে আছে।

উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম এবং রাজগুরু কাশী মিত্রের আনুকূল্যে সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারপ্রবাহ বেড়ে চলল। দু'বছর ধরে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমাকালে রায় রামানন্দ, পরমানন্দ পুরী তাঁর শিষ্যত্ব নিলেন। আলোয়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ১৫১৪-তে একবার মাতৃদর্শনে এলেন। আবার কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণকালে তপন মিশ্র, রূপ-সনাতন-বল্লভের (জীব গোস্বামীর পিতা) সান্নিধ্য পেলেন। ১৫৩৩-এর ২৯শে জুন পুরীতে তার মৃত্যুর আগে বারো বছর সেখানেই ছিলেন। ইতিমধ্যে গোঁড়া হিন্দুবাদী এবং জগন্নাথের পাণ্ডা সম্প্রদায় তার ধর্মজাতি নিরপেক্ষ মতামতের জন্য শত্রুতা করেন। চৈতন্যের ভক্তিরসের আধিক্য যেমন তাকে পরমভক্তের সম্মান দিয়েছে, তেমনি ভেদাভেদহীন এক সমাজচেতনাকে তিনি ভক্তির আড়ালে লালন করেছেন। বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কাছে তাঁর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর যেমন বন্দনীয়, তেমনি সামাজিক আন্দোলনে তিনি পথিকৃৎ অগ্রণী পুরুষ রূপেই চিরচর্চিত হবেন।

১৪.৪. চৈতন্য-সমকালীন ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্যপ্রেক্ষিত

চৈতন্য যে প্রেমধর্ম বাংলায় প্রচার ও সঞ্চার করেছিলেন, তখন বৈষ্ণব ধর্মমত ভারতবর্ষে নানা ধরনের আকার নিয়েছিল। চৈতন্যের নিজস্ব বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা না থাকলেও পরে তার প্রেরণ বৈষ্ণব ধর্ম গড়ে উঠেছিল। ভারতে তখন বৈষ্ণবতা প্রচারিত ছিল-১. রামানুজের তত্ত্ব ২. মাধবাচার্যের ভক্তিধর্ম ৩. বল্লভাচার্যের মত ৪. নিম্বার্কের ভক্তিবাদ ৫. রামানন্দ স্বামীর রামায়েৎ মতামত।

নিম্বার্ক ছাড়া বাকিরা ছিলেন দক্ষিণাবর্তের মানুষ। আসলে বৈষ্ণব ধর্ম দক্ষিণ ভারত থেকে পশ্চিম ভারত, সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। সুপ্রাচীন আলোয়ার মতে রাগানুগা ভক্তির সাধন ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং নিষ্কাম ভক্তিসাধনা (সুফী) এদেশে হিন্দুসমাজে একটা মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। রামানন্দ, নানক, কবীর, দাদু ইত্যাদি সাধকেরা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের এক মধ্যমপন্থার অনুগামী ছিলেন। এরা জাতিভেদ মানতেন না। এদের ঈশ্বর ছিলেন শান্ত বা দাস্য রসের ভক্তির আকর। সমস্ত মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের ছায়া আছে, আচার অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আচরণে নিষ্ফল, মানুষের কোনো পার্থক্য নেই, মূর্তিপূজা ব্যর্থ-এসবই এরা শিখিয়েছিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরী বাৎসল্যরসের (ঈশ্বরকে সন্তানরূপে দেখা) সাধনা করতেন। অদ্বৈত আচার্য, ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দ, শ্রীবাস এরা মাধবেন্দ্রের পথে বৈষ্ণবতার পূজারী ছিলেন। যবন হরিদাস প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা ছিল। এ ছিল প্রাক্ চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের বীজবপনের ক্ষেত্র।

চৈতন্যের সমকালে লৌকিক, পৌরাণিক বৌদ্ধ দেবদেবীর অর্চনা হত। ধর্মরূপে বুদ্ধের পূজা, নানান তন্ত্রসাধনা, গুরুবাদ প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যও জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের স্পর্শধন্য হয়েছিল। চৈতন্য এই সাহিত্য ভক্তির অভিনব প্রকাশ খুঁজে পেলেন।

চৈতন্যের ভাবনা প্রচারের সঙ্গীদের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। চৈতন্যের অনুসারীদের মধ্যে নৈয়ায়িক তত্ত্বজ্ঞানী বৈদান্তিক রূপ-সনাতনের মতো ইসলামী কেতাদুরস্ত উচ্চপদস্থ দরবারি মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার অন্যদিকে প্রেমধর্ম প্রচারে অনুসঙ্গী ছিলেন বাংলা উৎকলের বিপুল জনগোষ্ঠী। একদিকে ক্ষুরধার তর্কজালে বিরোধীদের হারিয়েছেন অন্যদিকে ঈশ্বর ভক্তির শ্রেষ্ঠ স্তরের সাধনায় জগজনকে মোহিত করেছেন। আবার জাতিভেদহীন-ধর্মনিরপেক্ষ ভক্ত সমাবেশকে গৌড়ীয় ভক্তির আড়ালে সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছিল। এই ত্রিধা সত্তার যেদিকই আমরা আলোচনা করি না কেন, তাতে বাঙালি মানসে নতুন ভাবমূর্তির প্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটেছিল।

১৪.৫. চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি

পূর্ববর্তী উপ-এককে চৈতন্যদেবের সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপট, জীবনালেখ্য পূর্ববর্তী এককে আলোচিত হয়েছে। এবার 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' গৌরাঙ্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে আলোড়ন ঘটেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। চৈতন্যের অনুসরণে বাঙালির মধ্যে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের নাম নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। কৃষ্ণনাম স্মরণ করার, কৃষ্ণকে অবলম্বন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাই বৈষ্ণবদের মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দন এই চারটি

উপায়ে তাঁর ভজনা করার চেষ্টা দেখা যায়। আর সে জন্যে গান বা পদরচনার প্রয়োজন হয়। তাই কৃষ্ণের লীলা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের পদ বা গান রচনার উৎসাহ দেখা দিল। বৈষ্ণবদের মধ্যে শুধু রাধাকৃষ্ণ লীলা নয়, গৌরাঙ্গকে নিয়েও পদরচনা শুরু হল। শুরু হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা। আর পালা-গানের শুরুতে গাইবার জন্য পালা-অনুযায়ী 'গৌরচন্দ্রিকা' পদ রচনা হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'চরিতসাহিত্য' রচনার সূত্রপাত। কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন অবলম্বন করে চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি জীবনী সাহিত্য রচনা হল। সমগ্র বঙ্গদেশ ও বহির্বঙ্গে বৈষ্ণবদের মহোৎসব শুরু হল-সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সামাজিক সাম্য নিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলী গানের জন্য চারটি ঘরানার সৃষ্টি হল। বর্তমান আলোচনায় সে-সবের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

গাইবার জন্য পদরচনা, বিভিন্ন পর্যায়গান লেখার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে আরেকটি নতুন ভাবনা হল, তা হল চৈতন্যের জীবনচরিত রচনা। মানুষের জীবন নিয়ে এই প্রথম লেখকেরা চরিত সাহিত্য রচনা করলেন। তার অনেকটা যেমন সাধুসন্ত মহাপুরুষদের অলৌকিক আখ্যান, বাকিটা বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রবেশিকা Srudiments of Vaishanav Theology) এবং সাধারণ মানুষের অনুভবী (sensitive) জীবনমালা। এখানে পুরাণ, দর্শন, ভাগবত এমনকি বৈদিক সাহিত্যের সমর্থন বারবার নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতের জন্য সংস্কৃত শ্লোক যুক্ত হয়েছে। কখনও আবার পাঠক বা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য তত্ত্বের নীরসতাকে ছাপিয়ে সংলাপ, প্রবাদ, বিশিষ্টাতিক বাক্যাংশ, নাটকীয়তা এসেছে। চৈতন্যের কয়েকটি বাংলা জীবনী ভক্তের, তত্ত্বজ্ঞের অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠেছে-যেমন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। কোথাও আছে জীবনকে তত্ত্বের আলোয় দেখা, কোথাও আছে ব্যক্তি জীবনের উচ্চাবচতার হৃদয়গ্রাহিতা, কোথাও ইতিহাসের নামে গালগল্পের জনপ্রসিদ্ধির ব্যাপকতা। সবসময় যে চৈতন্যজীবন প্রথম থেকে শেষ অবধি একমুখীন হয়েছে, তাও নয়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনের একাংশ লিখেছেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনকে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রেমের অচিন্তাপূর্ব প্রকাশ বলে দেখেছেন। অনেকে চৈতন্যমৃত্যু নিয়ে ভাবিত হয়ে আঘাতজনিত রোগভোগ দেখিয়ে একটা সমাপ্তি টেনেছেন। অর্থাৎ চরিতগুলিও একটি বিশেষ ধাঁচে লেখা নয়। সেখানে ব্যক্তিমানুষের প্রতি যেমন আগ্রহ আছে, তেমনি জীবন থেকে তত্ত্বে পৌঁছনোর একটা আকৃতি আছে।

যা হোক এভাবে আমরা একই সঙ্গে সন্তজীবনী (hagiography) এবং জীবনীসাহিত্য (biography) পেলাম। এগুলি আলাদা বইয়ের স্বাদ জাগায় না। এদের একত্র পাঠ (collective reading করা প্রয়োজন। হয়তো লেখকদেরও এরকম মানসিকতা ছিল। আবার এখানে একটা কালান্তর (time-gap) আছে। ফলে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যকে একটা ক্যালিডোস্কোপের মতো, বর্ণালী স্রোতের নানান সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের মতো দেখতে হবে। এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা না বিচার করে প্রত্যেকটি একে অন্যের পরিপূরক বলে ভাবতে হবে। তাহলে লেখকদের অভিপ্রায় (intention) স্পষ্ট হতে পারে।

কীর্তনগান বাংলায় ছিল না তার আগে এটা সত্যি নয়। বরং কীর্তনকে যদি সম্মেলক সংগীত (mass singing form) রূপে দেখি তাহলে সুবিধা হতে পারে। চৈতন্য এই গানে যেমন মানুষের মুখের মিছিল

গড়েছিলেন, তেমনি ভক্তির জাতপাতহীন নবীন বৈষ্ণবতার (neo Vaishninsm) সঞ্চারিত করেছিলেন। আবার চৈতন্যের চলে যাওয়ার বহু পরে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব ধর্মসম্মেলন হল, সেখানে কীর্তন গানের পত্রপল্লব নতুনভাবে উদ্দীপিত হল।

একটি মানুষ যিনি জীবদ্দশায় মহামানব রূপে ('সচল জগন্নাথ') বন্দিত হয়েছেন, তিনি একাই জনমানস ও সংস্কৃতিকে একটা মোচড়ে (twist) যুগোত্তীর্ণ করে ফেললেন। ফলে চৈতন্য এখনও সমানে আলোচিত, তর্কের কেন্দ্র বিন্দু। দু'চোখে যদি ভক্তির ধারা বয়, তাহলে তিনি রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় রূপ, আর চোখে যদি যুক্তির আলো জ্বলে তাহলে তাকে বলতে হয় মানববাদী প্রতিবাদী এক প্রবল সত্তারূপে।

চৈতন্য ব্রহ্মবাদে আস্থা না রেখে ঈশ্বরকে ছটি ঐশ্বর্যের (ষড়ৈশ্বর্যময়) আকর মনে করেছেন। তিনি যেহেতু সচ্চিদানন্দ, তাই সংবিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী-এই তার ত্রিধা শক্তি।

আমাদের দেশে অসামান্য ভক্তকে অবতার বলে গণ্য করা হয়। চৈতন্য পার্ষদ (বয়ক্রম বেশি হলেও) নিত্যানন্দ হলেন বলরামের একালীক অবতার, অদ্বৈত আচার্য বিষ্ণু-মহাদেবের অবতার। চৈতন্যকে ভগবান বলে অনেক ভক্ত একত্র হলেও তার বিরোধী কম ছিল না। বাংলা তখন সুলতানদের অধিকারে। চৈতন্য যে বাংলা ছোড়ে সামান্য ভারত পরিক্রমা শেষে পুরীতে আশ্রয় নিলেন (যা আগে উল্লিখিত) বিরোধিতার প্রাবল্যের জন্য। উড়িষ্যা তখনও হিন্দুরাজ্য। জগন্নাথ দেবের মন্দির। বৈষ্ণবাদের নানান মঠ ও আখড়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল। আচার একই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র থাকবে। এই রণকৌশল বৈষ্ণবতার জন্য তিনি নিয়েছিলেন। আবার আরেকটি চৈতন্যকৌশল হল অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে বাংলায় প্রচারের জন্য রেখে যাওয়া। নিত্যানন্দ তাঁর কাছে থাকার বারবার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। কেননা গুরু শিষ্য ঘনিষ্ঠতার চেয়ে বৈষ্ণব অঙ্গনে জনতার মেলা হবে এটাই চৈতন্য চাইতেন।

রায় রামানন্দ-চৈতন্যের সাক্ষাৎকার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটাল। নবদ্বীপ লীলায় তিনি কৃষ্ণভাবে বিভোর হতেন রামানন্দী রাগানুগা ভক্তি মার্গের সাঙ্গে পরিচিত হলে তিনি রাধাভাবে দীক্ষিত হলেন। এভাবে চৈতন্যের সাধনার একটা পরিপূর্ণতা ঘটল। সারা উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এভাবে সম্প্রসারিত হল।

সম্রাট সিকান্দার লোদীর নির্যাতনে মথুরায় তীর্থযাত্রা বন্ধ ছিল। বৃন্দাবন ধ্বংসোম্মুখ হয়েছিল। চৈতন্যদেব এই লুপ্ত তীর্থ (lost religious place) পুনরাবিষ্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভূগর্ভ, লোকনাথ স্বামীকে, পরে রূপ-সনাতনকে পাঠান। এরা বৃন্দাবনকে বৈষ্ণবতীর্থে আবার রূপান্তরিত করলেন। বাংলার প্রেমধর্ম ও সংস্কৃতি এভাবে উত্তর ভারতে সম্প্রসারিত হল।

আসামে শঙ্করদের ও মাধবদের বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন, মণিপুরে ধর্ম ও সংস্কৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ব ভারতের বাকি জায়গাতেও চৈতন্য দ্বারা প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারিত হল। এক গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন।

গড়ে উঠল পদাবলী সাহিত্য। চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা এই দুভাগে বিভক্ত হলেও আসলে এগুলি পরস্পরের সম্পূরক (complementary)। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নরহরি, নরোত্তম, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বৃন্দাবন দাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, উদ্দব দাস, যদুনন্দন, রায়শেখর, কবিরঞ্জন এরা বিচিত্র পদাবলী উপহার দিয়েছেন। সেই রসধারা এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

চৈতন্য প্রভাবে এদেশে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য কমে। ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধেয় ছিলেন, বৈষ্ণবরাও শ্রদ্ধেয় হলেন। বৈষ্ণবসেবা গৃহীদের মহৎ কর্ম বলে বিবেচিত হত। হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রকে ব্রাহ্মাণেরা ভক্তি করলেন। ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তেরা গুরুর মর্যাদাও পেতে লাগলেন। উঁচুজাতের লোকেরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। দেশে জাতপাতের তীব্রতা কমল। অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের লোকও মানুষ বলে গণ্য হল। নগর সংকীর্তন এই কাজে সাহায্য করেছিল। চৈতন্যের শিক্ষাস্টকের (eight commandments) একটি 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ'।

অনেকে চৈতন্যের সত্তায় ভগবত্তা আরোপ করলেও মানবিকতা তাঁর জীবনে ওতপ্রোত হয়েছিল। প্রথমে জীবনে তার রহস্যপ্রিয়তা, তার্কিকতা এবং কলহপ্রিয়তা সহপাঠীরা উল্লেখ করেছেন। নিজে শ্রীহট্টের লোক হলেও তাদের ভাষা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতেন। দিগ্বিজয়কে হারানোর পর তার জীবনে অর্থ খ্যাতির বন্যা বয়েছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন রেখে চলে গিয়েছিলেন, তা নয়। বরং নিজের চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখানোর পর যখন স্ত্রীকে বোঝানো যায়নি, তখন তিনি 'কোলে করি করিলা প্রসাদ'। এই শেষ সাক্ষাৎকার। বিদায় অনিবার্য ধরে নিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার চৈতন্যের আদরের সুখস্মৃতি তার বহু সাধনার ধন হয়ে রইল।

চৈতন্যের মানবিকতার আরেকটি দিক হল স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন তিনি ঈশ্বরোন্মাদ নন) কাউকে প্রণাম করতে না দেওয়া। অদ্বৈত একবার গুরুজন হয়েও প্রণাম করাতে তিনি নিজে তার চরণ নিজের মাথায় নিলেন। এখানে ঈশ্বরত্ব নয়, মানবিক আচরণই বড়ো।

চৈতন্যচরিত্রে যে দৃঢ়তা দেখি, তা মানসিকতারই নমুনা। গোবিন্দ ঘোষকে হরিতকি সঞ্চয়ের জন্য ভৎর্সনা ও পরিত্যাগ, কাজির বাড়িতে ভক্তসহ অভিযান, জগাই মাধাইয়ের চিত্ত পরিবর্তন, মাধবীর কাছে ভিক্ষান্ন নেওয়ার জন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি না হওয়া-তার মানবিক পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছে। চৈতন্যের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি মানবিকতার মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল।

সমস্ত দেশে মহাপুরুষজীবনী লিখলে ভক্ত লেখক পাঠকদের জন্য কিছু অলৌকিক আখ্যান যোগ করেন। এদের মধ্যে ভক্তি আবার বিশ্বাসও ছিল। ফলে চৈতন্যচরিতে অলৌকিকতা কতটা কাব্যপ্রণোদিত, তা বিচার করা এতদিন পরে কঠিন। আমরা ভুলে যাই যে চৈতন্যচরিত কোনো ঐতিহাসিকের লেখা নয়, কবির রচনা। কাব্যে অনেকসময় বাস্তব জীবনেও অবাস্তবতা, মানুষ জীবন্ত দেবতায় পরিণত হয়। আমরা যদি একালে ভক্তিহীনতার উষর বালুভূমিতে এদের না মেনে নিই, তাহলে কিই বা করার আছে তাকে শুধু কাব্য অলংকার বলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া। মনে পড়ে শেক্সপীয়রের সেই হ্যামলেটীয় উক্তি, "There are more things– Horatio– than are reported in your papers."

১৪.৬. বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব

আমরা এর আগে একটা চৈতন্যসংস্কৃতির সার্বিক পরিচয় দিয়েছি। তবু ঐ সংস্কৃতির অনুদর্শন (microfindings or philosophy) বোঝার দরকার আছে। তাই এই আলোচনা শুরু করছি।

বৈষ্ণব মত মানুষের সংকীর্ণ মনোভাব ও নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে অনেকটাই দূর করেছিল। ফলে বৈষ্ণবমতের উদারতা ও মানবিকতা দেবী সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্যেও প্রসারিত হয়। মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দেখা কিংবা জীবে ব্রহ্মের অনুভূতি; যুগের আদর্শ (ideal of the age) হয়েছিল। আজকে উনিশ শতককে বলি পুনরুজ্জীবনের (renaissance) যুগ। সেই পুনর্জীবন চৈতন্যোত্তর সময়েও ঘটেছিল। কিন্তু তা মধ্যযুগে বলে তাকে সমূহ শ্রদ্ধা করি না।

অসংখ্য কবি সৃজনশীলভাবে অজস্র রচনাস্রোতে বাংলা ষোড়শ শতককে মধ্যযুগের মধ্যমণি করে তুলেছিলেন। ভাব, ভাষা, রূপ, চিত্রল উপমায় এই শতকে সাহিত্য নবরূপ লাভ করেছিল।

এই বাঙালির পুনর্জীবন বা পুনর্জাগরণ চৈতন্যেরই দান। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এসে অবৈষ্ণবেরা নিজেদের চৈতন্যবাদে সমর্পিত করল। যোগাচারী বৌদ্ধরা রাধাকৃষ্ণের লীলাবাদকে মেনে নিয়ে নতুন সহজিয়া বৈষ্ণবতা সৃষ্টি করল। শাক্ত সমাজেও দেবীর বাৎসল্য ও করুণাঘন রূপের প্রাধান্য দেখলাম। শৈবসম্প্রদায়ে উদাসীন শিবের জনপ্রিয়তা দেখা দিল এবং তন্ত্রাচারে কঠিনতা ছাড়িয়ে প্রেমরসের প্রভাব পড়ল।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর যারা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কলম ধরেছিলেন, তাদের অধিকাংশই সুলতান বা সামন্তের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিক হল বাংলায় ব্রাহ্মন্মণ্য ধর্ম ও সমাজে সংস্কার (reform) প্রয়াস চলল। হিন্দুদের মনে নবজীবনে জাগোর মন্ত্র উদ্ভাসিত হল।

তৃতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হল উত্তর ভারতের সন্ত ধর্মের (saint religion) অনুসরণে সূফী প্রভাব, দক্ষিণ ভারতীয় অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের সূত্রে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত্যবাদ ও প্রেমবাদ। চৈতন্যের ব্যক্তিমনীষার ফসল এই নবীন অধ্যাত্মবাদ (Neospiritualism) হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন নয়।

চৈতন্যের নেতৃত্বে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, তা স্মৃতি-শাস্ত্রের সীমানা ছাড়ানো। এছাড়া মানুষ দেখেছিল আজ যে ক্রীতদাস, কাল সে বাদশাহ। সামান্যের (general) অসামান্যে (special status) উত্তরণের এই চিত্র জনমনে একটা অন্য ধরনের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার (stamp of individuality or rise of individua) সফলতার চিহ্ন ছড়িয়েছিল। মানুষের এই আত্মপ্রসারণ (expansion of self identity) তাঁকে সামাজিক বন্ধন মুক্ত করার জন্য প্রয়াসী করল। ব্রাহ্মণদের বাঁধন যতই শক্ত হল, তবু বিধির বিধান ছিঁড়বার আকুলতা গভীর হয়ে উঠল।

বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচারে ইসলামী রীতিনীতির অনুসরণ রয়েছে। এ কথা আমরা আগে ভাবি নি কারণ আমাদের ইতিহাস জ্ঞান ও সংস্কৃতির মিশ্রণবোধ প্রায় শূন্যাকার ধারণ করেছে। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলিকে স্বভাবত স্বতন্ত্র দেখানো হয়েছে, বিজাতীয় কোনো প্রভাব স্বীকার এখনও অবধি স্বীকার করার দুঃসাহস আমরা দেখাই নি বাঙালিসুলভ নম্র দৃঢ়তায়।

চৈতন্যের আগেই ভক্তিবাদ বাংলায় প্রচারিত ছিল। বাঙালিরা সকলেই বৈষ্ণব হয়ে গেলেন, এমন কথা বলি না। কিন্তু বাঙালি সুস্থতার একটা আস্বাদ পেল চৈতন্যদর্শনে। কিন্তু চিরদিন কবহু একছ ন জীবয়ে অর্থাৎ চিরকাল একই থাকে না।

১৪.৭. চৈতন্যের উত্তরাধিকার পর্ব

সপ্তদশ শতক থেকে বৈষ্ণবীয় উদারতা সংকীর্ণতায় পরিণত হল। গোষ্ঠী বিভাজন দেখা দিল। সময়, শক্তি এবং মনন অপচিত (digressed) হল। এক আন্ত সাম্প্রদায়িক বোধ এই আন্দোলনকে ক্ষয় করল (inter group rivalry)।

সপ্তদশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসও দ্বন্দুময় ছিল। অন্যদিকে সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রেমভাবনা, রসপর্যায়, কীর্তনগান, কাব্যপাঠ যে নবীনতার দ্যোতনা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল, সেখানে অনুসরণ, অলঙ্কৃতির বিষয়তা (disproportionates rhetorical sense), ছন্দের চাকচিক্য এবং নিষ্প্রাণতা সাহিত্যকে বিবর্ণ করে দিল। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানে, চণ্ডীদাসের কাব্যেও যৌনতা ছিল। কিন্তু এই সময় বিশেষ করে সপ্তদশের শেষের দিকে নিছক যৌনমিলন এবং তার উপযোগী ইতর ভাষার সংমিশ্রণ পদাবলীকে উত্তেজক রচনা (pornography) করে তুলল। ভাবমোক্ষণ (cathersis) তো দূরের কথা, সাধারণ মাধুর্য, প্রেমের অপার মহিমা, পবিত্রতা ধরার ধূলোয় হারিয়ে গেল। বৈষ্ণবের ভক্তিহীনতা, নিষ্ঠাহীনতা, তত্ত্বহীনতা প্রকট হয়ে উঠল।

মঠ-মন্দিরে বৈষ্ণবীদের থাকার অনুমতি দেওয়া হল। ফলে একটা বড়সড়ো বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী। গড়ে না উঠে কামকলা বিলাসের আখড়ায় তা পর্যবসিত হল। গুরুবাদের নামে, সাধনার নামে নারীশোষণের এক কদর্য অধ্যায় দেখা দিল। বৌদ্ধ প্রভাবে মস্তক মুণ্ডিত বলে এদের অনেকে 'নেড়া-নেড়ী' বলে অভিহিত হতেন। এই বিশেষণে যতটা না শ্রদ্ধা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সামাজিক ভ্রূকুটি, বিদ্রূপ। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা তন্ত্রনির্ভর দেহসাধনার মতো এক উচ্ছৃঙ্খল ধর্মীয় আবহাওয়া তৈরি করছিল। আবার মঠ-মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে নানান সংঘাত গড়ে উঠেছিল। এমনকি বৈষ্ণব মঠাধ্যক্ষ কে হবেন, এ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতা চলত। সাধিকারা ছিলেন মহান্তের লালসার সেবাদাসী। এভাবে ধর্ম ও প্রচারের আড়ালে বৈষ্ণবতার এক অধঃপতনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। আসলে বাঙালি জীবনে যে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা বহমান ছিল, তা বৈষ্ণব মানবধর্মকেও নারকীয় করে তুলেছিল। ব্যক্তিজীবনে লোভ, লালসা, টাকা জোগাড়, নব্য ধনী ও বানিয়াদের অত্যাচার গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই সমাজের বাঁধন, ব্যক্তি জীবনের চর্যা শিথিল হওয়াতে বিগত শতকের প্রেমধর্ম সমালোচনার মুখে দাঁড়াল। ফলে শাক্ততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ তাদের হারানো বৈভব ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই চালাল। বৈষ্ণবতা বিলুপ্ত হল না। কিন্তু উদার মানবতার যে পাঠ চৈতন্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন, তার চর্যা আচরণ বন্ধ হতে থাকল। বিস্ময়কর প্রেমধর্মের উত্থান ও বিস্তার, মর্মান্তিক তার ছিন্নভিন্ন হওয়ার সুর।

১৪.৮. সারাংশ

চৈতন্যজীবন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এক নবচেতনা এনেছিল। আমরা জানি মধ্যযুগের বহমান কাব্যধারা হল সমষ্টির প্রয়াস। সাহিত্য শিল্প এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রে চৈতন্য-পূর্বকালে ছিল সমাজ, গোষ্ঠীচেতনা, কৌম যোগাযোগ। মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহকে যদি কেউ বলেন সামাজিক মানুষের জীবন উন্মোচনের

(manifestation of life) কাব্যিক প্রয়াস, তাহলে চৈতন্য সেখানে সমাজের বদলে সাহিত্য সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র (epicentre) রূপে পরিগণিত হলো। একশ বছর ধরে ব্যক্তি চৈতন্য তার জীবনযাপন এবং কর্মাকর্ম সামাজিক সাহিত্যকে (social literature) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় (individuality) অধিষ্ঠিত করল।

তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায় স্তরবিভাগ করে সরাসরি কাব্যরূপ পেল। সেখানে অনেক সময় তিনি কৃষ্ণ-রাধা জীবনের প্রতি তুলনায় উপস্থাপিত। এই জীবন সাধারণ মানুষের হলেও তাতে অসাধারণতা সঞ্চারিত হল। ব্যক্তিজীবন সাহিত্যের একটা মোড় ফেরাল। বিষয়ভোগী স্থূল মানুষ যাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবৈধতার চোখে না দেখে, কাম ও প্রেমের সুক্ষ্ম পার্থক্য পদাবলী এবং বৈষ্ণবশাস্তে নবায়িত (renewed) হল। লেখা হল গৌরচন্দ্রিকা এবং গৌরপদাবলী। প্রথমটি রাধাকৃষ্ণ লীলার ঐশ্বরিকতা (divinity) উপলব্ধি করার জন্য, মনকে পবিত্র ও পরিষ্কৃত করার জন্য ব্যক্তি ভক্তের জীবন আখ্যানের ব্যবহার।

১৪.৯. অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

- চৈতন্যকে এই এককের ভূমিকায় কিভাবে দেখতে চাওয়া হয়েছে, সেই ধারণাটি বিশদ করুন।
- চৈতন্যজীবনকথার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি বর্ণনা করুন।
- চৈতন্যের প্রভাব বাংলা সংস্কৃতিকে কিভাবে পরিবর্তিত করেছিল, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- চৈতন্যের জীবনী সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।
- পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যে চৈতন্যের প্রভাবে কি ঘটেছিল, তা বিশদ করুন।
- সমাজে চৈতন্য জীবনাচরণ কোন কোন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, মানুষের কাছে, তা বিশ্লেষণ করুন।
- চৈতন্যের আদর্শ প্রচারে যেসব ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের নামোল্লেখ করে চৈতন্যের উড়িষ্যা যাত্রার মূল কারণটি চিহ্নিত করুন।
- চৈতন্যের উত্তরকালে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির কি রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, তা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

- চৈতন্যের সমকালে ভারতে কটি বৈষ্ণবীয় ধারা প্রচলিত ছিল? তাদের উল্লেখ করুন।
- গৌরচন্দ্রিকা বলতে কী বোঝায়?
- চৈতন্য জীবনী কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।
- কোন সুলতানের সময় মথুরায় তীর্থযাত্রা বন্ধ ছিল?
- মঠ মন্দিরে বৈষ্ণবীদের থাকায় কী ঘটেছিল।

একক ১৫ ❐ সুফি প্রভাব ও ইসলামি উপাদান

১৫.১. উদ্দেশ্য
১৫.২. প্রস্তাবনা
১৫.৩. বাঙালির সংস্কৃতি: তুর্কি আক্রমণোত্তর পর্ব
১৫.৪. সারাংশ
১৫.৫. বাঙালির সংস্কৃতি: সুফি প্রভাব
১৫.৬. সারাংশ
১৫.৭. অনুশীলনী

১৫.১. উদ্দেশ্য

এই এককে আপনি তুর্কি বিজয়ের পর বাঙালি-সংস্কৃতিতে ইসলাম ধর্মের যে প্রভাব পড়েছিল, তার সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। এর পরিণতিতে, বাঙালির জীবনবোধ ও তার সংস্কৃতিতে যে সমস্ত উপাদান যুক্ত হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এককটি পাঠ করে আপনি ইসলামি প্রভাবজাত সুফি সংস্কৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেমন জানবেন, তেমনি এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণাও আপনার জন্মাবে।

১৫.২. প্রস্তাবনা

তুর্কি বিজয়ের পর এ দেশে বসবাসকারী তুর্কিরা দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, এ দেশের ধর্মদর্শন ও লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাবে এবং শরিয়তী বন্ধন অনেকটা শিথিল হওয়ায় ক্রমশ বাঙালি হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ক্রমশ সুফি ধর্মমত প্রচারক সাধু, ফকির, দরবেশদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে মরমীয়ার অনুভব থাকায় সুফি প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হিন্দুর সংহতির কাছে বাধা পায় শরিয়তী শক্তি। তাই বাংলার সংস্কৃতিতে শরিয়তী উপাদান নয়, সুফি প্রভাব ব্যাপক ভাবেই আছে। বর্তমান একক এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছে। পাশাপাশি, মধ্যযুগে নানা ইসলামি সাংস্কৃতিক উপাদান বাঙালি-সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

১৫.৩. বাঙালির সংস্কৃতি: তুর্কি আক্রমণোত্তর পর্ব

এই এককে আমাদের মুখ্য অবলম্বন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে তিনি হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিকে একাধিক পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। সেখানে মধ্যযুগের ইসলামি সংস্কৃতি আলোচনা সূত্রে তুর্কি

আক্রমণোত্তর-পর্বের কথা বলতে গিয়ে সুনীতিকুমার তুর্কি আক্রমণ/বিজয় ও তার পরবর্তীকালের কথা বলেছেন। এর তিনটি পর্ব-

ক) অভিঘাতের পর্ব: এই সময়ে তুর্কি আক্রমণে বাঙালি তার সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও চরিত্র থেকে বিচ্যুত ও বিপর্যস্ত। তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধ তাদের পক্ষে তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। ফলে বৈতসী বৃত্তিগ্রহণ ও অস্তিত্ব রক্ষণ। এই পর্বে খিলজী শাসকেরা মুসলিম আক্রমণকারীদের ধারা অনুসরণ করে বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও বোধ করেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ওপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পীড়নও অস্বীকার করা যায় না। বখতিয়ারের পরে আলি মর্দান স্বৈরতন্ত্রী শাসকরূপে খিলজী আমীর ও হিন্দু প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালান। ফলে দুটি বিপ্রতীপ মেরু নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হয়।

খ) সম্মিলনের প্রথম ইঙ্গিত: তুর্কি আমলের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মিলনের ইঙ্গিত দেখা দেয়। কারণ আইয়াজ খিলজীর সময়ে মোগল-অত্যাচারে অতিষ্ঠ মধ্য এশিয়ার গুণী-জ্ঞানী সুফি-সন্তের দল বাংলায় চলে আসেন। আইয়াজ খিলজীর ওপর প্রজা-সমর্থন ও প্রজাদের ভালবাসা থাকায় দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সন্ধি-ভাঙ্গার সাহস তিনি দেখান। ফলে, স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা হয়। এই সময়ে ও পরবর্তীকালে ইসলামি শাসকেরা ক্রমশ বাঙালি সমাজ ও জীবনের সঙ্গে নিজেরা মিলেমিশে যেতে থাকেন, এমনকী বাঙালি রমণী বিবাহও করেন, তাদের সন্তানেরাও বাংলাভাষী হয়ে ওঠে। ফলে এক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত রূপ নিয়ে বাঙালি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

গ) সম্মিলনের পর্ব: একদিকে বাঙালির মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির মিলন, তার সঙ্গে বাংলার আদি অস্ট্রিক দ্রাবিড় সংস্কৃতির ও গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। ফলে এই পর্বে বাঙালির সংস্কৃতির ক্ষেত্র উর্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে যখন বিজয়ীর মনোভাব দূর হতে শুরু করে যখন বিজেতা ও বিজিত পরস্পরের প্রয়োজন বোঝে, তখনই তাদের মধ্যে মিলন সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তখনই ভাষা ও সংস্কৃতি ক্রমশ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকরে। রচিত হয় সাহিত্য, তবে সংস্কৃতে নয়, তুর্কিতে নয়, বাংলায়। সম্ভবত এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি করেই দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।..... গৌড়েশ্বরগণের উৎসাহই বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ'। এছাড়াও প্রধানত মুসলিম রাজদরবারকে অবলম্বন করেই হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণী জন্ম নিয়েছিল। লক্ষণীয়, তুর্কি আক্রমণ ও বিজয়পর্বে বাঙালির কাব্যানুশীলন বন্ধ হয়ে যায় নি। এই যুগে অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম বিষয়ক রচনা যেমন পাওয়া যায়, সদুক্তিকর্ণামৃত গাহাসত্তসঈ প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড কবিতার সংকলন এবং গীতিগোবিন্দের অনুসরণে রচিত সংস্কৃত কাব্যও তেমনি পাওয়া যায়।

সুলতানি আমলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়-

(ক) স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের নামকরণ হয় 'বাঙ্গালা' এবং অধিবাসীরা 'বাঙ্গালী' পরিচয় লাভ করে। এর ফলে বাঙালি জাতিরূপে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

(খ) এই সময়েই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়, সুলতানেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধর্মের সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

(গ) বহিরাগত হলেও বাংলায় স্বাধীন সুলতানেরা বাংলাদেশকে স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। তাই রাজনৈতিক কারণ হোক বা না হোক, এদেশের মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁদের কাম্য ছিল; এই জন্যই তাঁরা হয়তো বাংলা সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিতেন। জাতিগত চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম যে ভাষা ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতি এই সত্যটি তাঁরা জানতেন বা বুঝেছিলেন।

(ঘ) নানান মত দর্শন ও ধর্ম-বিশ্বাসের সংমিশ্রণজাত সুফিবাদে বিশ্বাসী ধর্ম-প্রচারকেরা এদেশে সমাদর পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা দেবমূর্তি ও মন্দির ভাঙার কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও, সম্মিলনের তুলনায় সেই সব ধ্বংসের পরিমাণ অনেক কম। বরং পীর-ফকির-দরবেশ-আউলিয়া প্রভৃতির প্রচারে কেরামতিতে চমৎকৃত ও মোহগ্রস্ত সাধারণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ধর্মীয়দের প্রতি বিরূপতা থেকেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এই মুসলমান ধর্মের মধ্যে শরিয়তী-কাঠিন্য ও রক্তচক্ষু ছিল না, বরং সুফি প্রভাবিত হওয়ায় তা অনেকটা উদার ছিল।

(ঙ) স্বাধীন সুলতানি আমলেই চৈতন্যের মত সংস্কারক প্রেম-ভক্তিবাদী আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত লোকধর্ম প্রচার করার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথাশ্রিত বিভেদ বৈষম্য সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। ঈশ্বরের বিচারে সব মানুষের মর্যাদা সমান-এই ধারণা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য চৈতন্য-মতবাদের পাশাপাশি সুফি সাধকেরাও প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ফলে সম্মিলনের অবকাশ আরো ভালোভাবে সুচিত হয়েছিল সুলতানি আমলে। 'জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন: তবাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজম-উ-ল্-বহ্‌রৈন' অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।ত 'মজম-উ-ল্-বহরৈন'-নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন দারা শিকো। তাতে ছিল হিন্দু মুসলিম সম্মিলনের কথা।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই সুনীতিকুমার অবশ্য এই সুলতানি পর্বের মধ্যে রাজা কংসনারায়ণ বা দনুজমর্দন দেবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন-বাঙালির মধ্যে স্বাধীন জাতি সত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের প্রবণতা দেখা যায় তাঁদের সময়েই এবং তাঁদের কারোর পৃষ্ঠপোষকতাতেই কৃত্তিবাস তাঁর অনুবাদকাব্য রচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই এখন একমত যে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর আর যিনিই হোন না কেন, তিনি তাহিরপুরের বড় জমিদার রাজা কংসনারায়ণ নন বা দনুজমর্দনদেবও নন। ১৯৭৬-এ এ বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সিদ্ধান্ত: রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র অন্তরে হিন্দু ঐতিহ্যের অধিকারী কিন্তু বিধর্মী গৌড়-অধিপতি জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহই কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর; তাঁরই রাজ্যলাভের (১৪১৮ খ্রিঃ) দু-চার বছরের মধ্যেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ নিষ্পন্ন হয়।

সুলতানি পর্বে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার আরেকটি ধারণা ব্যক্ত করেছেন। তা হল ব্রাহ্মণ্য ও তার অনুগামীদের নব উৎসাহে বেদ উপনিষৎ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দুধর্মের প্রচার এবং সংস্কৃত-প্রীতির পরিবর্তে লোকভাষা বাংলায় জনসাধারণের কাছে

ও মুসলমান ধর্মের মানুষের সমক্ষে হিন্দু সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস প্রাচীন উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ-আদর্শ প্রচারের চেষ্টা এবং অভিপ্রায়। এমন চেষ্টা ও অভিপ্রায়ের কারণ বিদেশী শাসকের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সহজবোধ্য ধর্ম এসে গ্রামের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। এই অবস্থা দেখে যে হিন্দু ব্রাহ্মা বা বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা এতদিন আভিজাত্যের শিক্ষার গর্বে দেশের জনসাধারণের কথা ভাবেননি, তাঁরা সজাগ হয়েছিলেন।

কংসনারায়ণ বা দমনুজমর্দনদেবকে নিয়ে বা কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরকে নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, যা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তা হল এই যে বাঙালির মধ্যে কর্ম-চেষ্টা এবং জাতীয় সাহিত্যের প্রচার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে একই সঙ্গে চলছিল। আবার বাংলার স্থানীয় পুরাণকথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিখিত হয়নি বলেই ভারতের অন্যান্য অংশে গৃহীত হতে পারেনি, সেগুলিও মঙ্গলকাব্যাকারে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত হল; তাদের দেওয়া হল জাতীয় সাহিত্যের তথা সংস্কৃত পুরাণের মত আকার; মঙ্গল-কাব্যগুলি যে বাংলার লৌকিক পুরাণ-এ নিয়ে বিতর্ক খুব প্রবল ও ব্যাপক নয়।

এইভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ন ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যানের সঙ্গে বেহুলা-লখিন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন, গোপীচাঁদের কথা বহুল-প্রচারিত হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলার সংস্কৃতির ত্রয়ী অবলম্বনের দিগদর্শনীতে 'বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি' বলে যে সব সাহিত্য-নিদর্শনকে নির্দিষ্ট করেছেন তাতে রামায়ণ মহাভারতের বাংলা রূপ, শাক্ত শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান- বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরার ও ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন কথার উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যেই বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে।

তুর্কি বিজয়ের পরে বহির্বঙ্গে মিথিলায় ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য বাঙালি গমন করলে বাঙালি ছাত্রদের মাধ্যমে মিথিলা থেকে সেই সব শাস্ত্রস্ত এবং বিশেষভাবে বিদ্যাপতি ঠাকুরের গান বাংলায় এসেছিল। অর্থাৎ বাংলায় আবার নতুনভাবে জ্ঞানচর্চার সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। 'এইভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটি দিকই ইহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন।'। সংস্কৃত আশ্রয় করে চলল বাঙালির মনন-চর্চা এবং কাব্য-কবিতার মাধ্যমে চলল বাঙালির হৃদয়ভাবের চর্চা। এই দুটি দিকই প্রবল ও পরিপুষ্ট হয় চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করেই।

চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করেই বাংলার নিজস্ব কীর্তন-সংগীতের প্রতিষ্ঠা, পদাবলির বিস্তার, চৈতন্য-দর্শননির্ভর চরিতসাহিত্য-কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত এবং বিভিন্ন সংস্কৃত জীবনী-গ্রন্থ দর্শন ও তত্ত্বগ্রন্থ ইত্যাদির বিস্তার। চৈতন্যদেবই ঘরমুখো বাঙালিকে বাইরের আলো বাঁশবাগানের অন্ধকারের ওপারের জগতে পৌঁছে দিলেন। সুনীতিকুমার জানিয়েছেন 'ঘরমুখো বাঙালি পুরী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর এবং আরো পশ্চিমে যাত্রা করেছিল' এবং এইভাবে 'ষোড়শ সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল'। ফলে গ্রাম-জীবন ও সংস্কৃতিকে নিয়ে যে বাঙালি-সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করেছিল, তা ক্রমশ প্রাচীন ভারতের মতই গ্রাম ও নগরকে নির্ভর করে আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকাশ শুরু করেছিল। বাংলায় নগরের প্রাধান্য ছিল না। প্রাক্-চৈতন্যযুগে নগর আসলে বড় এবং বহু গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তখন নগর বলতে ছিল নবদ্বীপ। বাংলাদেশের নগর জীবন ছিল গ্রাম-জীবনেরই বিস্তৃত সংস্করণ। কিন্তু পর-চৈতন্য ও চৈতন্য-পর্বে লক্ষণাবতী আর বিষ্ণুপুর নগর-সভ্যতার প্রতিভূ হয়ে

উঠেছিল। সুনীতিকুমার ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধির ও বড় হয়ে ওঠার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। এক ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতের পূর্ব-উপকূলের সংযোগ-পথে বিষ্ণুপুরের অবস্থান; দুই-বিষ্ণুপুর ও নবদ্বীপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

সুনীতিকুমার দিগ্‌দর্শনীতে যেমন বিষ্ণুপুরের রেশমশিল্পের কথা বলেছেন, তেমনি পিতল-কাঁসার বাসনের কথাও জানিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির কাজ বা টেরাকোটার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। —এসবের মধ্য দিয়ে সজীব থেকেছে বাংলার লোকশিল্প। কিন্তু মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষত গানের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরী ঘরানার সূত্রপাতের পর্বও এই সময় থেকেই, সুনীতিকুমার তাঁর দিগদর্শনীতে এর উল্লেখ করেননি।

মোগল-শাসনের শেষ পর্যন্ত বাঙালির মধ্যে জাতি ও সংস্কৃতির সম্মিলনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। আলাওল ও ভারতচন্দ্রের রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। তবে দুই কবির রচনায় গ্রাম্যতার অনুপস্থিতি এবং নগর-সংস্কৃতির ভাবরসে পুষ্ট কাব্যকীর্তি সূচিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, প্রায় সব মোগল সম্রাটেরই রাজপুত মহিষী ছিল। ফলে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই পথে সাংস্কৃতিক সম্মিলনের অবকাশ গড়ে উঠেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ায় বাংলা এবং বাঙালির পক্ষে ভারত-আত্মার ও ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন। 'মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার পক্ষে আংশিকভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভব হইল'। ১৫৩৮-৩৯-এ হুমায়ুন গৌড় দখল করার পরে, মধ্যে ১৫৩৯-৭৫ বাদ দিলে, আকবরের প্রতিনিধি মুনিম্ খানকে দিয়ে ১৫৭৬-এ মোগল শাসনের সূত্রপাত ও ১৭১৬ খ্রি. নাগাদ মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি এবং মুরশিদকুলির স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনার মধ্য-পর্বের বাঙালির কথা বলেছেন সুনীতিকুমার। এ প্রসঙ্গে তিনি বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান উভয়েরই কথা বলেছেন। কিন্তু জানিয়েছেন। 'মুসলমান সংস্কৃতি গুঅর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তরভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব-সভ্যতাগ্ন রীতি নীতি এবং চিন্তা-প্রণালী বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে তেমন কার্যকরী হয় নাই'। সুনীতিকুমারের এই মত নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিতর্ক নেই এখানে যে-(১) বাংলার বিদ্যাধর পণ্ডিতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল জয়পুর নগর স্থাপনে। (২) বাংলার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তরভারতের ধর্ম-জীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (৩) মধুসুদন সরস্বতীর মত বাঙালি পণ্ডিত-দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তরভারতে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (৪) দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, চিতোর থেকে পারস্য, তুরস্ক পর্যন্ত রাজদরবারে ঢাকাই মসলিনের কদর ও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। (৫) বাংলার বাঁশের ধাঁচা রাজপুত মোগল বাস্তশিল্পে গৃহীত হয়েছিল, তার নাম রেওটি। তবে এ সব কিছুই দেওয়া-নেওয়ার দিকটা ক্রমশ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই সময়ের বাঙালির সাংস্কৃতিক-জীবনে।

প্রসঙ্গান্তরে বিশেষত আধ্যাত্মিক ও মানসিক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়- (১) উত্তরভারতের লোকভাষা (হিন্দী) থেকে নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল' বাংলায় অনুদিত হয়েছিল। (২) মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবৎ'-এর বঙ্গানুবাদও হয়েছিল। আর দু-টিই হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। দ্বিতীয় গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছুটা সুফি ধারণা-বিমিশ্র ঐতিহ্য।

সুনীতিকুমার তাঁর দিগদর্শনীতে মোগল যুগের বাস্তব সভ্যতা (বিশ্বৃংপুরের টেরাকোটা (স্থাপত্য)। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক, পট, যমপট, কালীঘাটের পট (চিত্রবিদ্যা)। ষোড়শ শতক-অষ্টাদশ শতক, হাতির দাঁতের মুর্তি, চুড়ি, কৌটা (কারুশিল্প), অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি (সত্যনারায়ণ পূজা, দোল, রাস, (হিন্দু), ঈদ, মহরম ইত্যাদি (মুসলিম)) এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির গুপাঁচালি-যাত্রা-ধ্রুপদ-খেয়াল ইত্যাদি) পরিচয় দিয়েছেন।

১৫.৪. সারাংশ

তুর্কি আক্রমণের পর বাংলার জনজীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক প্রতিরোধে অসমর্থ বাঙালি বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ করে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। পরে স্বাধীন সুলতানি আমলে বাঙালি একদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, অন্যদিকে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সংস্কৃতির লোকায়ত বিশ্বাস ও ইসলামি সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে জাতিগতভাবে উন্নততর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটি সম্ভব হয়েছিল বিজেতা ও বিজিত উভয়েই পরস্পরের প্রয়োজন বুঝেছিল বলেই। দেখা গেল দেশের বিদ্বৎমণ্ডলী সুলতানের দরবারে নিযুক্ত হচ্ছেন। মুসলিম রাজদরবারকে অবলম্বন করে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। এ যুগেই অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ রচনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'গাহাসত্তসঙ্গ' প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড কাব্য রচিত হয়েছে। এ সময়েই চৈতন্যের মত সংস্কারক প্রেম-ভক্তিবাদী আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত লোকধর্ম প্রচার করেছেন, যার বক্তব্য ঈশ্বরের বিচারে সব মানুষই সমান-এ কথা সুফি সাধকরাও বলতেন। ফলে দুই সংস্কৃতির সম্মিলন সহজতর হয়েছিল। দারা শিকোর 'মজম-উল্-বহরৈন' অর্থাৎ 'দুই সাগরের মিলন'-এর বক্তব্যের ফলে বাংলাদেশের এই ধর্মীয় সমন্বয়বাদী বক্তব্যের মিল আছে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যও সুলতানের আনুকূল্য পেয়েছিল, কৃত্তিবাস তা স্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের এতদিন সংস্কৃত লেখাই যেখানে প্রচলিত ছিল, সেখানে লোকভাষা বাংলায় সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস রচনা করায় বিদেশী শাসকবর্গের সঙ্গে জনসাধারণও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে এইভাবে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের সঙ্গে মনসা-চণ্ডী-ধর্মমঙ্গল গোপীচাদের গান বহুল প্রচারিত হয়েছিল। এই সমস্ত রচনার মধ্যেই বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে।

তুর্কি বিজয়ের পর বাঙালি মিথিলায় যায় ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠের জন্য, সেখান থেকে শাস্ত্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদ বাংলায় নিয়ে আসে। এর ফলে বাংলায় নতুন করে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কাব্যচর্চারও পুষ্টি ঘটেছে। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কাব্যচর্চার যেমন বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে কীর্তনের ব্যাপক প্রসার এবং নতুন নতুন গায়ন পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ও উত্তরভারত পরিক্রমা ঘরমুখো বাঙালিকে নতুন বিশ্বের সন্ধান দিয়েছে-পুরী-গয়া মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা এবং গৌরবময় বৃহৎবঙ্গে র প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতি ও সংস্কৃতির এই সম্মিলন মোগল শাসনের শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রায় সব মোগল সম্রাটেরই রাজপুত মহিষী ছিল। ফলে সর্বভারতীয় পটভূমিকায় এটিও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সহায়ক হয়েছিল। বাংলার বিদ্যাধর পণ্ডিত যেমন জয়পুর নগর স্থাপনে এবং বাংলার বাঁশের ধাঁচা 'রেওটি' রাজপুত মোগল বাস্তশিল্পে গৃহীত হয়েছিল, তেমনি মধুসুদন সরস্বতী উত্তর ভারতে শঙ্করাচার্যের

মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ঢাকাই মসলিন তো দেশে-বিদেশে আদরণীয় হয়েছিল। এসবের মধ্যে রয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়।

১৫.৫. বাঙালির সংস্কৃতি: সুফি প্রভাব

তুর্কি বিজয়ের সঙ্গেই বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের সূত্রপাত। এর দুটি সম্ভাব্য ধারা-১. সুফি ধর্মাদর্শ, ২. শরিয়তী ইসলাম ধর্মাদর্শ। এর মধ্যে প্রবলতর, ব্যাপকতর, ও সফলতর ধারা হল প্রথমটি। তুর্কি-বিজয়ের পরে ভারতবর্ষে উত্তরভারতের মুসলমানদের আগমন বেশি সংখ্যায় হয়েছিল। সুনীতিকুমারের মতে এদের এক দলের মধ্যে ছিল সত্যকার আধ্যাত্মিক শক্তি আর সততা। এরা উদার সুফিমতের ইসলামের প্রচারক ছিল এবং 'ভারতের অনুসন্ধানী চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। 'সুফিমতের মধ্যে ছিল সুফি-দর্শন আর অনুষ্ঠান। এই দুইয়ের প্রভাব পড়েছিল 'ভারতের আধ্যাত্মিক আর ধর্মীয় জীবনে সহজভাবে...। 'অন্যদিকে, দ্বিতীয় ধারাটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই প্রতিহত হয়েছিল হিন্দুর সংহতি শক্তির কাছে; যদিও মন্দির ভাঙা, হিন্দুর মেয়ে আর ধনরত্ন লুঠ করা, জোর করে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলেছিল প্রায় নির্বাধভাবে। সুনীতিকুমার লিখেছেন: 'তুর্কের শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে দাঁড়াল হিন্দুর শক্তি, মুসলমান ধর্মপ্রচার বা ধর্মান্তরীকরণ তার গায়ে টক্কর খেয়ে পড়ল হিন্দুর সংহতি-শক্তির কাছে তাকে হার মানতে হ'ল [গোঁসাই তুলসীদাস]। অবশ্যই এ ক্ষেত্র বিশেষ করে ধর্মগত ক্ষেত্র। তুর্কিনা তরীকার মাধ্যমে শরিয়তী ইসলামের প্রভাব বিস্তার প্রচেষ্টা বাংলায় তুর্ক-বিজয়ের আগে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রচনা করতে পারেনি; পেরেছিল কিছুটা সুফিরা।

বাংলার তুর্কি-বিজয়ের পরবর্তীকালে দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায় এদেশের বাসিন্দা হয়ে ওঠা তুর্কিরা ক্রমশ বাঙালি হয়ে ওঠায় তাদের কঠোর শরিয়তী বন্ধন শিথিল হয়েছিল। ফলে তুর্ক বিজয়ের পরবর্তীকালে তুর্কিনা তরীকার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা-পূর্বে শরিয়তী ইসলামের কিছু ধর্মপ্রচারক এসে থাকলেও শরিয়তী প্রসার তেমনভাবে ঘটতে পারেনি। বরং সুফি ধর্মমত প্রচারক সাধু ফকির দরবেশ কলন্দর পীরের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। সুফিদের দিক থেকে এর দুটি কারণ নির্ণয় করা যায়- ১. সুফিমতের ঔদার্য প্রসারতা স্থিতিস্থাপকতা। মুসলমান আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ হচ্ছে সুফি-দর্শনচিন্তায়। এই সুফি মতবাদের মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে, কোরানের অনুমোদিত সাধারণ ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে যার মিল নেই-যার বিশ্বমানবিকতা আরও বেশি। যেমন সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়-আবশ্যকতা কেবল ভাবশুদ্ধির; যেমন-ব্রহ্মা বা ঈশ্বর, আর মানুষের আত্মা, এই দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক-ই কোনো পার্থক্য বা ভেদ নেই- যে ব্রহ্মাত্মবাদ আমাদের বেদান্তের শিক্ষা দেয়। সুফিরা মানুষকে মুসলমান আর অ-মুসলমান-এই দুই বিরোধী পর্যায়ে ভাগ করেননি; আর ঈশ্বর জগতে একমাত্র মুসলমানদেরই প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল, এ রকম blasphemy বা ঈশ্বরনিন্দা-মূলক চিন্তার অনুমোদন সুফিরা কখনও করেননি।... বিশেষ কোনো ধর্মের বাইরের বর্ণ বা চিহ্ন ধারণ না করেও কোনো ভাবশুদ্ধি যুক্ত আকাঙক্ষা আর প্রার্থনার বলে ঈশ্বরানুভূতির পথে মানুষ এগোতে পারে, সে দিকেও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। ২. তাঁদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতির চমৎকারিত্ব। ভারত জয়ের প্রথম যুগে এঁরা (সুফিরা) সুদূর পল্লীঅঞ্চলে গিয়ে আস্তানা নিতেন, আর বুজরুগি বা কেরামতি জাহির করে, অর্থাৎ সিদ্ধাইয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে, ব্রাহ্মণ

পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থিত অজ্ঞ আর নিরক্ষর মানুষদের বশে আনতেন। সহজ-সাধন, নাম-জপ প্রভৃতির দিকেই আকর্ষিত করা এঁদের প্রচারের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।... ফলে, ভিতর থেকেই হিন্দু সমাজ ভাঙন ধরার লক্ষণ দেখা দিল।

সুনীতিকুমার 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থের জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য-অধ্যায়ে যেমন ইসলামি শাসকদের ক্রমশ বাঙালি হয়ে ওঠার কথা বলেছেন, ইসলামিকরণের কথা বলেছেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিরোধের কথা বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সুফি মতবাদের প্রচার ও প্রসারের কথাও জানিয়েছেন এবং তার মধ্যে দারা শিহো-পরিকল্পিত দুই সাগরের সম্মেলনের রূপটির বা 'মজম্ উ-ল্-বহরৈন'-র পরিচয় পেয়েছেন।

সেখানে তাঁর কথা: 'বাঙ্গালা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইস্লাম নহে। শরিয়তী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সহিত সুফি মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সুফি মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সুফি মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।' প্রথমত, সুফিবাদ সর্বভারতীয় বৈষ্ণবাচার ও ভক্তিবাদের সঙ্গে মিলেমিশে পরোক্ষে ভিতর থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের উৎসে কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সুফি-ভক্তিবাদ সাধনতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সঙ্গে মিলে অনেক ছোটো-বড়ো গুহ্য সাধনাশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-নিরপেক্ষ উপাসক সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। তৃতীয়ত, হিন্দু নাথপন্থা ও ইসলামি পন্থা অনেকটা মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এক সমান্তরাল ধারার সৃষ্টি করে নাথপন্থী সাধন ও সাহিত্যধারার পথকে প্রসারিত করেছে। চতুর্থত, দুই ধর্মভাবনার দ্বন্দ্ব ও মিশ্রণে সত্যপীর, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির মতো লৌকিক দেবদেবী-কুলের সৃষ্টি হয়েছে।

সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, এর ফলে বাঙালির সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু এসেছে, তা বাঙালির জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এসেছে। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির দিগদর্শনীতে বাংলার বাস্তব সভ্যতা, অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি যে তালিকা পেশ করেছেন তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির ইসলামি উপাদান। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, গাজীর পট, হাতির দাঁতের শিল্প, গুড় পাটালি, মাংসপাকের বিশেষ রীতি, ঢাকার জামদানি, শ্রীহট্টের শীতল পাটি প্রভৃতির মধ্যে রয়ে গেছে বাস্তব সভ্যতাগত উপাদান কাঁথা সেলাই, ক্রীড়া কসরৎ, ঈদের উৎসব শাহমাজারের অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে আছে অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির উপাদান। বাউল, ভাটিয়াল, জারি, মারফতি মার্সিয়া গান এবং খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ইত্যাদির (এগুলি উত্তরভারত থেকে কিছুটা মোগল সংস্কৃতির ছায়া নিয়ে এসেছে) মধ্যে এবং মোগল আমলে নিখিল ভারতীয় সভ্যতার স্বাদবাহী জৈসীয় পদুমাবৎ-এর কাব্যের অনুবাদ পদ্মাবতী ইত্যাদিতে রয়েছে মুসলমান উপাদান। কিন্তু এসব উপাদান এমনভাবে মিশে গেছে যে বিশিষ্ট ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য তাতে আর থাকেনি, সবটাই হয়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির সৌরভে সুরভিত।

সুনীতিকুমার 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে সংকলিত 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধের বর্জিত অংশে বাঙালি-মুসলমানদের সংকটের কথা জানিয়েছেন; তা উৎসাহী-পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির প্রত্যাশায় উদ্ধার করা হ'ল-

'বাঙ্গালী মুসলমান এখনও মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী থাকায়, নব-আলোচিত বঙ্গ-বহির্ভূত মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিতেছে না। এই আলোচনা মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যেই নিবন্ধ, এবং ইহাদের জ্ঞান মূখ্যতঃ মুসলমান-সভ্যতা-বিষয়ক ইংরেজি পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সজ্ঞানভাবে একটি জাতির মনের মোড় ফিরানো কঠিন ব্যাপার-অজ্ঞাতসারেই এই কার্য্য হইয়া থাকে। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের কেহ কেহ এখন একটি তবাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতিদ গঠনের প্রয়াস করিতেছেন। সহজ বাঙ্গালীত্বের দাবিতে-বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালী সংস্কৃতি যে তাহারই, এই সহজ বোধে-বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না-কারণ ইহার সঙ্গে কোরানের বা আরব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অস্বস্তির ভাব আসিয়াছে। যতই কেন অ্মুসলমান ইতিহাসদ, অ্মুসলমান সভ্যতাদ বলিয়া বাঙ্গালী চেষ্টা করুন না, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা সিরিয়া, পারস্য ও মিশরে যে বীরত্ব দেখাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজিতে যাহাকে বলে legitimate pride-ন্যায়সংগত গর্ব-তাহা তাঁহার মনের অন্তঃস্থল হইতে অনুভব করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য্য, বা দশম শতকের বাগ্দাদের আরব, পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুর্কি বীরত্ব- কেবল সমধর্মিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব করিতে রসবোধ-যুক্ত যে কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধো-বাধো লাগিবে, তাঁহার হাসি পাইবে; আমার অ্মুসলমানজাতিদ কত বড়ো, এই গর্ব করিয়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে উর্দু কবি ইত্কালের উক্তি- হে আন্দালুসিয়ার পুষ্পোদ্যান, সে দিন তোমার স্মরণে আছে কি, যে দিন তোমার শাখায় শাখায় আমাদের নীড় অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতিকে কোন সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল); মদ্রেব (মরক্কোর) মরুভূমির নদীর তীরে আমাদেরই আজান-ধ্বনি গুঞ্জিত হইয়াছিল (অর্থাৎ আমরা মুসলমানের মরক্কো জয় করিয়াছিলাম)-ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাঁহার কাছে নিজ ভারতীয় বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্যকে যেন উপহাস করিবে। কোন বাঙ্গালী রোমান-ক্যাথলিক খ্রিষ্টান গর্ব করে- তআমরা রোমান-ক্যাথলিক জাতির লোক, আমরা কত বড়ো! আমাদের জাতি স্পেন হইতে আমেরিকায় গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল- মেক্সিকো ও পেরুর মতো দুই-দুইটা সুসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছিল; আমাদের রোমান-ক্যাথলিক জাতি পর্তুগাল হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত; আমাদের জাতি-ই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জার্মানীতে কত বড়ো-বড়ো গির্জা নির্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যায় কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কত দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছে, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেদ, তাহা হইলে ইহা যেমন শুনায়, তুর্কি, আরব, শামী, মিসরী, মঘরেবী ও হিস্পানীদের কীর্তি-কলাপ লইয়া সগৌরবে যদি মাতামাতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণার উদ্রেককর ব্যাপার বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে লাগিবে।'

১৫.৬. সারাংশ

তুর্কি বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মেরও

প্রসারের সূচনা। ইসলামের দুটি ধারা সুফি ও শরিয়তী ধর্মাদর্শ। সুফি-দর্শন ও অনুষ্ঠানে বাঙালি ভাবাদর্শের অনেক মিল ছিল। সুফিদের মধ্যে সত্যকার আধ্যাত্মিকশক্তি আর সততা ছিল, তাদের ঔদার্য ও সহনশীলতা বাঙালির ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। শরিয়তী দর্শন মানুষকে মুসলমান আর অ-মুসলমানে ভাগ করে শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। আগ্রাসী শক্তি নিয়ে ধর্মান্তরকরণের ধর্মীয় কৃত্য পালন করা হচ্ছে বিশ্বাস করে, তাই তাকে হিন্দুর সংহত শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছিল।

এদিকে বাংলায় বসবাসকারী বিজয়ী তুর্কিরা কালক্রমে দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ক্রমশ বাঙালি হয়ে ওঠে। তাদের কঠোর শরিয়তী বন্ধন শিথিল হয়। সুফি মত প্রচারক সাধু, ফকির, দরবেশ, পীরের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এঁরা বিশ্বমানবতার বাণী তুলে ধরেন। বলেন, সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়-প্রয়োজন ভাবশুদ্ধির বেদান্তের ব্রহ্মাত্মবাদের সঙ্গে তার আর ভেদ থাকে না।

বাংলাদেশে যে মুহম্মদীয় ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল তা খাঁটি শরিয়তী ইসলাম নয়, সেখানে সুফিমতের প্রভাব ছিল সমধিক। সুফিমতের ইসলাম, সহজেই বাংলায় প্রচলিত যোগ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে সমন্বিত হতে পেরেছিল। সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ ও ভক্তিবাদের সঙ্গে মিশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনকে বাস্তবায়িক করেছিল। এই সুফি ভক্তিবাদ সাধনতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এদেশে প্রচালত সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সঙ্গে মিশে অনেক গৃহ্য সাধন-পন্থা ও সাহিত্য ধারাকে প্রসারিত করেছে। হিন্দু ও সুফি ধর্মভাবনার মিশ্রণে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর-এর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বাঙালির সংস্কৃতিতে বহু ইসলামী উপাদান এসেছে গাজীর পট, কাঁথা শিল্প, বাঁশবেতের কাজ, ঈদের উৎসব, পীরের মাজারের অনুষ্ঠান, ভাটিয়ালি, জারি, মারফতি গান প্রভৃতি স্মরণযোগ্য। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতিতে মোগল সংস্কৃতির প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ সবের সবটাই হয়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। জায়সীর 'পদুমাবৎ'-এ মুসলমানী উপাদান থাকলেও তা বাঙালি জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেখানে আর তার ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য থাকেনি।

১৫.৭. অনুশীলনী

বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

- বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামি উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
- 'বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি' সম্পর্কে আপনার ধারণা বুঝিয়ে লিখুন। এ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোন ভিন্ন মতামত থাকলে তা পরিস্ফুট করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন:

- মধ্যযুগে বিষ্ণুপুরের খ্যাতির কারণগুলি উল্লেখ করুন।
- দারা শিকোর বইয়ের নাম ও তার অর্থ লিখুন।
- আচার্য সুনীতিকুমার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধি ও বড় হয়ে ওঠার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। -কারণ দু'টি উল্লেখ করুন।